প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯০

প্রচ্ছদ : আফ্রিকার সনাতনী ভাস্কর্যের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত নাইজেরিয়ার বেনিন
শিল্পীর তৈরি প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন ব্রোঞ্জমূর্তি

প্রকাশক
অশোক ঘোষ
বুক্‌স অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স
১/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
প্রভাস সরকার
আর কে প্রিন্টার্স
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

'মায়িবুইয়ে ই আফ্রিকা' অর্থাৎ 'ফিরে এসো আফ্রিকা' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রার্থনা-বাণী। গোটা আফ্রিকার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য—দাসব্যবসা, বর্ণবৈষম্য নীতি এবং উপনিবেশিক শাসনের দায়ভাগে। ফিরে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে আফ্রিকাতে, ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছে বহু যন্ত্রণার মূল্যে। বলা বাহুল্য, এই যুগসন্ধিক্ষণে আফ্রিকার সাহিত্যে সেই যন্ত্রণার স্বর সোচ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নানা সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকান সাহিত্যের সেটাই একমাত্র চেহারা নয় একথাও প্রারম্ভেই মনে রাখা উচিত, না হলে অবিচারের সম্ভাবনা থাকে। বিখ্যাত নাইজেরিয়ান কথাসাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে যখন বলেন, 'এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে আফ্রিকার সৃষ্টিশীল লেখক যদি গুরুত্ব-পূর্ণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তবে শূন্যে ধোঁয়ার মত তাকে বিলীন হতে হবে অচিরে,' তখন তিনি আফ্রিকান সাহিত্যের সমাজচেতনার প্রসঙ্গটিকে ব্যাপকতা ও জটিলতার প্রেক্ষিতে দেখেন। কারণ পাশ্চাত্য ও আফ্রিকীয় সংস্কৃতির সংঘর্ষের দায়ভাগে আজ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যে-বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার চেহারা দেশভেদে অঞ্চলভেদে পৃথক হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এখন 'স্বাধীন'। দীর্ঘদিনের ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে সেখানে। কিন্তু সে-স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী তা আজ আমরা জানি। আপার্টহাইড (apartheid) নামক অমানবিক বর্ণবৈষম্য নীতির কল্যাণে আজও সংখ্যালঘু শ্বেতকায় সম্প্রদায় সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশ্বেতকায়দের ওপর প্রভুত্ব করছে। অশ্বেতকায়রা আবার তিন ধাপে পৃথকীকৃত: দ্বিতীয় স্তরে রয় 'কালার্ড' নামে অভিহিত বর্ণসংকর সম্প্রদায়; এশিয়ান বলে নির্দিষ্ট আমাদের উপমহাদেশের মানুষ স্থান পেয়েছে তৃতীয় স্তরে; সর্বনিম্নে রয় মাটির মানুষ কৃষ্ণকায় সংখ্যাগুরু খোসা, জুলু, পোন্ডো প্রমুখ আফ্রিকান উপজাতি। ফলত বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার লেখকদের মধ্যে প্রকট। অকৃত্রিম ক্রোধ, হতাশা, বিদ্রূপ দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্য রচনার মূল সুর। এইসব লেখকদের মধ্যে কৃষ্ণকায় (লিউইস নকোসি, পিটার এব্রাহাম, এজেকিয়েল ম্ফাহলেলে প্রমুখ), বর্ণসংকর (আলেক্স লা গুমো) এবং উদার অথবা প্রগতিশীল ভাবনা-সম্পন্ন শ্বেতকায় (মহিলা ঔপন্যাসিক ও কবি নাডিন গর্ডিমার) আছেন। বর্ণ-বিভেদ নীতির সমালোচনা, দারিদ্র্যের বীভৎস ছবি তাঁদের রচনাতে আমরা পাই। শ্বেতকায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস আন্দোলনে ইউসুফ দাদু বা নায়েক প্রমুখ ভারতীয়রা সাহায্য করলেও যে-জন আছে

মাঝখানে সেই ভারতীয় বাসিন্দারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে এখনো মোটের ওপর (ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজে ব্যতিক্রম আছে) উটপাখি-মনোবৃত্তি সহকারে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেন, এবং আফ্রিকানদের অবজ্ঞা করেন। এই দ্বৈধতার প্রেক্ষিতে নাডিন গর্ডিমারের গল্পটি ভারতীয় পাঠকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ মনে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের অবস্থার সঙ্গে আমেরিকান নিগ্রোদের অবস্থার খানিকটা (খানিকটাই, কেননা দক্ষিণ আফ্রিকাতে কোনো অ্যানজু ইয়ং নেই) মিলের কথা আফ্রিকান সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ জেরাল্ড মুর উল্লেখ করেছেন; ক্রোধের প্রকাশ হতাশার প্রকাশ তাঁদের লেখাতেই বেশি, এবং এ-জাতীয় তীব্রতা আমরা পশ্চিম-আফ্রিকার লেখকদের মধ্যে পাব না। এ-প্রসঙ্গেও মুরের লেখা প্রণিধান-যোগ্য—'পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার লেখকদের রচনা পাঠের পর এজেকিয়েল মুফাহলেলের লেখা পড়া দূরবীনের ফোকাস পাল্টাবার সঙ্গে তুলনীয়।' কৃষ্ণাঙ্গ লেখকরা অনেকেই সমাজের নিচুতলা থেকে উঠে এসেছেন বলে তাঁদের লেখাতে তাঁদের অসহায় অবস্থা এমন বিশ্বস্ত চেহারা পায়। লিউইস নকোসির গল্পে তার পরিচয় আছে। শ্বেতকায় খামার-মালিকের জন্য বলপ্রয়োগে ভূমিশ্রমিক সংগ্রহের অমানবিকতার বর্ণনা নির্যাতনের দলিলস্বরূপ। আলেক্স লা গুমার গল্পে কালাডদের অস্তিত্বের আপাত লঘু স্কেচটি ট্র্যাজি-কমিক ধর্মী। শ্বেতকায় শাসিত অবৈধ সরকার 'সাপ্রেশন অফ কমিউনিজম অ্যাক্ট' নামক এক বিধির আশ্রয়ে সামান্যতম সমালোচনারও কণ্ঠরোধ করতে পারে, তাই অধিকাংশ প্রগতিবাদী দক্ষিণ আফ্রিকান সাহিত্যিক এখনো বিতাড়িত এবং অন্যদেশবাসী।

বর্ণবৈষম্যনীতি সরকারি বিধিবদ্ধ চেহারা ছাড়াও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও হাত বাড়িয়েছে, বিশেষ করে শ্বেতকায় অধ্যুষিত এলাকায়। আপাতদৃষ্টিতে জাম্বিয়াতে তা দূর হয়েছে, কিন্তু শ্বেতকায় মূলধন পরিচালিত নয়া-সাম্রাজ্যবাদী (neo-colonialist) সমাজে নগরাঞ্চলে সাধারণ আফ্রিকানরা এখনো প্রান্তেবাসী। আমাদের বস্তির মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কম্পাউন্ডে সেই দরিদ্র আফ্রিকান-দের বাস। জাম্বিয়ার এককালীন শিক্ষামন্ত্রী মুলিকিতা তাঁর গল্পে এদের জীবনের যন্ত্রণার ছবি বিধৃত করেন। ক্ষমতাসীন বিত্তশালী আফ্রিকান ও দরিদ্র আফ্রিকানদের মধ্যে একটা প্রকট শ্রেণীভেদ ঘটে গেছে, এবং সনাতনী আফ্রিকান সমাজে নারীর যে-মর্যাদামণ্ডিত স্থান তা থেকে সে আধুনিক জটিল সমাজে বিচ্যুত। সিপ্রিয়ান একওয়েন্সি নাইজেরিয়ান ব্যক্তিচরিত্রের অস্বস্তিকর অবস্থাকে ডার্ক কমেডির চেহারা দেন। ইনি প্রধানত ঔপন্যাসিক হলেও ছোটগল্প রচনাতেও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল আফ্রিকার অধিকাংশ লেখকই ঔপন্যাসিক।

গ্রাম-শহরের প্রকট দ্বৈধতা তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মত আফ্রিকান দেশগুলিতেও আছে। এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে ঘানার মহিলা সাহিত্যিক ক্রিস্টিনা (বর্তমান নাম আমা আটা) আইডুর গল্পটি এবং উগান্ডার বিখ্যাত লেখক

আবান লো লিয়ংয়ের 'সে এবং ও' প্রাসঙ্গিক। লিয়ং আধুনিক জগৎকে আফ্রিকান ইডিয়ম দ্বারা প্রভাবিত ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তাঁর 'লেক্সিকোগ্রাফিসাইড' গল্পে আগামী আমিন-ই স্বৈরতন্ত্রের অশুভ পূর্বাভাস। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে আফ্রিকান ধনীদ্বারা আফ্রিকান দরিদ্রের প্রতারণার আরেক চেহারা পাওয়া যাবে কেনিয়ার লেখক মেজা মোয়াংগির গল্পে। কেনিয়ার অপর বিখ্যাত সাহিত্যিক জোনাথান কারিয়ারার 'প্রবেশিকা' গল্পে শ্বেতাঙ্গ-প্রভাবিত অশিক্ষিত আফ্রিকানদের ধর্মচিন্তার প্রসঙ্গ অসাধারণ দক্ষতায় বিধৃত। অনিবার্য-কারণবশত কেনিয়ার লেখক ন্গুগি বা থিয়োংগোর 'ক্রুশ-সকাশে বিবাহ' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। বর্তমান আফ্রিকান সাহিত্যে তিনি অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর লেখা মাউ মাউ বিদ্রোহ-ভিত্তিক উপন্যাস 'Petals of blood' বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। কেনিয়ার নয়া উপনিবেশবাদের তীব্র সমালোচনার জন্য তিনি বহুকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে তিনি অজ্ঞাত দেশে প্রবাসী। সম্ভব হলে ভবিষ্যতের কোনো সংকলনে তাঁর রচনা মুদ্রিত হবে। বেনিন প্রজাতন্ত্রের লেখক জঁ প্লিয়ার কাহিনীতে পাশ্চাত্য-আফ্রিকান ধর্মচিন্তার দ্বন্দ্ব রূপায়িত।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পর্তুগিজ কলোনি মোজাম্বিকের লেখক লুই রেনার্দো হনওয়ানার কাহিনীতে আফ্রিকানদের অবমাননা চিত্রণে বিদ্রোহর চেয়ে বিষাদ প্রাধান্য পায়। শিক্ষাপ্রাপ্ত আফ্রিকানরা পশ্চিমী দেশে অবস্থান কালে অবমাননা, হীনম্মন্যতা, একাকীত্বের শিকার হন। সিয়েরা লিয়নের লেখক বার্ট উইলিয়ামসের ও প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ ব্রাজাভিল-কঙ্গোর (বেলজিয়ান কঙ্গো নয়, যার বর্তমান নাম জাইর) লেখক সিলভাঁ্যা বেম্বার গল্পদুটি সে-সমস্যাকে ভিন্ন মেজাজে ধরেছে। সেনেগাল দেশের সেমবেন উসমানের নাম চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে পরিচিত। ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্পে ট্রেড ইউনিয়ন-ভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সক্রিয়। সাহারা উত্তরে অবস্থিত উত্তর-আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে সাহারা-নিম্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রভেদ রয়েছে, উত্তরে আরবী প্রভাব হেতু। তবু বিদেশী শাসন রাজনীতিক দমন সাধারণ ধর্ম হিসাবে ধার্য। সেই প্রেক্ষিতে রচিত আলজেরিয়া ও মরক্কো থেকে একটি করে গল্প সন্নিবিষ্ট হল।

বার্ট উইলিয়ামস ও সিলভাঁ্যা বেম্বার গল্পে যেমন শিক্ষিতপ্রবাসী আফ্রিকান-দের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সিয়েরা লিয়নের আবিওসে ডি নিকোল লিখিত 'ওলাহুন ব্রিজের সেই ভূত' গল্পে আফ্রিকায় বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্যকরা ঔপনিবেশিক শাসনের দায়ভাগে ইংরেজি, ফরাসি বা পর্তুগিজ ভাষায় লেখেন। অনেকেই সে-ভাষাকে আত্মীকরণ করেছেন অননুকরণীয় ভাবে। স্থানীয় ভাষাতে আধুনিক সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে। মালাউইয়ে (প্রাক্তন নিয়াসাল্যান্ড) চেওয়া, পূর্ব আফ্রিকাতে সোয়াহিলি, ইথিও-

পিয়াতে আমহারিক, নাইজেরিয়াতে ইয়োরুবা ভাষাতে সাহিত্যরচনা আগে থেকেই পরিচিত। সেমবেন ওলোফ ভাষাতে চলচ্চিত্ররচনা বহু আগেই শুরু করেছেন, এখন সাহিত্যরচনাতে তা প্রয়োগ করেছেন। রূপকথাকে আধুনিক রাজনীতির বাহন হিসাবে ব্যবহারের দুটি ছোট উদাহরণও এখানে সন্নিবিষ্ট হল।

কোনো বিশেষ আদর্শে গল্পের পারম্পর্য রাখা যায় নি, সে-ত্রুটি মার্জনীয়। উপস্থাপিত রচনাগুলি পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের প্রথম দিকের রচনা। তারপরে আফ্রিকার সাহিত্যে অনেক মূল্যবান সংযোজন হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁদের পরিচয় দেবার বাসনা রইল। বহু লেখকের রচনা রাখা গেল না, তাঁদের গুরুত্ব কম নয়।

অনুবাদের ভাষা বিষয়ে একটি নিবেদন আছে। গল্পের মেজাজ অনুযায়ী তাকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদারকে স্মরণ করে গুরুচণ্ডালীপনাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফল কী দাঁড়িয়েছে তা পাঠকরা বিবেচনা করবেন।

অপরিচয়ের আড়াল অপসৃত করবার বড় সড়ক সাহিত্য-পরিচয়; তৃতীয় দুনিয়াকে যথার্থ কাছাকাছি আনতে হলেও সে-পথে এগোনো কাম্য। সে-ক্ষেত্রে এই সামান্য প্রয়াস যদি কিছুমাত্র ফল দেয়, সেটাই হবে বড় পুরস্কার।

৭ এপ্রিল ১৯৮৩
সি-এস ৫/৭ গলফ গ্রিন
কলকাতা ৭০০ ০৪৫

ধ্রুব গুপ্ত

গল্পসূচী

মেজা মোয়াংগি

চাকরি

তরুণ লেখক মেজা মোয়াংগির বয়স মাত্র বত্রিশ। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'কিল মি কুইক' উপন্যাসের জন্য কেনিয়াট্টা পুরস্কার-প্রাপ্তি তাঁকে বিখ্যাত করে। তাঁর অন্য উপন্যাস 'ক্যারকাস ফর দ্য হাউন্ডস' প্রখর রাজনীতিক চেতনার স্বাক্ষর বহন করছে। স্বাধীনতা-উত্তর কেনিয়াতে শিক্ষিত কেনিয়ানদের সংস্যা তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স প্রকাশিত 'লোটাস' সাহিত্য পত্রিকার তিনি অন্যতম লেখক।

সন্ধ্যেবেলা ঠান্ডা পড়েছে বেশায়। হাওয়াও দিচ্ছে খুব জোর। পার্কিং লটটাতে যেতে যেতে বেন কোটটাকে গায়ের ওপর আরো চেপে নিল। গাড়ির সংখ্যা দেখে বোঝা গেল ট্যাভার্নে খুব ভিড়। বারান্দাতে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে, খোলা ছাতের টেবিলগুলোর একটাও খালি নেই। গতবারে কিন্তু এত লোক দেখে নি সে।

পকেট গড়ের মাঠ হলে ট্যাভার্নে সুবিধে করে ওঠা সহজ নয়। মনে জোর এনে বেন একবার সামনে একটু পায়চারি করল। একটা দোকানের ডিসপ্লে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে, থরে থরে টুরিস্ট উপযোগী দামের লেবেল-আঁটা জিনিস সাজানো। খোলাছাতের জনতার দিকে তাকালো সে। ওকে কেউ লক্ষ্য করেছে বলে মনে হল না। হতচ্ছাড়া বসু যদি না এসে থাকে তবে কী হবে? কথাটা ভাবতেই সে একটা দুর্বলতার ভাব বোধ করল। ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল সে। বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে সে, ভেতরে যেতে বাধা কিসের? বন্ধু! ভাবতে গলার কাছটা আটকে এল। কেটে পড়বার ইচ্ছেটাকে সবলে দমন করে সে হুট করে বারের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ধূমপানরত খদ্দের-গুলো যেন অগণিত বুদ্বুদ। বড় অন্ধকার, তারই মধ্যে সে মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কাউকেই চেনা মনে হচ্ছে না। মাতাল মানুষের স্বাভাবিক উত্তেজনা চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল। ক্যাপ্রিকর্নের সঙ্গে ট্যাভার্নের কোনো ফারাক আছে বলে তার মনে হল না। প্রথমটার চাকচিক্য একটু বেশি এই যা।

'হি!'

কার গলা থেকে শব্দটা ভেসে এল দেখবার জন্য বেনকে চোখ কুঁচকে দেখতে হল। বাঁদরের মত মুখ আর হাত নাড়া দেখে বুঝতে পারল কে। স্বাস্থ্যর

নিঃশ্বাস ফেলে সে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করল হালের দস্তুর মত।

'আগেই এসে গেছেন আপনি,' বেন বলল। একগাল হাসি হেসে 'পহেলা চিড়িয়ার পোকা জোটে বেশি' বলে নিজের রসিকতায় বস্ নিজেই হাসল খানিক।

ভীতু ভীতু চোখে বেন চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। ভাগ্যি ভাল তাকে গিলবার জন্য আপাতত মাত্র একটি শকুনই এখানে উপস্থিত। বস তার 'সহ-ব্যবসায়ী' কাউকে সঙ্গে আনলে (বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলে ইমপ্রেস করার জন্য) দুটো বিশাল রুইকে সামলাতে হত।

'তারপর ?' বেন বলে।

'কী নেওয়া যায় ?' ঠোঁট চাটতে চাটতে বস্ বলল।

'যা হয় !' বেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরাসক্তি প্রকাশ করে।

'পিলসেনার না টাসকার ?'

'পিলসেনারই ভাল।'

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডেকে ম্যানেজার (বস্) অর্ডার দিল। বিয়ার আসার আগে পর্যন্ত সে উত্তেজনায় আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাতে লাগল। বোতলটি পাওয়া মাত্র হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। মগে ঢালতে গিয়ে বোতলে আর মগে ঠনঠন্ করে বারকয়েক ঠোকাঠুকি হল। প্রথম মগ এক ঢোকে খেয়েই সে 'ওফ' বলে পরিতৃপ্তিসূচক আওয়াজ বের করল গলা থেকে।

বসের ঠোঁটের ওপর সাদা ফেনা থেকে চোখ সরিয়ে বেন আশেপাশের লোকগুলিকে আবার দেখতে চেষ্টা করল। বেশির ভাগ খদ্দেরই ডাবল অর্ডার করছে। পুরো বোতলটি অন্তস্থ করে বস্ হাঁক পেড়ে ওয়েটারকে ডাকল। আরো দুটো পিলসনারের বোতল এল টেবিলে। বেন তখনো সবে দ্বিতীয় গ্লাসটি ধরেছে। ভাবি বসের সঙ্গে বসে এ-আচরণ বিধেয় নয়। পাঁয়তারা কষে সে দ্বিতীয় বোতলটি ধরল। কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার তবুও অনেক এগিয়ে থাকল।

'কনস্ট্রাক্টিং কনট্রাক্টরের সঙ্গে আপনি কতদিন হল আছেন ?' মদ্যপানের গতিবেগ শ্লথ করবার উদ্দেশ্যে বেন জিজ্ঞাসা করল।

'দুই···(ঢেঁকুর)···বছর !'

ওর কথা বলার সময় বেন এক চুমুকে মুখ মদে ভরতি করে।

'দু বছরেই ম্যানেজার ?' সে বিস্ময় প্রকাশ করে।

'ডিরেকটর !' ও শুধরে দেয়।

'বাব্বা, এত অল্প সময়ে !' গ্লাসের বাকি অংশ বেন গলায় ঢালে।

'এ আর বেশি কথা কী ? (গলাধঃকরণ) ঠিকমত লোক ধরতে পারলেই হল।'

'লোক ?'

'ঐ, জানাশোনা আর কি !'

বেন আবার কাঁধ ঝাঁকায়। 'এর আগে কী করতেন ?'

'রাজমিস্ত্রির কাজ।'

বেনের গলায় বিয়ার প্রায় ঠেকে আর কি।

'আমার ভাইয়ের কম্পানিতে কাজ করতাম। রাস্তা বানিয়েছি, নর্দমা তৈরি করেছি, এইসব ছোটখাট কাজকম্ম করা গেছে। বেশ কয়েকটা ছোট কনট্রাক্ট পেয়েছি। এখন বড় ছাড়া নিই না, আর আমি এখন ডিরেক্টর। আরেক বোতল চলবে?'

বেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ক্ষিপ্রপদে ওয়েটার টেবিলে বিয়ারের বোতল রেখে যায়।

'অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, ওছাড়া আজকাল তো কোনো কাজ হয় না,' সশব্দে উদ্গার তুলে সে বলে।

'আপনাকে তো চিনি, মনে হয় একটা কিছু সহজে হয়ে যাবে। আরেকটা বলি?'

বেন আবার সম্মত হয়। তাহলে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হবে মনে হয়, এত পয়সা কি ফালতু খরচা করছে? সাহস করে সে বলে ওঠে, 'কী ধরনের চাকরি আমাকে··· ?'

'ভাল চাকরি। ওরা অন্য লোক নেবে ঠিক করেছিল। আমিই জোরজার করে আপনার কথা বলেছি। আপনার যোগ্যতা বেশি এটা আমি ওদের বুঝিয়েছি। মাইনেপত্তর বেশ ভালই। তবে আপনার জন্য আমাকে একটু বেগ পেতে হয়েছে।'

নিঃশব্দে পান চলল কিছুক্ষণ ধরে। বস বিফ আর হ্যাম স্যান্ডউইচের অর্ডার দিতে গেলে বেন বারণ করল। এখনই এত খরচের মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বিল দেবে কে এখনো ঠিক হয় নি।

কথা ফুরিয়েছে, কিছু করার নেই, বেন সকালের কথা ভাবতে শুরু করল। মাথা নিচু করে কোনোরকমে কনট্রাক্টরের অফিসে ঢোকা, ডিরেক্টর মশাইয়ের এক চাহনিতেই গায়ের রক্ত হিম হবার যোগাড়।

'বসুন,' বস আদেশের সুরে বলেছিল।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর দিয়ে আবেদনপত্রটি এগিয়ে দিয়ে বেন বাধ্য ছেলের মত বসে রইল।

চিঠিটা একবার পড়ে বস অযথা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শুরু করে দিল।

'বয়েস কত?'

'ওখানেই দেওয়া আছে,' বেন উত্তরে বলল।

'ও। (একটু থেমে) ঠিক আছে দেখব। লিখে জানাবো আপনাকে।'

'আমার কোনো ব্যক্তিগত ঠিকানা নেই,' বেন বলেছিল।

ডিরেক্টর চিঠি থেকে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

'বটে,' তারপর বলে, 'আমার একটা জরুরী মিটিং আছে। কাল জানাবো, বা আজকেই ছুটির পর।'

'আমি বরং কাল আবার আসব,' বেন কোনোমতে বলে।

'না থাক, কাল নয়, আজই ব্যাপারটা সেরে ফেলা ভাল। কে জানে বেটার কোয়ালিফিকেশনের লোক যদি আবার কেউ এসে পড়ে।'

বেন ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারল । কোয়ালিফিকেশন মানে একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট ।

'ট্যাভার্নে' গেলে কেমন হয় ?' বস্ বলে ।

বেন মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না না, আমি বরং এখানেই আসব ।'

ডিরেক্টর বাবু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি ফোটালেন মুখে ।

'ঘাবড়াবেন না । এসব কথাবার্তার অ্যাটমসফিয়ার ট্যাভার্ন ছাড়া আর অন্য কোথাও পাবেন না ।'

বেন করুণভাবে হেসেছিল । অ্যাটমসফিয়ারের জন্য নাইরোবি চ্যাপেলই তো যথেষ্ট ছিল । ট্যাভার্নের হল্লার মধ্যে, বিয়ারের বোতলের ঠনঠনানির মধ্যে, চাকরি-বাকরির কথা চেঁচিয়ে বলা যায় ? বেনের পকেটে আছে ধার-করা দুটি এক পাউন্ডের নোট । ডিরেক্টরের পেট ভরতি করতে এক জালা মদ লাগবে ।

সমানে টেনে চলেছে তারা । বেন থেকে থেকে চাকরির কথা তুলতে চেষ্টা করছে, বস্ তখনই আরেক বোতল বিয়ার অর্ডার করছে । এবার নেশা জমেছে । ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে । রাত একটু বেশি হতেই বারগুলি হঠাৎ কেমন ফাঁকা হয়ে যায় । দেখতে তখন অদ্ভুত লাগে । চাকরির প্রসঙ্গেই আসা এখানে, কোনো দোস্তি তো নেই দুজনের, তবু দুজনে বসে গিলতে থাকল । মুখ থেকে মাঝে মাঝে গ্লাস সরাচ্ছিল বস্ বেনের কাছ থেকে সিগারেট বাগাবার জন্য । বেন ঠিক করল, বিয়ারের পেছনে আর খরচা নয় । এ-পর্যন্ত চাকরির বিষয়ে একটা কথাও হয় নি, আর দাতব্য করা চলে না ।

হঠাৎ বোঝা গেল এবার যেতে হবে । টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল তারা । ওয়েটাররা প্রথমটা হাঁ করে তাকিয়েছিল, তারপর এগিয়ে গেল । বেনকে ধরল তারা, বস্‌বাবু ততক্ষণে দোরগোড়ায় পেঁছে গেছে । বেন ঠিক করল বিল ও কিছুতেই মেটাবে না । অত পয়সা খরচ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ।

'এই যে, স্যার,' সে চেঁচিয়ে ডিরেক্টরকে ডাকল । কোনোমতে টাল সামলে বস্ ফিরে তাকায় ।

'ভুলে গেলেন নাকি ?' বেন বেপরোয়া হয়ে বলে ।

বস্ টেবিল চেয়ার এমন করে দেখতে থাকে যেন কিছু ফেলে গেছে । তারপর বেনের দিকে তাকাল । ওয়েটারকে দেখিয়ে বেন বলে, 'এদের পয়সাটা ?'

'পয়সা ? কিসের পয়সা ?'

ওয়েটারকে বেন বলে, 'বলো কিসের পয়সা !'

বেচারা ওয়েটার নৈতিক সমর্থনের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকায় । বলে, 'স্যার, পঁচিশ বোতল অর্ডার করেছেন আপনি ।'

মাতাল বস্‌বাবু বেনকে বলে, 'সিকি ? পয়সা তো তোমার দেবার কতা !'

মাথা নেড়ে বেন বলল, 'মস্করা করছেন ? আমি দেব কোত্থেকে ? আমার চাকরিই নেই ।'

তোতলাতে তোতলাতে বস্ বলে, 'কিন্তু, কিন্তু···কতা হচ্ছিল তো তোমার

চাগারির ব্যাপারে, টাকা তুমি দেবে না তো কি আমি দেব ?'

'মশাই বুঝতে পারছেন না,' বেন প্রাণপণে চেষ্টা করল, 'আমার কি দেবার ইচ্ছে নেই ? কিন্তু সঙ্গে তো আমার পয়সাকড়ি কিছু নেই।'

'সে বাপু তোমার ব্যাপার,' বস্ বলে, 'গোড়াতেই সে-কতা বল্লেই হত। আমি কিস্সু দেব না, পার্টি'ও তো চাঁদ তোমার !'

'পার্টি' আবার কী ?' বেন হিক্কা তুলে বলে, 'কাজের কথা হচ্ছিল, এর মধ্যে আবার পার্টি আসে কোত্থেকে ? অর্ডার দিয়েছেন আপনি, আপনাকেই দাম দিতে হবে, ব্যস !'

আরো ওয়েটার জড় হয় কী ব্যাপার দেখতে।

'তুমি দাম দেবে, চাঁদ,' বস্ আবার বলে।

'না, আমি নয়। আপনাকে দিতে হবে,' বেন বলে।

'বলচি যে এটা তোমার পার্টি, তবু হুঁশ হয় না ?'

'সবকটা অর্ডার আপনি দিয়েছেন, একটাও আমি দিই নি।'

'কী বললি, বাপ ?'

'বলছি অর্ডার দিয়েছেন আপনি, আমি নয়।'

'শালা, বেজম্মা !' মাতাল এবার বেনকে তেড়ে মারতে আসে।

বেন পিছিয়ে গিয়ে ওয়েটারকে বলল, 'তোমরা সাক্ষী, অর্ডার কি আমি দিয়েছি ? বলো ?'

'না স্যার, উনি দিয়েছেন।'

বস্ ওয়েটারটার দিকে ঘুরে বলে, 'চুপ রহ, হারামী !'

যে-কজন তখনো ছিল, মদের নেশা ভুলে দৃশ্যটি উপভোগ করতে লাগল।

'এক আধলাও দোব না আমি,' বলে বস্ আবার দরজার দিকে এগোলো।

এবার ওয়েটারের দল এগিয়ে এসে তাকে বাধা দিল। মাতাল বস্ এক এক করে সবকটা ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে তারপর বেনের দিকে চাইল। বেন উত্তরে একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিল শুধু।

'আরে পুলিশ ডাকলেই হয় !' বিরক্ত গলায় কে যেন বলল।

কাউন্টারে ঝনঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। অকস্মাৎ মাতালের ভাবান্তর হল। ঘাম ঝরতে লাগল শরীর দিয়ে, মুখটা দেখতে আরো বীভৎস হল। রাগে ফেটে পড়ল বাবু।

'শালা বাঞ্চোৎরা ভেবিচিস আমি তোদের মত হাঘরে ? দাঁড়া দেকাচ্ছি···'

মানিব্যাগ বার করার জন্য পকেটে হাত ঢোকাতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'শুয়োর, আমি তোদের মত ভিখিরি ? তোদের, তোদের বউবাচ্চা সবকটাকে গোলাম-বাঁদী রাখতে পারি, বুইচিস ? সবশালাকে পুষতে পারি আমি, বেজম্মা !'

খুচরো পয়সা পকেটে গুঁজে শাপশাপান্ত আর খিস্তি করতে করতে বেরিয়ে গেল বাবু। বেন একটু টলতে টলতে ওর পিছু পিছু বেরিয়ে গেল।

'কুত্তার বাচ্চা ঐ ওয়েটারগুলো ভাবে ওরাই বারের মালিক, শালারা !' বেনের দিকে তাকিয়ে বাবু বলে।

'সত্যি !' এবার বেন সায় দেয়।

'মালিকের চেয়েও বজ্জাত শালারা !'

'বটেই তো!'

দুজনে টলতে টলতে বাবুর গাড়ির দিকে চলল। বাবু সামনের চাকার টায়ারের ওপর মূত্রত্যাগ করল, বেন পেছনের চাকায় আশ্রয় নেয়। মুখে বাবুর খিস্তি লেগেই থাকে। অতগুলি টাকার শোক সহজে ভুলতে পারে না।

'যেতে দিন মশাই,' বেন শান্ত করতে চেষ্টা করে বাবুকে। 'যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুলিশ তো ডাকে নি।' বাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

'আচ্ছা স্যার, তবে আমি কবে থেকে কাজে লাগব ?' বেন জিজ্ঞাসা করল।

'কাজ ? কিসের কাজ ?'

'কেন, আপনি যে-চাকরিটার কথা বলেছিলেন ?'

'ভুলে যাও।'

'ভুলে যাবো ? কী ভুলে যাবো ?'

'এই আজ রাতে যেসব কথাবার্তা হল, সব ভুলে মেরে দাও।' দরজা খুলে বাবু গাড়িতে বপু স্থাপন করেন। বেন রাগে উন্মাদ হয়ে যেন গাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'সেকি, আপনি বললেন চাকরিটা আমার জন্য বলেকয়ে ঠিক করেছেন ?'

'অতই সোজা ? চাকরি কি গাছের গোটা ? চাইলেই হল ?'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো সাহায্য…,' কথা আটকে গেল বেনের মুখে।

'সাহায্য !' বাবু হ্যা হ্যা করে হাসেন। তারপর এবার নিজের পকেট থেকেই সিগারেট নিয়ে ধরান।

বেন সে যা খরচ করেছে মদে তা ফেরত চাইল।

'ভগবান যখন ইস্রায়েলের সন্তানদের সাহায্য করেন, তখন তিনি কি তাদের মুখের সামনে তা পাকা ফলের মত ফেলেন ? তাদের তা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আনতে হয় নি ? পশ্চাদ্দেশ ফেটে যায় নি তাদের ? হ্যা…হ্যা…হ্যা !'

বেনের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল।

গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে বস বলল, 'চাগরির কতা ভুলে যাও, চাঁদ !'

গাড়ি ছেড়ে দিল। বেন মাটিতে বসে পড়ল, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে গাড়িটা একটু দূরে গিয়ে আবার থেমেছে।

'তাহলে, চাকরিটা…'

বাবু হিক্কা তুলে বলে, 'ও হ্যাঁ, বিয়ারের জন্য যা ধার তোমার সেটা ছেড়ে দিলাম।'

গাড়ি আবার চলা শুরু করল।

হতচেতন বেনের মনে তখন অপমানবোধের লেশমাত্র নেই।

সিলভাঁ বেম্বা

ডার্ক রুম

ফরাসি-অধিকৃত কঙ্গোর (বর্তমান জাইর নয়) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। ১৯৬৪ সালে ফরাসি সাময়িকপত্র 'প্রোভ' থেকে তাঁর 'লা শামব্‌র নোয়ার' (ডার্ক রুম) গল্পটির জন্য ফরাসি ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ আফ্রিকান গল্পের পুরস্কার পান এবং তারপরেই তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই গল্পটি প্যারিস শহরে এক আফ্রিকান যুবকের স্নায়ুযুদ্ধের কাহিনী। সিয়েরা লিয়নের বার্ট উইলিয়াম্‌স-এর লণ্ডন-ভিত্তিক গল্পটির সঙ্গে এটা মিলিয়ে পড়বার মত। বহুকাল ধরে তিনি বর্তমান স্বাধীন কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ইনফর্মেশন এজেন্সির প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন।

প্যারিসের রাস্তায় নিজের দাড়িতে ঢাকা জান্তব মুখটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে নুটোকোর খুব ভাল লাগত। নিজের কুশ্রীতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, নীরব ভর্ৎসনার মত করে নিজের বীভৎস মুখমণ্ডল লোককে দেখিয়ে বেড়িয়ে সে এক ধরনের গোপন আনন্দ অনুভব করত। বিরাটাকৃতি নিগ্রোকে দেখে পথচারীরা হতচকিত হত, তাই দেখে নুটোকো দারুণ মজা পেত। ঢোলা পোশাকে তার দেহরেখা অস্পষ্ট, অসমাপ্ত, প্রায় ভৌতিক দেখাত। তবু ওর সঙ্গে পরিচিত হবার পর ওদের কাছে সে আর অনিষ্টকারী বলে মনে হত না। বরং দেখা যেত ঐ বিকটাকৃতি মানুষটার মধ্যে একটা নমনীয়তা একটা আকর্ষণশক্তি আছে।

নুটোকোর প্যারিস খুব ভাল লাগত। আজও তার মনে পড়ে এই সুখ্যাত শহরে প্রথম পদার্পণের কথা। পৌঁছেই তার মন হতাশায় ভরে গিয়েছিল। ও আশা করেছিল সোনার জলে আঁকা প্রচ্ছদের মত অপঠিত শহরটি তার জন্য অপেক্ষারত। কিন্তু মলিন মনমরা আকাশ আর বিবর্ণ বিষণ্ণ দেয়াল নিয়ে প্যারিস তার সামনে বহুকেলে পড়া পুঁথির মত মেলে ধরেছিল। কিন্তু সে পুঁথির পাতা ওলটাতে ওলটাতেই শহুরে যাদুকে আবিষ্কার করল।

প্রতি পাতায় প্রতি ছত্রে সে এক মূর্তির শূন্য দৃষ্টিপাতে সম্মোহিত হল। ইস্কুলের ইতিহাস বইতে যা সে পড়েছিল সেই ইতিহাসের হাজার বছরের পথ

আক্রমণ করল সে: সে-ইতিহাসের তরঙ্গ অধুনার প্রস্তর প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ছে যেন।

বিজয়ী আবিষ্কর্তার আনন্দ অনুভব করল সে। নতুন জগতের আবিষ্কারে রত তার মন। রাজধানীর অতিপরিচিত স্মৃতিচিহ্নকে সে কল্পনার রঙে মিশিয়ে নিল। সম্পূর্ণ নিজস্ব এক প্যারিস অনুসন্ধান তার অভিষ্ট। মেট্রো রেলের মধ্যেও সে মাধুর্যের সন্ধান পেল। দৈহিক প্রেমের প্রতীক হিসাবে ও নিল তাকে, ট্রেনের আওয়াজ কানে গেলেই মনে হত তা কামার্ত প্রেমিকযুগলের শীৎকার। কিছুদিন ওর মনে হত মূর্তিগুলো যেন সচল পুতুল, একটু ছুঁলেই বোকার হাসি হাসবে, গ্রামোফোনে রেকর্ডের খাঁজে পিন আটকালে যে-একঘেয়ে সুর শোনা যায়, সেই মত একই কথা বলে চলবে। নতুন খেলনা হাতে পেয়ে শিশুরা যেমন তা ভাঙে কলকবজা ঘেঁটে দেখবার উৎসাহে, তেমনি মনে মনে সে ঐসব মূর্তি ভেঙে আরাম পেত। আসলে গোটা শহরটি ছিল তার কাছে বিরাট খেলনার মত, তাকে চুরমার করে প্রতিশোধের সুখ পেত। প্রতিশোধ ? কার ওপর, কিসের জন্য ? প্রশ্নের উত্তর নিহিত ছিল মগ্নচেতনায়।

জুক-বক্স-এর ক্রোমিয়ামের আবরণটা ঝকঝক করছিল, নুটোকো আরেকবার উঠে টলমল করতে করতে বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল। যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পকেট উলটে দেখতে লাগল। একটু দূরে থেকে তাকে হিংস্র জন্তুর মুখে নিরুপায় মানুষের মত দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পকেটে একটা সিকি গোছের জুটল, সেটা বের করে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে স্লটের মধ্যে ফেলে দিল। একটা ভোঁতা আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল। ওর মনে পড়ে গেল ওর দেশের মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে শোকগীতির কথা। দেশগাঁয়ে ঐ মেয়ের দল নিখরচায় বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়াত কেউ মরলে। প্রত্যেকে নিজের কোনো এক মৃত আত্মীয়কে স্মরণ করে মুখকে শোকাবহ করে তুলত, ফোঁপানো গলায় সদ্য মৃতের গুণকীর্তন করে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিত।

প্রকাণ্ড বাক্সটার ভেতর থেকে 'জ্যাম-সেশন'-এর কৌকানি অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করল।

উঁচু টুলের ওপর বসে ফ্যাশন মডেলের মত দেখতে দুটি মেয়ে মুহূর্তে দৃষ্টি বিনিময় করল।

নিচু গলায় ওদের একটি বলল, 'উঃ ! ঐ রেকর্ডটা শুনলে আমার মাথায় খুন চাপে ! এই নিয়ে বোধ হয় আজ পঞ্চাশ বার চালালো ওটা ঐ নিগ্রোটা।'

'আমার কী মনে হয় জানিস, এবার বোধহয় ওর দিকে টোপ ফেলা যায়।' অন্যটি বলে, ওকেই বেশি চালাক মনে হয় দুটোর মধ্যে, 'বাব্বাঃ ! যখন এসে ঢুকল তখন কাছে গিয়ে কথা কইব তেমন বুকের পাটা আমার ছিল না ! তবে এখন চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, দেখি পটাতে পারি কি না।'

'দেখিস !' অন্যটা প্রত্যয় সহকারে বলে, 'সহজে গাঁথতে পারবি বলে তো মনে হয় না, বাপু। তাছাড়া, নিখরচায় কাজ সারতে পারে কিন্তু; সাবধান !'

খাপসা ধোঁয়াটে আলোতে নটোকো হঠাৎ দেখে দুটো ফ্যাশন মডেলের একটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও-দুটো প্রাণীর দিকে সে ফিরেও তাকায় নি। এমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল, যেন ঘর সাজাবার জিনিস! মেয়েটা ওর সামনে এসে মুখ খুলতেই ও চমকে উঠল। বাছাই-করা কয়েকটা খিস্তি সে ইস্কুলের ভালছেলের মত মুখস্থ বলে গেল। দম ফুরিয়ে গেল, মেয়েটা তখন সকর্মক হাসি মুখে এঁটে ঠায় দাঁড়িয়ে, নিরুপায় হয়ে নটোকো কাঁধ ঝাকুনি দিল। এটার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে বলে মনে হল না। শালার জোঁক-গুলিকে যমেও নেয় না! হাত দিয়ে সে অর্থবহ ইঙ্গিত করল। তবু হারামজাদী ঠায় দাঁড়িয়ে! ফাঁদে পড়া ছাড়া গতি নেই। বিজয়িনীর হাসি হেসে মেয়েটা ওর সামনে একটা টেবিলে বসে পড়ল। হাতের একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে ওয়েটারকে ডেকে কী একটা বিদঘুটে পাণ্ড অর্ডার করে সেটা পরম তৃপ্তিসহকারে গিলল মেয়েটা।

'ডার্লিং,' কিছুক্ষণ পরে সে বলল, 'একটা চনমনে কিছু বাজানো যাক। এসো না, একটু নাচি?'

বাড়িতে ওকে নিয়ে এসে ওর মেজাজটা আরো খাপ্পা হয়ে গেল। নোংরা দাড়ি আর ছটফটানির জন্য ওকে একটা ভাঙা পুতুলের মত দেখাচ্ছিল। বকবক করতে করতে সে ঘরের এধার ওধার পায়চারি করতে লাগল। মাঝে মাঝে কথার ঝোঁকের সঙ্গে তাল রেখে হাতে নাচের মুদ্রার মত ভঙ্গি করছিল।

'তোমার পেট ছাড়া দেহের অন্য কোনো অঙ্গের দিকে তাকাচ্ছি না কেন জানো? ছেলেবেলায় আমার মা'র পেটের দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে তাকাই নি। মা তো দিয়রের স্টোর থেকে জামাকাপড় কেনে নি? মা'র পোশাক বলতে ছিল শুধু কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটা ছোট ফালি। বাড়ির শেষ সন্তান ছিলাম আমি, যদ্দুর মনে পড়ে আমার তেরটা ভাই ছিল। রাতে মার পেটের ওম ভাবের মধ্যে আমি আশ্রয় নিতাম, অলাবুর মত স্তনদুটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। বাইরের জগতের শতভয় থেকে আমাকে রক্ষা করত সেই উষ্ণতা। আজও নারীদেহের সে-অংশ আমাকে সেই মায়াতে আচ্ছন্ন করে। দেখো, শরীরের এই অংশ সমাজের বহু অমঙ্গলের উৎস— ক্ষুধা, ভয়, অতৃপ্ত কামনা ও আরো কত কি। আমার দেশের মেয়েদের যদি দেখতে! অকল্পনীয় দারিদ্র্যে আমাদের দিন কাটে, তবু আমাদের মেয়েরা বহু সন্তানের জননী। এই আমাদের মত ছেলেরা, বুঝেছ, আমাদের দারিদ্র্যের গৌণ ফসল বলতে পারো। একটু আগেই তুমি দেখেছ আমি বার বার একটা জ্যাজ রেকর্ড বাজাচ্ছিলাম। বলতে পারো জ্যাজ কেন বিশ্বজয় করেছে? মানুষের যন্ত্রণার গহ্বর থেকে বেরিয়েছে বলে। দেখো, আমি তো ক্যাথলিক, ধর্মে মতিগতি আমার নেই, তবু গির্জায় মাঝে মাঝে যাই ধর্মসংগীত শুনতে। এ-সংগীত তৈরি হয়েছে কেবল উচ্চমার্গের আত্মার অমরাবতীর জন্য। কিন্তু গির্জাতে শুধু তেমন গান কেন? শরীরের যন্ত্রণাকে

প্রকাশ করতে পারে এমন সংগীতও চাই। সেদিন কোনো এক কাগজে পড়ছিলাম মধ্য ইয়োরোপের কোথায় নাকি কয়েকজন পাদরি, ছেলেছোকড়াদের টানবার জন্য গির্জাগীতিতে জ্যাজের অনুকরণে সুর লাগিয়েছেন। এতে পাদরি মহাশয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে কতটা সে-নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, আমি খুশি হয়েছি নিগ্রোসংগীতের স্বীকৃতি দেওয়া হল বলে। জান তুমি, আফ্রিকাতে আমার দেশে কালো রঙকে অমঙ্গলের, পাপের চিহ্ন বলে ধরা হয়, আমাদের টমটমকে বলা হয় শয়তানের বাদ্যি? তবে দিন বদলাচ্ছে। আফ্রিকার বহু গির্জায় আজ গুরু গুরু ধ্বনি ওঠে টমটমের। হাম-এর বংশধর হওয়া এখন আর অভিশপ্ত বলে মনে করা হয় না। ইসথার এখন পাথরচাপা ভেঙে বেরিয়ে আসা আফ্রিকার রঙ।'

দম নেবার জন্য সে থামল। মেয়েটা সেই সুযোগে মিনমিন করে বলল, 'বড্ড বকো তো তুমি, সোনার চাঁদ। এসো, আমার পাশে বোসো দেখি একটু!'

'না, ক্রস শুধু আন্তর্জাতিক দুঃখবেদনার প্রতীক হয়ে থাকবে না, আমি তা চাই না।' মেয়েটার কথা তার কানেই গেল না। 'দেখো না, দেখো, ঐ দেয়ালটার দিকে দেখো। কী, কী ওটা বলোতো দেখি?'

মেয়েটা বোকার মত মুখ করে তাকাল, দেখল ছোট হুকের মত একটা কী যেন ঝুলছে।

'কী, কী ওটা, ঠাহর করতে পারছি না,' তোতলাতে তোতলাতে বলল মেয়েটা।

উত্তরে নুটোকোর মুখ থেকে বিদ্রূপের হাসি বেরোল। 'বাঃ, বাঃ, আমরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জাতি, তবু প্রতীকের অর্থ বুঝি না! অ্যাঁ? তা তুমি বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। ঠিকই, আমরা এখন আফ্রিকাতে নেই। সেখানে, একমাত্র সাহেবদের হাতেই আছে অতীতের চাবিকাঠি। নিগ্রোরা যতই চেঁচাক 'চিচিং ফাঁক' বলে, দরজা খুলবে না। আফ্রিকানদের নিজস্ব যাদুমন্ত্র খুঁজে বার করতে হবে নিজেদেরই, সে-মন্ত্রের জোরে ওরা নিজেরাই পারবে পাহাড় ঠেলে সরাতে। সে-কাজে হাত লাগাবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ তা হবার নয়। আমি এখন নিজের ঝামেলাতেই জড়িয়ে আছি। আমার দশা খানিকটা তলস্তয়ের ঐ চরিত্রটির মত; যে বলত সে নিজেই তার কারাগার। যাক, তুমি তবে জানো না ঐ ছবির অর্থ কী? ওটা কৃষ্ণাঙ্গ জগতের ক্রুশচিহ্ন। হুকটা আসলে, বুঝেছ, অত্যাচার পীড়িত যন্ত্রণাবিদ্ধ নিগ্রো-যুবকের নতদেহের মূর্তি। আচ্ছা, তুমি কি জানো, কালো মানুষরা ইন্ডিয়া-রাবার থেকে জাত?'

মেয়েটার আর কোনো সন্দেহ রইল না, লোকটি পাগল। দরজা দিয়ে বাইরে পালানো অসম্ভব নয়। তবু সে এঁটে বসে রইল, লোকটার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু ওর বলার মধ্যে কেমন যেন সম্মোহনী শক্তি আছে মনে হল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' নিগ্রোটি বলে চলল, 'ইন্ডিয়ারাবার থেকে আমাদের

উদ্ভব, আর আমাদের প্র-প্র-প্রপিতামহ ছিলেন মিশেলিন, অথবা মিশেলিন টায়ার-এর যে-বিজ্ঞাপন দেখো রাস্তায় রাস্তায়, তার মধ্যে আঁকা ঐ মানুষটা। তাইতো আমার পূর্বপুরুষদের, আর আমেরিকায় পাচারকরা ক্রীতদাসদের নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে কোনো অসুবিধা হয় নি। ভেবে দেখো, চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাতের প্রলয় আমাদের সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত দেবমূর্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে, আমাদের জগত ছিল যে-উপাদানে গড়া তা ধুয়েমুছে দিয়ে গেল, চুনকাম করা হল ইয়োরোপের প্রলেপে। কী, হাসছ না যে ? মজার নয়, ব্যাপারটা ?'

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছিল সে। বরাবরই এমন হত। যখনই অজ্ঞাত-কারণে ওর মন ভেঙে যেত তখনই ও প্রথমে খুব খানিকটা গিলে মাতাল হত; শেষমেষ কাউকে না কাউকে পাকড়াতো, সে হত তার শ্রোতা ও আক্রমণের লক্ষ্য। ওর অন্যান্য জাতভাইরা কাঠগড়া থেকে শ্বেতাঙ্গদের নিষ্কৃতি দিয়েছে সহজে। ওর কাছে তাদের বিচার সবে হয়েছে শুরু, সে-আদালত এখনো চলছে। সুযোগ পেলেই সে তার অভিযোগ জানাত, যেমন আজ জানাচ্ছে এই নির্বোধ বেশ্যাটাকে।

'সে এক ভয়ংকর প্রলয়,' সে বলে চলল, 'আর্কে ছিল যারা তারা 'জংলী' অপবাদের ভয়ে জলে ঝাঁপ দিল। যারা ইতিমধ্যেই পড়েছিল ঘূর্ণিতে, স্রোতের আবর্তে তারা চূর্ণবিচূর্ণ হল। যারা স্রোতের বিপরীতে সাঁতারে বিমুখ তারা সভ্যতার সার্টিফিকেট পেল। ঐ ছোট্টো সুন্দর সমুদ্রঝড়ের জন্য তোমাদের সাহেব জাতকে দণ্ডবৎ করি।'

'এই,' মেয়েটি এবার মুখ খুলল, 'আমার দিকে অমন করে দেখছ কেন ? আমি বাপু ওসব রাজনীতি-ফাজনীতির ধার ধারি নি, ধারিও না।'

'ও, কলোনি করা-কে 'রাজনীতি' বলো তুমি। আরে যা ভেবেছিলাম তুমি দেখি তার চেয়েও আকাট ! যাকগে, এসো, আমার সঙ্গে এসো।'

যান্ত্রিকভাবে মেয়েটা ওকে অনুসরণ করে একটা ছোট ঘরের ভেতরে এল।

'এটা আমার ডার্ক রুম,' কৃষ্ণাঙ্গটি বলল, 'এখানে আমি ফোটো ডেভেলপ করি। কী হল, অবাক হচ্ছ যে, আমি সত্যি বলছি। কিছু জানাশোনা লোকের দৌলতে আমি একটা নামজাদা কাগজের ফোটোগ্রাফার। আরে হল কী তোমার ? কাঁপছ কেন গো, পিয়ারী ? ব্লু বেয়ার্ডের ভয়ে নয় নিশ্চয় ?'

'কই, কাঁপছি না তো ?'

'হ্যাঁ, কাঁপছ। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালাই।'

এক যুগ হল ঘরে ঝাঁট পড়ে নি, অসম্ভব নোংরা হয়ে আছে চারধার। ছেঁড়া কাগজের টুকরো পড়ে আছে চারধারে, মেঝের ওপরই একটা বেসিন পড়ে রয়েছে। একটা পুরনো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স-এর ওপর কয়েকটা ফাঁকা ফ্রেম পড়ে আছে। আর আছে একটা ক্যামেরা, সেটা এখনো অক্ষত। একটা অবর্ণনীয় গন্ধ গলা টিপে দিচ্ছে যেন, নাকি সেটা বহুবিধ গন্ধের যোগফল ? ক্ষিপ্রহস্তে নুটোকো একটা ড্রয়ার থেকে এক তাড়া ফোটো বার করে আনল।

'দেখো এগুলো,' সে বলল, 'সব ব্রু বেয়ার্ড-এর বলি। গুণে দেখো, যদি চাও। সব কটা মেয়েদের ছবি, সবকটাই আমার উপপত্নী। অবশ্য অন্য ছবিও আছে, কিন্তু তা দেখে তোমার দরকার কী? ভাল করে দেখো ফোটোগুলো। এই যে বহুজনের নাগর আমি, তোমরা যাকে ব্রু বেয়ার্ড বলো—আমি এদের খুন করেছি—অস্ত্র আমার বিদ্রূপ। আফ্রিকার কলোনিতে এমন ভাব দেখাও যেন অন্য গ্রহের মানুষ, অসহ্য ঠেকে, কিন্তু নিজের দেশে এখানে…'

'অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটা তার দিকে তাকালো, লজ্জায় চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। কী করে এরা এমন অশ্লীল ভঙ্গি করে দাঁড়াতে পারল ওর ক্যামেরার সামনে? বুক ধড়ফড় করতে লাগল তার, মাথাটা টিপটিপ করতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকারে ডুব দিল ঘরটা। প্রকাণ্ড দুই হাত তার ওপর হেঁটে গেল রাক্ষুসে মাকড়শার মত।

'সে এক ভয়াবহ দৃশ্য,' বেরনার কাঁইয়ে (নুটোকো যে-কাগজের ফোটোগ্রাফার তার সম্পাদক) টেলিফোনে বলছিলেন। 'শেষমেষ আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। বলে গেল আর নাকি তার মুখদর্শন সম্ভব হবে না। এখনো আমি নিজেকে সামলে উঠতে পারি নি। আরে আমি তো ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু ওর কাজের কথা বলবার জন্য। আমি ওকে বলেছিলাম—"দেখো, তোমার মত কোয়ালিফিকেশন নিয়ে, এরকম ছোটখাট কাজ করার কোনো মানে হয় না, এভাবে পড়ে থাকা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, কটাই বা ফ্রাঁ (ফরাসি টাকা) পাও এতে।" মনে আছে একবছর আগে তুমি যখন ওকে তোমার পুরনো ছাত্র বলে রেকমেন্ড করে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে তখন ওর জন্য রেগুলার স্টাফ হিসাবে আমি একটা চাকরির অফার দিয়েছিলাম? রিপিট করলাম সেটা। অফারটা তো নিলই না, উলটে রূঢ় ভাষায় জবাব দিল। সেদিন ওর হোটেল থেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর কোনো খবর আমি জানি কি না? সেদিনকার সে-কাণ্ডের পর তাকে নাকি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমার তো ভয় হল, ভাবলাম পুলিশে খবর দেব নাকি। শেষমেষ প্রফেসর, তোমার কথা মনে হল। তুমি তো কিছুকাল ওকে পেট্রোনাইজ করেছ, হয়তো তোমার কাছে ওর কোনো খবর…'

'না ভাই,' অধ্যাপক বলেন, 'তবে চিন্তার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। নুটোকে একটু খেয়ালি ছেলে। ঐ একধরনের আর্মচেয়ার ছাত্র আর কি, লেখাপড়াটা ওর কাছে ছিল একটা মজার ব্যাপার। বোচারার রক্তেই ছিল আলস্য, কিন্তু আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল তার। এক কান দিয়ে লেকচার শুনত মনে হত, বড় বিরক্ত লাগত তাতে। সে যাই হোক, প্রশ্নের ঘায়ে তাকে কাবু করা যেত না, লিখিত পরীক্ষায় কখনো ফেল করে নি। এমনকি

আমার মনে হত বিশ্ববিদ্যালয় ও এসেছে অনর্থক সময় নষ্ট করতে। কদিন পর্যন্ত ছিল এখানে? দাঁড়াও মনে করতে হবে। শুধু স্মৃতিশক্তিই নয়, ওর মনটাও ছিল তাজা সজীব। অনেকবার চমৎকার বাকযুদ্ধ হয়েছে আমাতে ওতে। ছেলেটা বুদ্ধিমান ছিল হে, তবে বড় রুক্ষ ছিল তার স্বভাব। কতবার মনে হয়েছে আমি ওর চরিত্রটার একটা সঠিক পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু পরের দিনই নিজের ভুল ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, আজো ওকে আমি খুব মিস করি। না, তোমার কাছে চাকরির জন্য পাঠাবার পর থেকে ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। স্বল্প মাইনের কাজ নিয়েছে—ওটা ওর স্বভাব, ঔদ্ধত্যের বা গর্বের যাই বলো, এ তারই প্রকাশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আঁফাঁ তেরিবল' (ভয়ংকর শিশু। বিখ্যাত ফরাসি কবি জাঁ ককতোর একটি উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের নাম) ছিল সে। সবকটি সহপাঠি, সবকটি শিক্ষককে শত্রু করে তুলেছিল। ওখানে ওর একটাও বন্ধু ছিল না। ওর মত একরোখা অসামাজিক প্রাণী আমি দুটো দেখি নি এ-পর্যন্ত। খেলাধুলা বা বন্ধুদের নাচের আসরে যোগদান, ধার দিয়েও যেত না এসবের; সিনেমা থিয়েটারও দেখত না কখনো।'

'আচ্ছা অধ্যাপক, তোমার কি মনে হয় এর মূলে আছে—মানে, কী ভাষায় বলি—মানে ঐ ইয়োরোপ-বিরোধী মনোভাব… ?'

'না, ঠিক তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওর মধ্যে ওরকম কিছু দেখি নি। সাধারণত যেসব আফ্রিকানরা ফ্রানসে আসে তারা নিজেরাই সব ঔপনিবেশিকতার ভূতের ওঝা!'

'যাই হোক, ব্যাপারটার তো কিনারা করা গেল না, অধ্যাপক। আমার জানি কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে…'

'আমার হচ্ছে না,' অধ্যাপক বলেন, 'যাই হোক, আমি নিজেই ওর হোটেলে যাব, তারপর তোমায় খবর দেব।'

'ভালই হল। আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু যেভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে তারপর আর…'

'বুঝতে পারছি। আমি জানাবো তোমাকে কী হল। গুড বাই।'

গ্রন্থসমুদ্রে নাবিকের মত অধ্যাপক তার লাইব্রেরিতে বসে আছেন। ওঁর ছ'তলার ফ্ল্যাটটা থেকে প্যারিস শহরটা দারুণ দেখায়, বিশেষ করে আইফেল টাওয়ারকে। ড্রেসিং গাউন গায়ে তিনি পায়চারি করা লেন, মন চিন্তামগ্ন। নার্ভাস হয়ে একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন, কোনোটাই সিকিভাগের বেশি ক্ষয় হয় নি, ছাইদানিতে অবশিষ্টাংশগুলি অদ্ভুত আকৃতি সৃষ্টি করেছে।

'প্রফেসর,' ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল, 'আপনার স্যুপ যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা হল।'

মহিলার আসা তিনি টের পান নি। তিনি কৌতুক করে ভাবতেন মেয়েটি

নিশ্চয় মার্জার পরিবারভুক্ত। মহিলার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যবহারগত ও শারীরিক ভারসাম্য ছিল। সব কথাই সর্বদা সমান অনুচ্চারে শোনা যেত, প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল পরিমিত ধীরগতি। প্রতিটি প্রভাতকে তিনি সমান প্রসন্নতায় স্বাগত করতেন। সতের বছর ধরে অধ্যাপক এই ভদ্রমহিলার সান্নিধ্যে আছেন, এর মধ্যে ওদের বাক-বিনিময়ের যে-সংযম ও পারস্পরিক অনুভূতি প্রকাশে যে-পরিমিতি রচিত হয়েছে তা একমাত্র বৃদ্ধ দম্পতি বা বয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে মেলে। অথচ তিনি ছিলেন অধ্যাপকের পরিচারিকা মাত্র। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে তিনি ওঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁর তখন সবে পত্নীবিয়োগ ঘটেছে, ঘরদোর দেখাশোনার জন্য একজন সহায়কের বিশেষ দরকার ছিল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি তিনি।

'ও, সুপ, হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলেন অধ্যাপক, 'ওটা থাক, মাদাম বনে।'

আবার ধীরে পায়চারি শুরু করেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত বাদে মাদাম -নের সামনে থেমে তিনি কী যেন বললেন, ঠিক মাদামকে সম্বোধন করে নয়। এতে মাদাম অভ্যস্ত মনে হল। অবশ্য এ-বাড়িতে কোনো বিষয়েই মাদাম আর বিস্ময় বোধ করেন না।

'এই ছেলেটা,' অধ্যাপক বলছিলেন, 'এই ছেলেটা সবকিছুকেই কেমন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল জানেন, অন্যদের বিনাশ ঘটাতে চেয়েছিল সে, শেষ পর্যন্ত নিজেরই সর্বনাশ করল? এই বিরাট শহরে কোন চুলোয় সে আশ্রয় পেল কে জানে? না অশুভ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেব না, কিন্তু বন্ধুর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করবার মত ছেলে সে তো নয়।'

অধ্যাপকের স্বগতোক্তি অব্যাহত থাকে, 'মনে হয়, পার্সিকিউশন ম্যানিয়ায় ভুগছিল সে। সবাই জানে এ-ম্যানিয়া উন্মাদ-রোগের খুবই কাছাকাছি। এরা সব সময় ভাবে কেউ না কেউ তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে। হয় তারা কল্পিত আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে গুটিয়ে নেয়, অথবা ভয় ঘোচাবার জনাই যাকে সামনে পায় তাকেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। আচ্ছা, মাদাম···'

এতক্ষণে অধ্যাপক সরাসরি মহিলাকে সম্বোধন করেন। 'আচ্ছা মাদাম, আপনিই বলুন তো! ধরুন, আমি আপনার বাড়িতে গেছি। দেখি আপনি নেই। স্রেফ কৌতূহলের বশে আমি যদি সামান্য কিছু একটা হাতে নিয়ে ফিরে আসি, সেটাকে কি চুরি করা বলা হবে?'

'সেটা নির্ভর করে, প্রফেসর। আপনার কাছে হয়তো জিনিসটা সামান্য, কিন্তু যার জিনিস তার কাছে ওটা হয়তো মহা-মূল্যবান, টাকার অঙ্কে নয়, সেন্টিমেন্টের কারণে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' অধ্যাপক বলেন; তখনো তাঁর দৃষ্টি দূরপ্রসারী। 'এই যে নকল চামড়ায় বাঁধানো নোটবইটা আমার হাতে রয়েছে, এটা আমার এক ছাত্রের। ছেলেটি আফ্রিকান। ওর কাছে এটার মূল্য নিশ্চয়

অপরিসীম। দিন কয়েক আগে সে তার হোটেল থেকে উধাও হয়েছে। সেদিন আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, ওর প্রাক্তন শিক্ষক হিসাবে আমাকে ওর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই এটা পাই। কিন্তু এখনো এটা সাহস করে খুলি নি। আমার ধারণা সামনে দরজা পেলেই যে-মানুষ হঠকারিতা করে সেটা খুলে ফেলে এটা একটা বদভ্যাস বিশেষ। দীর্ঘদিনের অধ্যাপনার ফলে একটা বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মুক্তি যাই বলুন, পৃথিবীর পক্ষে তা কি সত্যিই কল্যাণকর ? তা কি সত্যিই মানুষকে আলোকতীর্থে নিয়ে যায় ? বরং কৌতূহলের মধ্যেই সেই আলোর সন্ধান আছে বলে অনুমান হয় আমার। একদিন হয়তো মানুষ এমনই এক দরজা খুলবে যার ভেতর দিয়ে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে না কোনোদিন। আমি নিজে তেমনি এক জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছি। দিনকয়েক আমি ভেবেছি ক্রমাগত, নোটবইটা পড়ব কি পড়ব না। আবার এও মনে হয়েছে হয়তো ওরই মধ্যে আমার প্রাক্তন ছাত্রের কোনো হদিস মিলতে পারে।'

অধ্যাপক আবার নীরবতার সমুদ্রে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মাদাম বনে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন।

বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী হতে চলেছেন ভেবে অধ্যাপক নিজের ওপর বিরক্ত হলেন। কিন্তু অনিশ্চয়তা দূর করার ইচ্ছা এবং নিছক কৌতূহলের আকর্ষণের কাছে তাঁর নীতিবোধ হার মানল। কম্পিত হস্তে তিনি তাঁর ছাত্রের ব্যক্তিগত দিনলিপির পাতা ওলটাতে শুরু করলেন। প্রতিটি তারিখের তলায় একটি করে মেয়ের পদবিহীন প্রথম নামাঙ্ক এবং গুটি কয়েক কথা—'আমার ইচ্ছার কাছে পদানত।' দেখে অধ্যাপকের মনে এক অজেয় অস্বস্তিবোধ হল। ইচ্ছা কখনো বিধি, কখনো কৌশল কিম্বা সাদা কথায় কামনার রূপ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই 'আমার ইচ্ছার কাছে পদানত' শব্দগুচ্ছটি বিরাজমান।

স্পষ্ট বোঝা গেল, নুটোকোর যৌনজীবন ছিল উদ্দাম, কিন্তু অধ্যাপকের সে-বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। তিনি কী যেন একটার খোঁজে পাতার পর পাতা পড়ে চললেন। কত তারিখ, কত মেয়ের নাম পেরিয়ে গেলেন। শেষে একটি পাতার স্পষ্টাক্ষরে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হল মুহূর্তের জন্য, তারপর তিনি মনোযোগ সহকারে পড়ে গেলেন :

নুটোকোর নোটবুক—

'সবে প্যারিসে পৌঁছেছি। একী কর্মব্যস্ততা। আফ্রিকা থেকে কত আলাদা, সেখানে ভাগ্যবাদী অনাসক্ত মানুষকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে সময়। এখানে প্রতিটি মানুষ ধাবমান। সেখানে আমরা অভিশপ্ত, থিসিউসের মত আছি এক ঠাঁই। অন্তত তাই ছিলাম। সে-অচল দশা আর চলবে না। এরা

আমাদের মধ্যে সময়ের চাকা বেঁধে দিচ্ছে তাড়াহুড়ো, আমাদের ঘড়ির কাঁটার মত ঘোরাবে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী।

'সময়ানুবর্তিতা, সুসভ্য দাসের ভদ্রতা যেন! সত্যিকারের রাজা এখানে কই?

'একটা তুলনা দিই। আমাদের পূর্বপুরুষের দৃষ্টিক্ষেত্র একটা ফোটোগ্রাফে সীমিত। এই 'অগ্রসর' জাতিবৃন্দ যেন সিনেমার বিপুল অস্বিত্বে প্রতীকী চেহারা পায়, অসীম স্থানিক ক্ষুধা তার পর্দার আয়তক্ষেত্রে ধরা দেবার নয়। ফোটোগ্রাফ তার বিনয়ী আয়তনে নদীর ক্ষীণধারাকে ধরে, সিনেমা চায় বিশাল সমুদ্রকে ধরতে, যদিও একই যোগে সমুদ্রে বিলীয়মান নদীগুলিকে দেখাবার যোগ্যতা তার নেই।

'পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান দূরবীনে পৃথিবী-সন্নিকট একটি মাত্র উপগ্রহ ধরা দিয়েছে। মফঃস্বলী উপগ্রহ! এমন কিছু হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত নয়, এখান থেকে মাত্র কয়েক কোটি ক্রো দূরে। কোন মহাকাশযাত্রী প্রথম পদার্পণ করবেন সে-উপগ্রহে?

'সিনেমা জগতের হোমড়াচোমড়া যদি হতাম তবে এ-পৃথিবীর জন্য কিছু মূল্যবান বাণী রেখে যেতে পারতাম! একটা অফ-বিট ছবি করে দেখাতাম চুলচেরা থিয়োরির মাধ্যাকর্ষণের জগত থেকে স্থানকাল বিরহিত এক স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে নিয়ে এসেছি পৃথিবীকে। হাজার হাজার দৃশ্যে এই রূপক আশ্রয়ী ছবির শরীরকে মনে মনে আমি সাজিয়েছি। প্রথম দৃশ্যে দেখাব দুটি চরিত্রকে—এক ফোটোগ্রাফার এবং তার ক্যামেরার লেন্স। আতসকাচটি ফোটোগ্রাফারের অনুগত দাস। সংলাপ নিম্নরূপ: লেন্স বলবে, 'তোমার আলোর ঝলক আমাকে অন্ধ করেছে।' ফোটোগ্রাফার বলবে, 'আমার সভ্যতার লক্ষ্যই যে তাই। তবেই তো তুমি আমার দোকানের চশমা কিনবে।' 'যদি সে-চশমা না পরি?' 'তাহলে এই যে নতুন ভুবন তোমার জন্য তৈরি করে দিচ্ছি সেখানে তুমি হাতড়ে বেড়াবে।' আরেকটি সংলাপ: লেন্স বলছে, 'এক্সপোজার কাকে বলে শিখিয়েছ, কিন্তু আমাকে গতির বা ভঙ্গির স্বাধীনতা তো তুমি দাও নি! কেন দাও নি?' 'দেখো গতির গূঢ়তার বিষয়ে আমি এখনো তোমাকে বিশ্বাস করি না। সে-স্বাধীনতা দিলে তুমি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আপাতত আমার আইন অনড়; চলো নিয়ম মতে!'

'অক্লান্তভাবে ফোটোগ্রাফার স্ন্যাপশট নিয়ে যাবে, ক্রমশ লেন্স তার প্রাক্তন বৈশিষ্ট্য হারাবে একে একে। লেন্স বলবে, 'আমি তো এখন সম্পূর্ণ নগ্ন।' 'আমারো অভিষ্ট ছিল তাই, তোমাকে নগ্ন করা। তোমাকে এমন করে নিঃস্ব করা, যাতে তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও।'

'আফ্রিকাকে পশ্চিমী দুনিয়ার উপনিবেশিক গ্রাসকে ছোট মাপের বলাৎকার

হিসাবে শাস্তিবিধান করা উচিত। ব্যাপারটাকে নির্লজ্জের মত যে 'পেনিট্রেশন' বা অনুপ্রবেশ বলা হয় তা নিরর্থক নয়। ভবিষ্যতে উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের ইতিহাস চরম লোভের যুগ বলে নির্দিষ্ট হবে। কে কত দূরে অবধি অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ির যুগ। বেচারা আফ্রিকার কুমারীত্ব হানির, জীবনভর স্থায়ী সেই ভাগ্যচিহ্ন —এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা ? একেই এরা বলে ইতিহাসসৃষ্টি !

'পশ্চিমী দুনিয়ার এই মেকিয়াভেলিপানা, এই নৈতিক অসাধুতা—কি কদর্য ! প্যান্ডোরার মনোহরা বাক্সে করে এ-দুনিয়া বিবিধ পাপ রপ্তানি করে আফ্রিকাতে, বাক্স খোলা হয় আফ্রিকাতে, দুর্বোধ্য অসুখ, অজানা মহামারিতে বিপর্যস্ত হয় আফ্রিকার মানুষ !

'এখানে যদি মানুষ খোঁজো তো মিলবে শুধু জনতা। ঈশ্বরের এ কী অবমাননা। তিনি কি কেবল কলের পুতুল গড়েছেন মানুষ নাম দিয়ে ?

নির্মাণের আদিম পর্বে ভগবান সৃষ্টি করেন শব্দ। মানুষ তা দিয়ে বানায় কথা। কথার বানে ভেসে যায় হাজার হাজার সংকল্প আর আশার ভূমি, কিন্তু সে-বান কোনো নদীপথে বিশ্বসুখের সমুদ্রবাহী হয় না। বাক্যমুখে এদের ইস্পাহানী রুচি, বার বার তাতে একই কথা শোনো, পৃথিবীর মুখে তাতে লেশমাত্র ভাবান্তর হয় না।

'আমাদের কালে গালিলেও বলতেন : 'যাই বলো, পৃথিবী কিন্তু ঘুরছেই।' এই 'যাই বলো' কথাটি ব্যঞ্জনাময়। এর অর্থ : 'হ্যাঁ, কিন্তু কোনদিকে ?' সেদিন পর্যন্ত আফ্রিকা ছিল পরম পূজনীয় প্রথম অলস মহাশয়ের রাজ্য, মহামতি অলস কাঠের সিংহাসনে আসীন। কিন্তু যন্ত্রনির্ভর পশ্চিমী দুনিয়াতে আজ যত অলস (ধনী অলস) আছে তার সিকিভাগও ছিল না সেখানে আগে। অলস রাজবংশের শাসন এরা অব্যাহত রাখছে, আরামকেদারা এদের আধুনিক রাজসিংহাসন। দ্রুতগতিতে পশ্চিমী দুনিয়া আজ ন্যূনতম প্রচেষ্টার আইনের অনুধাবক। লক্ষ্য—কার্যসময় সংকোচন, মেশিনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।

'প্যারিসে আসার পর কটা কদর্য দৃশ্য আবিষ্কার করেছি আমি। ভাবতেও সুখ ! এখানে ভগবানের আসন উলটেছে ! এ-কথার সমর্থনে একাধিক প্রমাণ হাজির করতে হবে। ফিল্ম তৈরি করা অলীক কল্পনা। উপন্যাস লেখার ধৈর্য আমার নেই। এনিয়ে বই লিখতে হলে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, কিন্তু তাতে উলটে গণেশের সার্বিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সে-বইয়ের ভাষা থেকে হেঁয়ালিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। কিন্তু সে-ভাষা তৈরির ক্ষমতা আমার নেই। হ্যাঁ, ক্যামেরার ভাষাতে তার বিকল্প

মিলবে। বাস্তবনিষ্ঠ ভাষার বায়গায় স্ন্যাপশট ব্যবহার করা যাবে, অন্তত কুৎসিত জীবনের প্রতিলিপি হিসাবে। এই নরকে নামা অগণিত মানুষের গাদা গাদা ফোটো তুলতে পারি। ইয়োরোপের লোকরা আমার দেশে তো তাই করছে! ছেঁড়া কাঁথায় ঢাকা আফ্রিকা, মুখব্যাদান রত আফ্রিকা, রঙচঙ মাখা আফ্রিকা— এছাড়া এদের ক্যামেরা আর কী ধরেছে? ওরা বলে ঐ আফ্রিকাই না কি ফোটোজেনিক!

'আমার আদর্শ' : এই পচনশীল জগতের একটি জটিল শট তৈরি!

'পড়াশোনা শেষ করে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারতাম। সেখানে শাসন-বিভাগে উচ্চপদের চাকরি আমার জন্য বাঁধা। তার বদলে একটা বাউন্ডুলে হয়ে এখানে পড়ে আছি। কেন? কখনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি নি বলে? সম্ভবত তাই। আমার এই পঙ্গু-করা লাজুকতাকে আমি সর্বদা কঠোরতার মুখোসে ঢাকি। সবকিছুতেই আমার ভয়। আমি কি একটা দানব? আশ্চর্য, যখনই দুর্ঘটনার ফোটো তুলি তখনই এক অদ্ভুত উত্তেজনাবোধ আমাকে বশ করে। বীভৎস তালগোল পাকানো শরীর, ক্ষতের দাগ আমাকে একরকম প্রতিশোধের সুখ দেয়। এ এক ভয়ংকর অনুভূতি। যতবার এরকম হয়েছে, ততবারই আমি অ্যালকোহলের বন্যায় সে-অনুভূতিকে ডোবাতে চেষ্টা করেছি। আমার ভেতরের মিস্টার হাইড তখন ডক্টর জেকিলকে সম্পূর্ণ স্ববশে আনে। না, এ-বিষয়ে করার কিছু নেই। এ যেন ডার্ক রুমের ভেতরে বন্দিদশার সামিল! দরজা কোনদিকে হাতড়ে পাই না আর। প্যারিস এখন আমার কাছে শুধুই কারাগার, আর আমি নিজেই তার কারারক্ষী।'

এখানেই দিনলিপির সমাপ্তি। হঠাৎ অধ্যাপকের মস্তিষ্কে এক আলোর তরঙ্গ খেলে গেল। 'আমি নিজেই তার কারারক্ষী' কথাটা তাঁর মাথায় দামামার রোল তুলল। তাঁর মনে হল নুটোকো এঘর ছেড়ে যায় নি। নিশ্চয় সে এখানেই আছে। তার স্বল্পকালের জীবনের গুরুভার থেকে হয়ত সে চিরতরে মুক্ত। হঠাৎ অধ্যাপকের মনে এল লেখক জুভেগ-এর একটি কথা : আবেগতাড়িত মানুষকে বিচার করা আগ্নেয়গিরির বিরুদ্ধে কড়কে আদালতে নালিশ করতে এলার মত অর্থহীন।

নাডিন গর্ডিমার

নকল রুশির মাকড়াশি

শ্বেতাঙ্গিনী প্রগতিবাদী লেখিকা নাডিন গর্ডিমারের জন্ম ১৯২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে। তাঁর একাধিক উপন্যাস বিভিন্ন পুরস্কার পায়। কৃষ্ণকায়দের আন্দোলন সমর্থন করার জন্য তাঁর দুটি উপন্যাস দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় নিয়ন্ত্রিত সরকার নিষিদ্ধ করে। 'একদিন কৃষ্ণকায়রা দক্ষিণ আফ্রিকাকে মুক্ত করে নিজেরাই দেশের ভার নেবে'—তাঁর 'Some Monday For Sure' গল্পগ্রন্থের একাধিক গল্পের বক্তব্য তাই। বর্তমান গল্পটি ভারতীয় নাগরিকদের রাজনীতিক চেতনা বিষয়ক।

ডুপ্লিকেটিং মেশিনটা যখন বাড়িতে আনা হল বামজি বললেন, 'ভারতীয়দের ঝামেলা কাঁধে নিয়েও যথেষ্ট হয় নি ?' মিসেস বামজি একটু হেসে (একটা দাঁত ফোকলা) আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'তফাতটা কোথায়, ইউসুফ ? আমরা সকলেই তো এক ভাঙা নৌকোতে চড়ে আছি।'

'না, ও-কথা বোলো না। আমাদের ভারতীয়দের কি পাস নিয়ে বেরতে হয় ? কেলে আফ্রিকানদের প্রতিবাদ করতে হয়, তারাই করুক। লক্ষ লক্ষ কেলে তো রয়েছে।'

বামজি আর পাহাদ-এর (পাহাদ মিসেস বামজির ভূতপূর্ব স্বামী) মিলে বাড়িতে নটি সন্তান। সবকটিই সেখানে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এই ছোট বাড়িতে ছোটদের কানে ওঠা উচিত নয় এমন কথা বলবার আলাদা জায়গা নেই, তাই ওরা আর ছোট নেই আদৌ। শুধু বড়দিদি গার্লি সেখানে অনুপস্থিত, তার বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা অভ্যস্তভাবে অসংকোচে কান পেতে রইল কী কথা হয় শোনবার জন্যে। বামজির হাতে তখনো আধপাকানো সিগারেট। ডুপ্লিকেটরটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা ছাড়া কাপড়ের বাড়িতে ওটা লুকিয়ে আনা হয়েছে। একটা কেলে ওটাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে ট্যাক্সি করে। ছেলেমেয়েরাও ওটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, ঘন চোখের পাতায় ঢাকা ড্যাবডেবে চোখ মেলে।

'বাঃ, ডাইনিং স্পেসে রাখবার জন্য খাসা জিনিস বটে,' বামজি টিপ্পনি কাটলেন। মেশিনটা থেকে ঠাণ্ডা কালো গ্রিজের কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

'সাইডবোর্ডের ওপর দিব্যি এঁটে যাবে,' প্লাস্টিকের কারনেশন ফুল রাখা দুটো গোলাপি ফুলদানি আর ভেলভেটের ওপর হাতে-আঁকা তাজমহলের ছবিটা সরাতে সরাতে মিসেস বামজি বললেন।

রাতের খাওয়ার পর তিনি মেশিন ঘুরিয়ে ইস্তাহার ছাপাতে শুরু করলেন। স্বামী স্ত্রী শোন খাবার ঘরেই, বাকি তিনটি ছোট খুপরির ভর্তি বিছানা, সব কটা ভাইবোনদের দখলে। বড় ছেলেমেয়েরা একই দোয়াত থেকে কালি নিয়ে হোমওয়ার্ক করতে লাগল, ছোটরা চেয়ারের তলা দিয়ে দুধের খালি বোতল গড়িয়ে খেলা করতে লাগল। তিন বছরের বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়লে বোনেদের মধ্যে একজন উঠে তাকে কোলে করে নিয়ে গেল। আস্তে আস্তে সবকটিই বিছানায় শুয়ে পড়ল। বামজি নিজে আগেই শুয়ে পড়েছেন। তরকারি আর ফলের স্টল আছে তাঁর বাজারে। রোজ তাঁকে ভোর সাড়ে চারটায় উঠতে হয় বাজারে পাঁচটার মধ্যে পেঁছবার জন্য। 'আর বেশি বাকি নেই,' বললেন মিসেস বামজি। বড় ছেলেটা বাবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বামজি স্ত্রীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুলেন। স্ত্রী তখনো হাতল ঘোরাচ্ছেন। বাচ্চা পেটে না থাকলে তাঁর শরীরটা কেমন যেন পেরেকে ঝোলানো জীর্ণ পোশাকের মত দেখায়। সস্তা শাড়িতে আর মাথার কালো কাপড়ে তেল কালির দাগ লেগে আছে। ছেলেবেলায় ট্রান্সভালের এক শহরে থাকতে (বাপ মা এখনো সেখানেই) মা নাকে একটা সস্তা দামের নকল রুবির নাকছাবি পরিয়ে দেন। এমন কি তাঁর পক্ষেও সেকেলে বলে অনেককাল তিনি সেটাকে বাতিল করে দিয়েছেন।

শেষরাত পর্যন্ত তিনি ডুপ্লিকেটরের হাতল ঘুরিয়ে গেলেন অনায়াসে, ঠিক যেমন লঙ্কা গুঁড়ো করেন সেই ভাবে।

ইস্তাহারগুলো কিসের তা আর বামজিকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। ব্যাপারটা তিনি কাগজেই পড়েছেন। গত হপ্তা ধরেই আফ্রিকানরা তাদের পাসগুলি প্রকাশ্যে নষ্ট করে কারাবরণ করছে। নেতাদের তৎক্ষণাৎ 'উত্তেজনা সৃষ্টির' অপরাধে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। প্রচার-অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে। নিশ্চয় ছোটখাট নেতাদের ওরা লুকিয়ে রেখেছে, তারাই এখন অফিস-টফিস ছাড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ইস্তাহারে কী লেখা আছে? 'কাল কাজে যেও না'? 'প্রতিবাদ দিবস'? না 'মুক্তির জন্য পাস পোড়াও'? না, দেখার কোনো গরজ ছিল না তাঁর।

বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে স্ত্রীকে অচেনা বা নামে চেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা বামজির অভ্যাস হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ নামী ভারতীয়—আইনজীবী ডাঃ আবদুল মহম্মদ খান অথবা ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মুনোস্বামী প্যাটেল। নিজের বাড়িতে এসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখে একটু আত্মপ্রসাদের বোধ যে তাঁর হয় না তা নয়। পরদিন ফেরার সময় ডাঃ খানকে তাঁর বাড়ি থেকে বেরোতে দেখলেন তিনি। ডাঃ খান, বেশ লেখাপড়া জানা মানুষ, বললেন,

'সত্যি অসাধারণ মহিলা আপনার স্ত্রী।' কিন্তু বামজির তো কখনো তাঁর বউকে তেমন কিছু মনে হয় নি! মুসলমান বাড়িতে ঘরের বউয়ের যা করবার সবই তো করে, কাজের কথা হয়ে গেলেই ও রান্নাঘরে চলে যায়। আজও তাকে সেখানেই পাওয়া গেল, খানা পাকাচ্ছে আর একই সাথে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একযোগে নানা বিষয়ে কথা বলছে—'ডাল খাব না বলতে লজ্জা করা উচিত, জিমি'; 'ডাল ছাড়া পাব কী?'; 'আমিনা, যা শিগ্গির এক মগ জল নিয়ায়'; 'কিছু চিন্তা নেই বাবা, হলদে সুতোর গুটিটা আন, আমি রিপু করে দিচ্ছি। সুচ ঐ সাইডবোর্ডের সিগারেটের কৌটোটার মধ্যে আছে।'

'ডাঃ খান গেলেন মনে হল?' বামজি বললেন।

'হ্যাঁ, সোমবার হরতাল ডাকা হয়েছে। দেশাই অসুস্থ, তাই নিজেই সবাইকে বলতে বেরিয়েছেন। বব জালি কাল সারারাত জেগে ইস্তাহার ছাপিয়েছে। আজ সে আবার গেছে দাঁত তোলাতে।' তিনি ভাল করেই জানতেন রাজনীতি বিষয়ে স্বামীর উৎসাহের অভাবের কথা, তাই তাঁর সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা তিনি আর পাঁচটা ঘরোয়া গপ্পোর মত করেই বলতেন, তার বেশি কিছু নয়।

'কী জন্য তুমি এইসব মারামারি পাথর ছোড়াছুড়ির মধ্যে যাও, জানি না! ভারতীয় কংগ্রেসের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার কী বাপু? নিজের চরকায় তেল দাও আগে।'

স্ত্রী হাসলেন। 'দেখো ইউসুফ, তুমি নিজেই জানো তা সম্ভব নয়। নাটালে গ্রুপ এরিয়া তৈরির সময় তুমি একথা বল নি? তুমি বলেছিলে, "ট্রান্সভালের বাড়ি থেকে তাড়া খেলে তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবো আমরা, এখন কেন?" তারপর কী হল? তোমার নিজের মা-ই তার নুরস্থপের বাড়ি থেকে উৎখাত হলেন! দেখলে তো? কেউই আমরা নিরাপদ নই, বাদামীরাও নয়, কালোরাও নয়! ও হ্যাঁ, গার্লি এসেছিল বিকেলে, ও বলল যে ইসমাইলের ভাইয়ের শাদির পাকা কথা হয়ে গেছে। বাঁচা গেল, না? ওর মা যা ভাবছিলেন, খুব খুশি হবেন এবার।'

'কেন ভাবছিলেন ওর মা?' পনের বছরের ছেলে জিমি জিজ্ঞাসা করল।

'বিয়ে না করে ছেলে থিতু হোক, মা তাই চাইছিলেন। ইসমাইলদের বাড়ি রোববার খানাপিনা। ইউসুফ, সুটটা দিও মনে করে, কাল ক্লিনারকে দেব।'

মেয়েদের একজন বলল, 'মা, আমার তো পরার কিছুই নেই।'

ফ্যাকাসে মুখটা চুলকে মিসেস বামজি বললেন, 'গার্লির গোলাপি ফ্রকটা তো তুই পরতে পারিস। যা ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আয় দেবে কিনা।'

এ-ধরনের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় আছে। বামজি খাবার টেবিল আর সাইডবোর্ডের মাঝখানে কোনোরকমে ঢুকিয়ে-দেওয়া

চকচকে হাতলওয়ালা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে ঝিমুতে লাগলেন, শুধু মাঝেমধ্যে বাক্সবের ঠোক্কর খেয়ে ঝিমুনি ভেঙে যাচ্ছিল। পরদিন সকালে বাজারে গিয়ে শোনেন ডাঃ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ গত রাতে মিসেস বার্মাজি জেগে বসে মেয়ের জন্য একটা কাপড় সেলাই করছিলেন। মিঃ বার্মাজি খুব অবাক হলেন, পরে ভাবলেন ব্যাপারটা বোধ হয় খুব একটা গুরুত্বের কিছু নয়। কিন্তু তাতে বরঞ্চ তাঁর একটু বেয়াড়া রাগ হল, মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন। ভগবান জানে, দিনের বেলা কারা সব এ-বাড়িতে আসাযাওয়া করে? ঐত যে-সপ্তাহে খুব মারদাঙ্গা, ধরপাকড় হল, দু দিন বাড়ি ফিরে দেখেছেন কেলে আফ্রিকান মেয়েতে বাড়ি ভর্তি, বসে বসে খুব চা খাওয়া হচ্ছে। অন্য কোনো ভারতীয় বাড়িতে তা হবে? অবশ্য তার বউতো ঠিক অনাদের মত নয়। সেই জন্যই কি তাকে তাঁর···সেই জনাই তো তিনি পাঁচ ছেলেমেয়ের মা বিধবাকে শাদি করেছেন।

বুধবার মাঝরাতে যখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা দরজা ধাক্কা দিচ্ছে তখনো তাঁর ঘুম ভাঙার সময় হতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি। মিসেস বার্মাজি নিজেই উঠে জিমির বর্ষাতিটার মধ্যে ঠেসেঠুসে গা গলিয়ে বাইরের দরজা খুলতে গেলেন। আলো জ্বালবার পর পাহাদ-এর সঙ্গে বিয়ের উপহার দেয়ালঘড়িতে দেখা গেল তিনটে বাজে। তখুনি বুঝলেন দরজার ওপাশে কে আছে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, তবুও তালা খুলতে গিয়ে বুড়ো মানুষের মত তাঁর হাতটা কেঁপে গেল। দরজা খুলতেই দেখেন সাধারণ পোশাকে দুই কালার্ড পুলিশ।

'জানিপ, বার্মাজি?'

'হ্যাঁ?'

কথার শব্দে বার্মাজির ঘুম ভাঙতেই তাঁর ভয় হল 'উঠতে দেরি হল নাকি!' তারপর পুরুষকণ্ঠের কথা টের পেলেন। অন্ধকারেই বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি জানালার কাছে এলেন। দরজার মত এটাতেও ঘন তারের জাল লাগানো, কাছেই ভিংাগ লেনের রাতের মেহমানদের আটকানোর উপায়। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখেন দুটো পুলিশ ডুপ্লিকেটিং মেশিনের পাশে রাখা বাক্সটাও কাগজপত্র তল্লাশি করছে। 'ইউসুফ, ওরা আমার জন্য এসেছে,' মিসেস বার্মাজি বললেন।'

এক লহমায় আঁচ করলেন বার্মাজি ব্যাপারটা। ঢোলা লম্বা সার্ট পরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দুটো পুলিশের সামনে, কালা নেটিভদের জন্য তাঁর বউকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। 'কী, বলি নি?' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'দেখো এখন, কতবার বলেছি, ওসবের মধ্যে যেও না, বলি নি? নাও, এখন খতম। বেশ হয়েছে।' মাথা একদিকে হেলিয়ে মিসেস বার্মাজি শুনলেন স্বামীর গর্জন, যেন কারো ঘুষি এড়াচ্ছেন, অথবা যেন ভাবছেন, 'বেচারা!'

একটা স্যুটকেশ হাতে জিমি দরজার কাছে এল, দু'তিনটে বোন তার পেছনে। 'এই যে মা আমার সবুজ জার্সি'টা', 'মা, আমার পরিষ্কার ব্লাউজটা পেয়েছি।' বার্মাজিকে কেবলই ওদের যাতায়াতের জন্য সরে সরে দাঁড়াতে হচ্ছিল, ওরা যেন কোনো পারিবারিক উৎসবের প্রস্তুতির জন্য মাকে সাহায্য করছে। এমন কি পুলিশদুটোও 'এক্সকিউজ মি' বলে ওকে সরিয়ে অন্য ঘরগুলি তল্লাশি করতে ঢুকল। জেলে বসে লেখা নেহেরুর একটা বই তারা সঙ্গে নিচ্ছিল, ওটা একজন ভ্রাম্যমান সেলসম্যানের কাছ থেকে বহুকাল আগে কেনা, ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা ছিল। হঠাৎ মিসেস বার্মাজি বললেন, 'না, না, ওটা নেবেন না।' বলতে বলতে পুলিশটার হাত আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু লোকটা কিছুতেই ছাড়ল না। 'ওতে কী হবে মা।' সত্যিই, এ-বাড়িতে ওটা আর কেউ খুলে দেখে নি কস্মিনকালে, তবু মিসেস বার্মাজি বললেন, 'না, ওটা আমার ছেলেমেয়েদের জন্য থাক।'

'মা, ওটা ছেড়ে দাও,' গাবদাগোবদা জিমি খানু দোকানদার যেমন চেনা মহিলা-খদ্দের বাক্সে শাড়ি পছন্দ করলে বলে, তেমনি কায়দায় বলল।

মা অন্য ঘরে গেলেন কাপড় ছাড়তে। হলদে শাড়ির ওপর বাদামি কোট পরে বেরিয়ে এলেন, ছেলেমেয়েদের মুখগুলো তার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সারিবাঁধা মুখের মত মনে হল। ওরা মাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানালো। পুলিশের তাড়া নেই, মিসেস বার্মাজি যেন বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচেন।

'আমি এখন কী করব?'—বার্মাজি যেন সবাইকে একসঙ্গে অভিযুক্ত করলেন। পুলিশদুটো চুপচাপ।

'কোনো অসুবিধা হবে না, গার্লি' দেখাশোনা করবে'খন। আর বড়রা নিজেরাই নিজেরটা দেখবে। আর ইউসুফ—' ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ছোটদুটোরও ঘুম ভেঙে গেছে। 'কি হয়েছে, মা কোথায় যাচ্ছে,' চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করল তারা।

'চলুন এবার,' পুলিশদুটো বলল।

'আমার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই বলে তিনি পিছিয়ে এলেন। পলকের জন্য তার শাড়ির আঁচল তাদের দুজনকে সবার আড়াল করল। 'নিশ্চয় কোনো বেয়াকুবকে কোনো খবর দিতে বলবে ঐ ইস্তাহারগিরি চালিয়ে যাবার জন্য, আর তারপর তার নিজের হাতেও হাতকড়া পড়বে'—মুহূর্তে বার্মাজির মনে এই চিন্তাটির উদয় হল। 'রোববারে,' মিসেস চাপা গলায় বললেন, 'ভুলো না কিন্তু, নেমন্তন্নে নিয়ে যেও ছেলেমেয়েদের, না গেলে ইসমাইল খুব দুঃখ পাবে।'

গাড়িটা নশব্দে চলে গেল। জিমি বাইরের দরজায় কুলুপ এঁটে দিল, হঠাৎ আরেকবার খুলেই, মার ছেড়ে রাখা বর্ষাতিটা তুলে নিয়ে, 'গার্লি'কে বলে আসি' বলে ছুটল বাইরে। অন্যগুলো যে যার জায়গায় শুয়ে পড়ল। বাপ তাদের কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। ওদের শোবারঘর থেকে ছোটদুটোর

কান্না, বড়গুলোর কথা কাটাকাটির আওয়াজ আসতে লাগল। নিজেকে তার দারুণ একা মনে হল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন সময় হয়ে গেছে। কোনোমতে প্যান্টের বোতাম এঁটে তিনি কাজে বেরিয়ে গেলেন।

সাইডবোর্ডে ডুপ্লিকেটিং মেশিনটা আর নেই। পুলিশরা ওটাও নিয়ে গেছে। সঙ্গে আরো সব কাগজপত্র: কনফারেন্স রিপোর্ট, কিছু পুরনো খবরের কাগজের বাণ্ডিল, সাহেবদের ফর্সা মোটা খবরের কাগজগুলো নয়, পাতলা হলদেটে গুলো। যখন বার্মজি ওঁকে বিয়ে করেন এবং ওঁর আগের পক্ষের পাঁচ বাচ্চা নিয়ে এখানে এই পাহাদের বাসাতে ওঠেন, তখন তিনি ওদের কাজকর্ম কিছু বুঝতে পারতেন না। মিটিং, তারপর খাবার টেবিলে বসে কীসব লেখা, কোলের বাচ্চাটাকে মাই দিতে দিতে সরকারি ব্লু বুক থেকে কী সব পড়া ও আবার কাগজে সেসব লেখা। সেসব পাহাড়-করা কাগজ নিয়ে গেছে ওরা।

বাড়ি নিঝুম। বাচ্চাগুলো দরজা বন্ধ করে সকলে বিছানাতে বসে কীসব করছে। বসে সাইডবোর্ডের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, তাজমহলের ছবি আর প্লাসটিকের ফুল ঠিক জায়গাতেই আছে। বাড়ির আবহাওয়াতে মনে হয় বার্মজি বউকে গালাগাল করেছেন চেঁচিয়ে, কান্নাকাটি করেছেন, কিন্তু আসলে কিছুই করেন নি তিনি। কোথায় আছেন এখন তাও কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি। গার্লি আর জিমি প্রথমে উকিল মহম্মদ ইব্রাহিমের কাছে গেছে, তারপর তিনি খুঁজে পেতে পাশের শহরের জেলে ওদের মা আছেন জেনে, ছেলেটার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছেন বাইরে, এরপর তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে জানবার জন্য। শেষ পর্যন্ত খবর পেয়েছেন তাকে পঞ্চাশ মাইল দূরে রাজধানী প্রিটোরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিমি বার্মজির কাছ থেকে পাঁচ শিলিং চেয়ে নিয়ে গার্লিকে দিয়েছে ট্রেনভাড়া বাবদ। একবার পুলিশ গার্লিকে জেরা করে তাকে মার সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছে, বার্মজি জিমির জন্য বাড়তি তিন শিলিং টেবিলের ওপর রেখেছেন, ছেলে বুঝতে পারে নি কেন।

পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজনরা খবর পেয়ে এলে পর বার্মজি হঠাৎ মুখ খুলেছেন। এর আগে তাদের সঙ্গে কখনো এতটা দিলখোলা হয়ে কথা বলেন নি তিনি। 'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছ কেমন আছি আমি। দেখছ তো কী করেছে সে আমার। বাড়িতে নটা অপোগণ্ড, দিনভর স্টলে দাঁড়িয়ে থাকার ধকল, বাড়ি ফিরতে সাতটা আটটা বেজে যায়। কী আর করবে তোমরা ? আমাদের মত লোকেরা কী বা করতে পারে ?'

'বেচারা বার্মজিবেন, এত ভাল বিবি তোমার !' 'দেখো, বোঝো, তোমরা নিজেরাই বোঝো ; রাতবিরেতে হামলা করে, ঘরভর্তি বালবাচ্চা রেখে ওকে নিয়ে গেল দুশমন দুটো। দেখে কে ওদের, সারাদিন আমি দোকানে থাকি, আমার তো রুটির পয়সা কামাতেই হবে, না কি ?' বলতে বলতে তিনি

প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে যেতেন, মেয়েদের ডেকে মেহমানদের ফলের রস দিতে বলতেন। তারা বিদায় হলে, হঠাৎ চুপ মেরে যেতেন। নিজেই বুঝতেন না এতক্ষণ ধরে কী বকবক করছিলেন। মেজাজ ঠাণ্ডা হতেই দুঃখে ক্ষোভে গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠত আবার।

এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখেন ভাইবোনেরা আমেদ নামে ছেলেটাকে ঘিরে হৈচৈ করছে। বাপকে দেখেই ওরা বলল, 'বাবা, ওরা আমেদকে ভীষণ বকেছে।'

'কেন, কী করেছে ও?'

'কিছু করে নি, বাবা, কিছু না,' একটা মেয়ে উত্তেজিত হাতে রুমাল মোচড়াতে মোচড়াতে বলল।

বড় মেয়েদের মধ্যে মায়ের মত রোগা যেটি সে বলল, 'স্কুলে মাস্টারমশাই ওকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছে—"এই ছোঁড়াকে দেখ সবাই? ওর মা জেল খাটছে নেটিভদের দলে বলে, জানিস? ওর মা চায় আমরা ভারতীয়রা সবাই নেটিভদের সঙ্গে গলাগলি করি, নেটিভই হয়ে যাই"।'

'খোদা!' বামজির হাতদুটো হাতল থেকে খসে পড়ল। 'তোদের মা'র তাই মতলব?'

'মা তো ঐ জন্যই এখন ফাটকে।' জিমি তার কমিক বইটা সরিয়ে টেবিলের ওপর ইস্কুলের বইগুলি ব্যাগ খালি করে রাখল। 'আমাদের এখন এসব ভাল করে বুঝতে দেওয়া উচিত।' হঠাৎ জিমিকে অনেক বড় বলে মনে হল। 'ঐ কালার্ড মাস্টার পিটারসন, যদি কেউ বলে "গায়ের রঙে কী আসে যায়, সবাই তো সমান" তবে ক্ষেপে যায়, কেন জানিস? তা হলে যে ওকে আধাসাহেব বলে কেউ খাতির করবে না।'

'ও, পনের বছরেই বেশ লায়েক হয়েছিস দেখছি? সবজান্তা?'—বামজি গজগজ করে উঠলেন।

'মা-কে ভাল করে জানি,' ছেলেটা হেসে বলল।

রাজনীতিক বন্দিরা অনশন ধর্মঘট করেছে। বামজি গার্লিকে সাহস করে জিজ্ঞাসাই করতে পারলেন না, তাদের মা না খেয়ে আছে না কি। জিজ্ঞেস সে কখনো করতে পারবে না, কিন্তু মেয়ের চোখে মায়ের উপোষী মুখের ছায়া দেখতে পেলেন। এক সপ্তাহ ধর্মঘট চলার পর, একদিন খাবার টেবিলে বসে বড় একটি মেয়ে কেঁদে উঠল, খেতে পারল না। বামজি রাগে নিজের প্লেটটা ঠেলে দিলেন। মাঝে মাঝে তাকে স্টল থেকে চাকাওয়ালা গাড়িতে তরকারি ফিরি করতেও হত, একদিন তিনি গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করলেন। 'কিসের জন্য, কিসের জন্য শুনি?' বব-ছাঁটা স্কার্ট-পরা মেয়েদের মত তাঁর বউতো আধুনিকা নয়। একজন সাধারণ মুসলমান জেনানাকে শাদি করেছেন তিনি, মশলা পেষা আর বাচ্চা পেটে ধরা যার কাজ। হঠাৎ চোখের সামনে বউয়ের ডুপ্লিকেটিং মেশিনের হাতলধরা চেহারাটা ভেসে উঠল, মনে মনে ভয়ংকর খেপে গেলেন, পরেই বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। একটা

অজানা অপরাধের বন্দির প্রেতাত্মা বলে মনে হল নিজেকে।

অনশন ধর্মঘটের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হল। তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন, 'ঐ কালা নেটিভগুলো, যারা আমাদের দোকানের শার্সি ভাঙে, সুযোগ পেলেই যারা আমাদের খতম করবে, তাদের জন্য এত ? মরবে তো দেখছি না খেয়ে জেলে ! শালা কেলে শয়তানের দল পুড়িয়ে মারবে আমাদের !' রাতে বিছানাতে ধপ করে পড়তেন আর ভোরে মার-খাওয়া পশুর মত কোনোমতে উঠতেন বিছানা ছেড়ে।

একদিন ভোরে রান্নাঘরে টেবিলে বসে কড়া চায়ে রুটি ডুবিয়ে গিলছেন যখন, গার্লি এসে হাজির। ওর আসল নাম ছিল ফাতিমা, ফ্যাক্টরিতে যাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের নকল করে ঐ নাম নিয়েছে, আর স্কার্ট পরতে শুরু করেছে। দগদগে লিপস্টিক লাগায় ঠোঁটে, চুল কুঁচকেছে আফ্রো কায়দায়, মুখে সবসময় বোকা বোকা হাসি। ওরও প্রথম বাচ্চা হবে।

'কী ব্যাপার,' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। বোকা বোকা হেসে সে বলল, 'মনে নেই ?' বাবিকে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম খুব সকালে তুলে দিতে, যাতে তোমাকে ধরতে পারি। জানো, না আজ তোমার জন্মদিন ?'

'না, ওসব মনে নেই, তা ছাড়া—' হঠাৎ কথা থামিয়ে ঝটপট খেতে শুরু করলেন। মুখ চলছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি গার্লির দিকে। গার্লিও চুপ, মুখে শুধু বোকা হাসিটা আটকে আছে। মুখের দলাটা কোনো রকমে গিলে 'আজ কাল ওসব মনে থাকে না' বললেন তিনি। মেয়েটা মাথা নাড়ল। উলওয়ার্থের সস্তা কানের দুলদুটো দুলে উঠে চিকচিক করতে লাগল। 'মা কাল দেখা হতে প্রথমেই বলেছে, "কাল কিন্তু বাপিজর জন্মদিন, ভুলিস না" ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাপিজ ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। 'বুড়োদের আবার জন্মদিন কি ! সব ব্যাপারেই তোর মা-র বাড়াবাড়ি। পাড়ার খেঁদিবুচি, কার নানা, কার ফুফু, সকলের জন্মদিন ওনার মুখস্থ। জেলে বসে এসব কথা মাথায় আসে কী করে ? কিছু বুঝি না তোর মা-র কারবার !'

'মা কাউকেই বাদ দিতে চান না, বাপিজ। সকলের সম্বার সব কথা মার মনে থাকে, কার বাচ্চা খেতে পায় না, কার বাচ্চার স্কুলের বই নেই—সব, জানই তো মা-র স্বভাবই ঐ।'

'কই আর কেউ তো ওর মত নয় ?' এটা আধা অভিযোগের মত শোনাল।

'না, কেউ না,' সংমেয়ে বলল।

'পেটটা চেপে ধরে গার্লি টেবিলে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। হাতে মাথা রেখে বাপিজ বললেন, 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু একটা অদ্ভুত বোধ, একটা প্রশ্নের সমাধান তাঁর মনকে অধিকার করল। কেন তাঁকে, পাঁচ সন্তানের জননী আধবুড়ি কুশ্রী বিধবাকে তাঁর মনে ধরেছিল। তিনি বুঝতে পারলেন ঠিক কোথায় তাঁর বউ আর সকলের মত নয়। সেখানেই তাঁর বউ বাস্তব, বাস্তব তার ও তার মেয়ের মাঝখানে ঐ জঠরে অপেক্ষমাণ অনাগত শিশুর মত।

দ্রিস শ্রাইবি

অশ্বশেষ

১৯২৬ সালে শ্রাইবির জন্ম। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন কাসাব্লাংকা শহরের ফরাসি গ্রামার স্কুলে। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে যান উচ্চশিক্ষার্থে। শিক্ষাশেষে প্যারিসেই বসবাস করেন কিছুকাল। ছোটখাট নানারকম কাজ করে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে রুজি রোজগার করেন। মাঝে ফরাসি রেডিওতেও কাজ করেন। পঞ্চাশের দশকেই লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। গোড়ার দিকে তাঁর লেখায় তীব্র ইউরোপীয় বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, কিন্তু পরে তিনি মরক্কোর আরব সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারসাম্য বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ফ্রান্সে প্রবাসী মরক্কানদের মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। বর্তমান গল্পে তিনি মরক্কোর রাজনীতিক দ্বন্দ্ব রূপায়িত করেছেন।

দরজাটা খুলে গেল, হাজ মুসা একটি দেহের—মৃতদেহের ভার হাতে বহন করে বেরিয়ে এলেন।

সামনের দরজা খুলে সাতটি সিঁড়ি বেয়ে দৃঢ় সম্ভ্রান্তপদে অকম্পিত অহিংসার মুখে তিনি যাদের সামনে নেমে এলেন তারা ছিল জনা বারো পথিক এবং ভিক্ষুকসমষ্টি। সর্বনিম্ন ধাপে এসে তিনি দাঁড়ালেন, স্ট্রেচারের হাতলের তুল্য সমান্তরাল দৃঢ় হাতদুটিতে তিনি কী বহন করে আনছেন তা সকলেরই জানা। যারা শুয়েছিল তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। দ্রুতপদে যারা চলছিল পথে তারা থমকে দাঁড়ালো—মুহূর্তের মধ্যে স্থানটিতে একটি নীরব ঘন জনতার সৃষ্টি হল। শুধু হাজার জোড়া ঠোঁটে মৃতের জন্য অস্ফুট প্রার্থনার গুঞ্জনধ্বনি উঠল।

ঘটনাটি ঘটে গেল: সর্বাঙ্গ সাদা পোশাকে মোড়া, মাথায় শিরবসন, আবৃতপদ, প্রসারিত বাহুতে তাঁর পৌত্রের মৃতদেহ (নাম রশিদ, তিনি তাকে ডাকতেন 'ভাবী প্রজন্ম' বলে) সাদা চাদরে ঢাকা। মৃত্যুর মতন কঠিন পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চললেন, আগস্টের সূর্যের প্রখর তাপ সামনের বাড়িগুলি ও ফুটপাতকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, সেই তাপকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন বৃদ্ধ। ভ্রূক্ষেপ করেন না তিনি কোনো মানবিক অনুভূতিকে, এমন কি কষ্টকেও; শুধুমাত্র পদক্ষেপে তার মনোযোগ নিবদ্ধ। জনতার মাঝখানে পথ কেটে তিনি বেরিয়ে

এলেন, তাদের দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। যেসব রাস্তা পেরিয়ে চললেন তা ভাল করে দেখলেন না, মনেও থাকবে না সেসব পথের কথা। সোজা সামনে চলেছেন, যেন এক জনশূন্য নীরব শহরের মাঝখান দিয়ে যেন কোনো কুয়াশা বা নগরের আকৃতিগ্রাহী অস্থায়ী এক কুয়াশার মধ্য দিয়ে; যেখান দিয়ে চলেছেন সেখানেই সেই অকস্মাৎ বৈকল্য, একই আকস্মিক নৈঃশব্দ্য সমস্ত মানুষ ও সবকিছুকে ম্লান করেছে; যেখান দিয়ে যাচ্ছেন সেখানেই হাজার হাজার ওষ্ঠযুগলের মৃদু প্রার্থনাবাণী তাকে অভ্যর্থনা করে।

সমাধিক্ষেত্রে সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছে তাঁর পিছনে, আবালবৃদ্ধবণিতা, সবলাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ মানুষের জমাট জনতা নীরবে সমবেত; শিশুর, যেকোনো শিশুরই মৃত্যু বেদনাবহ। হাজ মুসা তাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তাকালেও তাঁর দৃষ্টিতে সবই শূন্য মনে হত, হাজার হাজার মানুষের অস্তিত্ব ও মৃদু নিঃশ্বাস তার গোচর হল না।

আনেরধূলিধূসরিত খনিত্রের কবর থেকে বেরিয়ে এসে কোদাল গাঁইতি ছুড়ে ফেলল। সুনিপুণ হাতে তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছে সে, ট্রাকটার চালক আর পাদুকা-কারিগরের মধ্যেও সেই নৈপুণ্যই দেখি। 'হতভাগা মোরা, ধুলোয় মিশোয়ে যাব,' উৎকণ্ঠে বলে সে আর্তনাদের মত।

শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মানুষটি কবরে নেমে পরম যত্নে ধীরে দেহটিকে শুইয়ে দিলেন, যেন দোলনায় শায়িত করেন পৌত্রকে। বাইরে বেরিয়ে এলে দেখা যায়, চোখে তাঁর একফোঁটা জল নেই, কণ্ঠে বাজে না কোনো প্রার্থনাধ্বনি। কোদালটি তুলে নিয়ে শান্তভাবে কবরে মাটি ফেলতে লাগলেন তিনি। তারপর জানু পেতে বসে হাত দিয়ে মাটি সমান করতে লাগলেন, রুগ্ন বালকের দেহ যেন সযত্নে চাদরে ঢাকেন তিনি। তারপর বদ্ধজানু হয়ে বসে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে, চোখের উপর হাতের পাতার আড়াল। হাতদুটো ঈষৎ কম্পিত, স্বীয় ও সামগ্রিক মানবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ব্যথাকাতরতাকে শান্ত করবার প্রচেষ্টায়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। একজন এগিয়ে গেল তাঁকে উঠতে সাহায্য করবার জন্য। এক সমব্যথী শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে তাঁর সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। কোনোরকম ভাবনাচিন্তা না করে হাজ মুসা হাতখানা ধরে উঠতে লাগলেন। অস্তগামী সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন হাতটি সাদা দস্তানায় ঢাকা, একটি কাগজে-মোড়া প্যাকেট বগলে চেপে-ধরা। শতসহস্র করতালের শব্দে তাঁর সংবিৎ ও স্মৃতি ফিরে এল চকিতে।

কবরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ধীরে ধীরে বললেন, 'ঐখানে ভাবি জমানা মাটি চাপা পড়ল, হাল জমানা ফাটকে, এখনো জানে না তার বেটা গোর চাপা। আর আমি, পিছু জমানার মানুষ, শুধু আমাকেই আমার নসীবের সাক্ষী থাকতে হবে তামাম লোকের জন্য।'

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পুলিশ কনস্টেবলটি বলল, 'আজ্ঞে···আমি···মানে

এই প্যাকেটটা আপনার জন্য।'

'কী সে-জিনিস, কী এনেছেন এই বুড়ের জন্য আপনি ? কিছু শুষ্ক সান্ত্বনা ? আরো কিছু আশার বচন ? বলছি তো আপনাকে, তিন জমানার আদমি এখানে গোর চাপা।'

উত্তেজনার বশে তাঁর হাতটি তখনো কম্পমান। 'বলছি তো, রশিদ আমার মরে গেছে। ওর বাপজান সে-খবর জানেও না এখনো। আমিও জানি না সে-ই বা কোথায়। বেটা তার জিন্দা ছিল মাত্র দু' সাল। দশ ঘণ্টা হল সে বেহেস্তে গেছে। এখন কী এনেছেন আমার জন্য ? সরকারি সমবেদনা ?'

'না, মানে…,' পুলিশ কনস্টেবলটি আরো অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'খোদার কসম, আপনার এই ক্ষতিতে আমি সত্যিই মর্মাহত। সরকারি ইউনিফর্ম পরেছি বলে কি…, শুনুন…'

কিন্তু মুসাব কানে কোনো কথা গেল না। পিছন ফিরে তিনি ধীর পদক্ষেপে সমাধিক্ষেত্রের বাইরের পথে এগিয়ে গেলেন।

'দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন। শান্তিতে থাকতে দিন আমাকে। মাসের পর মাস ধরে আপনাদের দোরে ধন্না দিয়েও আমার ছেলের কোনো সংবাদ পাই নি। কোন গারদে সে আছে, কেন তাকে আটক করা হয়েছে, কে তাকে আটক করেছে, সত্যিই আটক করা হয়েছে না অন্য কিছু, পুলিশের লোক হয়েও আপনারা এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। যাক ছেড়ে দিন আমাকে। আবার একটা মিথ্যে আশার বচন শুনে কী হবে ? হ্যাঁ, যেদিন বুঝব আপনাদের কোন আইনটা মানবিক, কোন আইনটা ভ্রাতৃভাবাপন্ন, কোন আইনটা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়—সেদিন আবার আশা করতে শুরু করব, তার আগে নয়। শান্তিতে আমার পুরনো ডেরায় আমাকে ফিরে যেতে দিন, সেখানে অপেক্ষা করে বসে থাকব কবে এই ঝড়ের মত এই বন্যার মত দুর্দিনের শেষ হবে তার জন্য। আর বসে থাকব আমার ছেলের প্রতীক্ষায়, ফিরে সে একদিন আসবেই, আসবে না ? দেখছেন তো বাপ হয়েও কত ঠাণ্ডা, কত পাথর আমি। হ্যাঁ, একটা উপকার করতে পারেন কি ? ফিরে গিয়ে আপনার ওপরওয়ালাদের বলবেন, আমি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। সেলাম।'

তিনি গেটের দিকে যেতে শুরু করেছেন, পুলিশটি দ্রুতপদে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পার্সেলটি গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা তার শেষ চিহ্ন। ওপর-ওয়ালাদের হুকুম এটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দয়া করে আমার ওপর রুষ্ট হবেন না, আমি হুকুমের চাকর মাত্র।'

হাজ মুসা মন্ত্রচালিতের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। পার্সেলটা খুলে প্রথমে তাঁর কিছু বোধগম্য হল না। পুলিশটি পকেট থেকে নোটবুক বার করে জিনিসগুলো মিলিয়ে নিতে লাগল।

'একটা চামড়ার বেল্ট…একটা কাছিমের খোলের চশমা…বিদেশী টাই একটা—

এই তো ? মেহেরবানি করে যদি এখানে একটা দস্তখৎ করে দেন !'

মুসা কলমটি নিয়ে সই করে দিলেন । তখনো ঘটনাটির গুরুত্ব তাঁর বোধের অগোচর । সকলে চলে যাবার পর মুসা কোমরবন্ধনী ও টাইটা চিনতে পারলেন । তাঁর পুত্রের শেষ চিহ্ন ।

মৃত বৃক্ষের পতনের মত ধরাশায়ী হবার কালে অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ ওঁকে ছুঁয়ে গেল ।

পুত্রকে তিনি বলতেন, 'তোর জমানা যেন আমার জমানা থেকে অনেক বেশি চওড়া হয়, বাপ ।' তিনি বলতেন, 'একঘেয়ে রসুইবাঁধির মত শুধু একটা বাড়ি তোকে দিয়ে যাব না, ওতো সেরেফ ইঁটের পাঁজা, টিমটিমে মশাল দিয়ে শুধু কয়লার চুল্লি ধরাবো কেন, বাপ । ব্যাংকের টাকাও তো শুধু কাগজের টুকরো । আমি তোকে অন্য জিনিস দিয়ে যাবো, আসলি চীজ —দরাজ দিল, পোক্ত মগজ ।'

তিনি আরো বলতেন, 'আমার জমানা ছিল সাদামাঠা, চাষবাসের কাজেই দিন কাটত । তোর দিন সেরকম হবে না, বাপ । তোকে লড়তে হবে, হিম্মৎ চাই তোর । তাই তোকে বাইরের নয়া দুনিয়ায় ছেড়ে দিলাম, তুই সুখী হবি, দুনিয়া জিতে নিবি, ফিরে এলে লোকে মান্য করবে, যেমন আমাকে করে এরা । মানুষ তো এমনি করেই এগিয়ে চলে রে, বেটা ।'

এই বলে মুসা তাঁর পুত্রকে বাইরের দুনিয়ায় ছেড়ে দেন । ছুটিছাটার সময় দেখেন পুত্রের মধ্যে পরিবর্তন আসে, পিতার বিশ্বাসে বিচারে তার সংশয়, এমন আদর্শের কথা বলে যা মুসার অনধিগত । তবু তিনি কোনো মন্তব্য করতেন না, বরঞ্চ যেসব বদলের কথা ও বলত তা ওদের আমলের পক্ষে মঙ্গলকর হবে বলে মেনে নিতেন ।

হাজ মুসার কৃতী ছেলে, কামানো মুখ, কর্মঠ ও জাগ্রতমন । বাজার অঞ্চলের এক অংশকে কাজের যায়গা বলে ঠিক করে নিল, সকলেই তাকে প্রথম থেকেই আন্দোলনের অগ্রণী বলে স্বীকার করে নিল । সভাসমিতির আয়োজন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, সব কাজেই সে প্রাণ-পণে রত । হাজ মুসা প্রায়ই সন্ধ্যায় তার কর্মনিষ্ঠ পুত্রকে দেখতে যেতেন। তিনি তাঁর প্রথামত প্রার্থনার আসনে বসতেন । চার পাঁচটা টেলিফোন একসঙ্গে বেজে উঠছে, খটখট শব্দে টাইপ হচ্ছে দিস্তাদিস্তা কাগজ, চারদিকের এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছেলে আগন্তুকদের দেখাশোনা করছে, লেখা চিঠিতে সই করছে, একে তাকে আদেশ দিচ্ছে দেখে তাঁর বুক আনন্দে ভরে উঠত । 'একদিন একটা ফ্যাক্টরিতে যাবার সুযোগ হয়েছিল আমার,' মুসা বসে ভাবতেন । আমি কাজের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, বরং আওয়াজের চোটে আমার কান চিরকালের মত কালা হবার যোগাড় হল । কিন্তু এই হৈচৈয়ের জন্যই তো কয়েকজন লোকের রুজি রোজগার হচ্ছে, আর বাইরে দেখলাম তৈরি জিনিস

ঝটপট ভর্তি করা হচ্ছে লরিতে, এসব জিনিসও মানুষের জান বাঁচানোর কাজে লাগবে। সে কি কম কথা।'

এক সময় আসন গুটিয়ে চলে যেতেন করতল ঘর্ষণের তাপ উপভোগ করতে করতে।

তারপর একদিন সেই প্রভাত উপনীত, সেই ভীষণ সকাল, এইতো সেদিন, তবু মনে হয় কতকাল। সব দুঃখ, সব দুর্ঘটনাকেই তাই মনে হয়। আগে থেকে তিনি কিছু আঁচ করতে পারেন নি। দরজা খুলে দেখেন সব নিস্তব্ধ, টাইপ-রাইটার আর টেলিফোন নীরব। নমাজের আসন বগলে তিনি ঘর থেকে ঘরে ঘুরে দেখেন কোথাও কোন কাজের চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা, কোথাও কোনো শব্দ শোনা যায় কি না। কিন্তু নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না, আর সেই অখণ্ড নীরবতায় তিনি পূর্বাহ্ণেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ভগ্নস্তূপে হলেন।

অন্ধকার হলে রক্ষী এসে শাটারগুলো বন্ধ করতে দরজা খুলতেই তাঁর গায়ে ধাক্কা লাগল। পালকের ঝাড়ুনির হাতল শক্ত করে ধরে রক্ষী কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিদ্যুৎ প্রবাহবৎ অনুকম্পা বোধ করে সে বৃদ্ধের প্রতি। পদচারীরা পরে বলেছিল সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তার আলো যখন সবে জ্বলেছে, তারা দেখে ছফুট দীর্ঘ এক মানুষ শ্বেতবাস পরিহিত বৃদ্ধকে আশ্লেষে ধরে বহির্গত হল। বৃদ্ধকে সে-মানুষ বারবার বলে, 'নিষ্ঠুর মানবজাতিকে ক্ষমা করুন।'

জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন প্রভাত সমাগত। কোনোমতে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান, ছেলের শেষ চিহ্ন হাতে করে কবরখানা থেকে বেরিয়ে এলেন বাপ।

সেদিন থেকেই লোকের কাছে তিনি জীবন্ত মৃতদেহস্বরূপ। যন্ত্রমানবের মত হেঁটে বেড়াতেন তিনি শরীরে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে। পথের লোককে আচমকা ধরে তার হাত অথবা নিচু হয়ে তার হাঁটু কিম্বা পায়ে চুম্বন করতেন। শুধু সে-কারণেই যে লোকে তাকে এড়িয়ে চলত তা নয়। প্রায়শই তিনি পথ-হারানো শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন, অথবা বাতাসের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। নেশাগ্রস্তর মত প্রকাণ্ড চোখদুটি দেখে সকলে তাঁকে এড়াবার চেষ্টা করত। সময়ে সময়ে তিনি কথা কইতেন অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির স্বরে, কখনো বা চিৎকার করে উঠতেন, প্রতিটি বর্ণ নির্ভুলভাবে উচ্চারিত হত, 'শুধু ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের ঢেলা রেখে যাব আমি। আমার শরীরের পরিশ্রমের ফল, আমার চিন্তা, আমার ভালবাসা রেখে যাবো আগামীদিনের জন্য। আবার মাঝে মধ্যেই পথে যাকে পান তাকে ধরে বলেন, (গৃহপ্রাচীর বা মূর্তিও বাদ পড়ে না) 'চশমা চাই কারো? রেশমের টাই? চামড়ার বেল্ট? চাই কারো শুকনো হাড়, কোঁচকানো চামড়া, সঙ্গে কোঁকড়ানো কলজে চাই কারো?'

একদিন এক শ্রমিক নিল বেল্টটা, চশমাটাও নিল কে একজন। কিন্তু টাইয়ের প্রতি কারো আকর্ষণ নেই। প্রাচীরসংলগ্ন একটা লোহার রিংয়ের সঙ্গে সেটি বেঁধে তারই ফাঁসে বৃদ্ধ ঝুলে পড়েন। কিছু নিষ্কর্মা পথচারী পরম নিরুত্তাপে

ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। একটা বুড়ো মরছে, তা নিয়ে তাদের কোনো ভাবান্তর নেই। পুত্রের সঙ্গে পিতার আত্মা প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই মৃত।

অকস্মাৎ এক বৃদ্ধা ভিখারিনী জনতার ব্যূহভেদ করে রশি কেটে বৃদ্ধের অর্ধমৃত দেহকে পরম সমাদরে নামাল। ভিড় কাটিয়ে পথ করে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

যুগলমূর্তিকে অনুসরণ করার সাহস হলনা কারো। ওরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে কিছু দূরে, প্রমিত পদক্ষেপে। ভিখারিনী সহাস্যে বৃদ্ধকে ভরসা যোগায়, হাসি শোনাল অবশ্য কান্নার মত। জনতা ভাবে, শীঘ্র ওদের মধ্যে উপহার বিনিময় হবে—ব্যাংক নোট বা দামী পাথর নয়, শরীরের শ্রমের ফসল, অপরিমেয় আশা আর ভালবাসা।

দুই প্রাচীন নরনারী ধীরপদে অগ্রসর—যুগলকণ্ঠে হাসিকান্নার হীরাপান্না। হঠাৎ তাদের সামনে পূর্বগগনে সূর্যের কিরণ উদ্ভাসিত হল।

লুই বের্নার্দো হনওয়ানা

দিনা

প্রাক্তন পর্তুগিজ উপনিবেশ মোজাম্বিকের রাজধানী লোরেঞ্জো মার্কেস (বর্তমান নাম মাপুটো) শহরে ১৯৪২ সালে হনওয়ানার জন্ম । বাবা ছিলেন সরকারি দোভাষী । অর্থাভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা যথাসময়ে সমাপ্ত হয় নি । ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় লিখেছেন ও ম্যাপ আঁকার কাজ করেছেন । পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে বাইরা শহর হতে প্রকাশিত দু'টি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন । বহু পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । মূল ভাষা পর্তুগিজ হলেও, তাঁর কিছু কিছু লেখা ইংরাজী অনুবাদে লভ্য ।

কোমর থেকেই শরীরটা সামনের দিকে নুয়ে রয়েছে মাদালার, হাত-দুটো মাটি ছোঁয় ছোঁয় । মাঝদুপুরের ঘন্টা শুনে মাথা তুলতেই দেখতে পেল, সবুজে সাদা প্যান্ট পরা ওভারশিয়ারবাবু দশ পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ভুট্টাগাছের সারির মাঝখানে । আর বেশি সোজা হবার চেষ্টা করল না সে, বাবুর মুখের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ করা চলবে না, ঘন্টা বাজলেই বা কী ? হাঁটুর ওপর হাত রেখে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল ।

রোদের তাপ সোজা খোলা পিঠটার ওপর পুড়িয়ে দিচ্ছিল দেহটাকে । নাকের ডগা থেকে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পায়ের কাছেই একটা চকচকে পাথরের ওপর পড়ছিল, সেগুলো ছুঁয়ে সময় গুণতে গুণতে মাদালা ভাবল, বাবু বোধ হয় বেজার হয়েছে । দশ পা দূরে তাকিয়ে দেখে বাবুর পদযুগল তখনো অনড় । আরেকটু এগোতেই ফিলিমোনের কালো শরীরটা দেখা গেল, দৈর্ঘ্যে ভুট্টাগাছগুলোর অর্ধেক । সেও কর্ম-বিরতির হুকুমের অপেক্ষা করছে ।

পিঠের ব্যথাটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে, বিশেষ করে এই দিনার ('ডিনার' কথাটির শ্রমিক সংস্করণ) সময়ে ব্যথাবোধ বাড়ে । নিচু অবস্থায় বার বার মাথা তোলবার দরুন কাঁধের পেশি টনটন করছে, তবু সে আগাছার পিছনে পাতাগুলো তোলবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল । যান্ত্রিক অভ্যাসে

আঙুলগুলি দিয়ে আগাছার গোড়াটাকে যত্ত করে ধরে শরীরটাকে শক্ত করে নিল। ঐটুকু আগাছা, তবু টানতে গিয়ে তার হাঁটুর ভাঁজের কাছটা কনকন করে উঠল। শেকড়গুলি নাকের কাছে তুলতেই গায়ে লেগে-থাকা কালো মাটির কড়া গন্ধে যেন প্রাণ ফিরে পেল মাদালা।

লোভীর মত শেকড়গুলি ওপরের ঠোঁটের কাছে চেপে ধরে শ্বাস নিতে নিতে আগাছা তোলায় যে-গর্তটা হয়েছিল সেটা দেখতে লাগল। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, নইলে গর্তটা থেকে একটু ভাপ অন্তত বেরোত।

ভোরবেলা যখন রাতের শিশিরে সুফলা মাটি ভেজা থাকে, তখন ছোট ছোট মাটির ঢেলা থেকেও সাদা ভাপ বেরোয়, কাজে তখন অত ক্লান্তি থাকে না। কিন্তু সূর্য যখন মাথায় উঠতে থাকে তখন কেবল শেকড়-তোলা গর্তগুলো থেকেই ভাপ বেরোয়, তারপর সূর্য মাঝগগনে উঠলে তাও থাকে না।

আগাছাটা মাটিতে ফেলে সে কান পাতল, কিন্তু লম্বা ভুট্টাগাছের মাথা ছুঁয়ে-যাওয়া বাতাসের মৃদু হুলুধ্বনি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

আবার দেহটাকে শক্ত করে শরীরটা একটু পেছনে হেলিয়ে আরেক গোছা আগাছাতে টান দিল।

সাতবার আগাছা ওপড়ানোর পরও যখন কিছু শোনা গেল না, তখন ভাবল ওভারশিয়ার বাবুর হাঁক কি তবে সে শুনতে পায়নি? আবার কান পাতল, কিন্তু ঢেউয়ের মৃদু মর্মর ছাড়া আর কিছু কর্ণগোচর হল না।

আবার নিচু হয়ে টান মারতেই তার ব্যথা প্রচণ্ড কামড় দিয়ে উঠল, তবু সে আগাছার গোছা না উপড়ে ছাড়ল না। একটা গর্ত থেকে একটা কাঁকড়া-বিছে উঠে এল, কিন্তু সোজা-হয়ে দাঁড়ানো বুদ্ধির কাজ হবে না, হাতের কাছে কোদাল খুরপি নেই, কাজেই ওটাকে মারতে পারল না সে। কামড়ালে পর তিনদিন ধরে যন্ত্রণা হত, চতুর্থ দিন হয়তো মরেই যেত, ভেবে হঠাৎ তার ভীষণ আতঙ্ক বোধ হল। তিনদিন ধরে ঐ ঢাউস সাইজের বিছের কামড়ের যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে থাকার শক্তি তার দেহে আর অবশিষ্ট নেই।

ভোরের দিকে আগাছার পাতায় গঙ্গা-ফড়িঙের লাফ দেখা যায়, কিন্তু এই কাঠদুপুরে শুধু বিছে, গিরগিটি, এমনকি সাপের দেখাও মেলে। খেতে কাজ করতে গিয়ে সেদিন পিটারোসি মারা গেল সাপের কামড়ে। পিটারোসিকে সে ছাড়া আর কেউ জানত না, কিন্তু তার বউকে সবাই চিনে ফেলল, কান্তিনাতে মদের খরচা দিলেই সে-মাগী যে কোনো পুরুষের সঙ্গে শুতে শুরু করেছিল বিধবা হবার পর। গোড়ায় বলত পঁচিশ এসকুদোর কমে সে কারো সঙ্গে শোবে না, পরে মদের নেশায় দর কমালো। মাগাইচারা ফিরলে তাদের পয়সায় মদ গিলে তাঁর হুঁশ থাকত না, তখন যে কেউ কান্তিনার পেছনে লম্বা ঘাসগুলোর ভেতরে তাকে নিখরচায় নিয়ে যেতে পারত, এমনকি খেত-মজুররাও। তবে সবাই জানত সে-অবস্থায় সে একরকম ঘুমিয়েই থাকত, জ্ঞান ফিরত মানুষটা তাকে ছেড়ে ওঠবার পর।

মাদালা এখন বুড়ো ভাম, একমাত্র সে-ই কখনো তার দোর মাড়ায় না। তাছাড়া শত হলেও পিটারোসিকে সে চিনত তো!

মাদালা আরো দুবার আগাছা উপড়ে আবার হাঁটুর ওপর হাত রেখে ঝুঁকে অপেক্ষা করতে লাগল। সূর্য যেন আরো কাছ থেকে পোড়াচ্ছে। এবার নিশ্চয়ই ওভারশিয়ারবাবু 'দিনা'র ছুটি দেবে।

হঠাৎ পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িতে টান পড়ল। বাবুর হাঁকের অপেক্ষায় ব্যথা ভুলেছিল, এবার শরীর শক্ত করে ভেতরের টানটাকে হালকা করতে চেষ্টা করল। গলার কাছ থেকে একটা টান বুক অবধি পেঁছে একটা সুতোর গুটির মত সেটা যেন পাকস্থলীতে সেঁধিয়ে গেল, ঘাড়ের কাছে শিরাগুলি যন্ত্রণায় ফেটে পড়বে বোধ হল, শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতে-ধরা আগাছার পাতাগুলি পিষ্ট হয়ে কটু গন্ধ ছাড়ল। কিডনিটা যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, তবু তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরোল না। ব্যাটা থামতে বলে না কেন এখনো! ছায়াতো দিনার ঘন্টা বাজার পর আরো দু'বিঘত লম্বা হল! পাশের একটা ঝোপের ডাল ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে মাদালা।

ঝোপটা টেনে তুলতে গিয়ে এবার মাদালার হাঁটু আর ভার সইতে পারল না, এদিকে ঝোপটাকেও ছাড়তে পারে না, নিরুপায় মাদালা মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দফায় খিঁচ ধরতেই পা দুটো আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে নরম ঝুরঝুরে মাটির ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে খিঁচটা খুলে গেল। চোখ বুজে সে ব্যথার উপশমের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

আপদ কাটল আপাতত; হাঁটু গেড়ে বসেই সে একটা ছোট ঝোপের দিকে হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগল।

'হাঁটু গেড়ে কাজ করা তো আবার বারণ,' অস্ফুটে বলে ছেড়ে দিল ঝোপটাকে। ওপড়ানো ছেড়ে এবার সে যা তুলেছে সেগুলো আলাদা গোছা করে গুণতে লাগল, 'এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···'

তারপর হ্যাঁচকা টানে আরেক গোছা তুলে বলল, 'ছয়।'

অপরিসীম ক্লান্তি বোধে সে মাটির ওপর এলিয়ে পড়ে হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে গোল হয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যথাবোধটা প্রায় দূরে হয়েছে। ছ নম্বর গোছার পাতা মুখে দিয়ে চিবুতে শুরু করল চোখ বুজে।

'ঠিক হ্যায়, চল, সব খেতে যাই।'

'সাত, আট, নয়, দশ!' তড়াক করে উঠে মাদালা পটপট করে আগাছা তুলে ফেলল। কপালের ঘাম পড়ে কড়কড় করছিল চোখ, আঙুল দিয়ে সে ঘাম পরিষ্কার করে নিল।

ঝট করে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ালো না সে। বেটা ওভারশিয়ার ভাববে সে কাজ থামাবার জন্য মুখিয়ে ছিল।

আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম বোধ হতে লাগল। নগুইয়ানা এবং মুথোকাটি আগেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে ওভারশিয়ারবাবু বলল, 'কিরে, শুয়োর, কাজের সময় তো দেখি গা চুলকানির ফিকির, আর এখন তড়িঘড়ি, বেজন্মার দল? চামড়ায় কালশিটে পড়িয়ে দেব বলছি!'

ফিলিমোন সবে মাথাটা তুলতে যাচ্ছিল, ওভারশিয়ারের চিল্লানি শুনে আবার নিচু হতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাদালাকে দেখে সাহস সঞ্চয় করে সটান সোজা ওভারশিয়ারবাবুর দিকে তাকালো। তাকে দেখে টানদানে, জিমো, আর মুথোম্বিও সিধে তাকালো ওভারশিয়ারের মুখের দিকে।

জিমোর শরীরটা ঘামে জবজব করছে, তবু পলিমাটি রঙের চামড়ার নিচে তার মাংসপেশির অশান্ত নাচ মাদালার চোখে পড়ল।

'নে, চল শালা সব চিকাকোতে (খাবার যায়গা)!' ওভারশিয়ার হাঁক পাড়ল। হাতের বই সশব্দে বন্ধ করল সে। বইয়ের মলাটের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল, 'এই বেশ্যাগুলোকে ছাড়া আর বই কি লেখা যায় না? যত্ত সব!'

নিঃশব্দে সকলে ওভারশিয়ারকে অনুসরণ করল। মাদালা চারপাশে তাকিয়ে ভুট্টার মসৃণ পাতায় রোদের নাচন দেখতে লাগল। অন্যরা অনেকটা এগিয়ে গেছে, খেতের সবুজ ওদের প্রায় অদৃশ্য করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্রোত ঠেলে এগোচ্ছে।

মাদালা কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। 'মলুঙ্গোর (শ্বেতকায়ের) ধানখেত যেন সমুদ্র-সমান,' মনে মনে আওড়ায় সে। সবুজ ঢেউ অনুসরণ করে তার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হল, মাঝে মাঝে রুপোলি ঝিলিক, বাতাসের নাড়া খেয়ে সূর্যরশ্মি সহস্র ধূমকেতু হল যেন। চোখে যখন আর সইল না তখন সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

হঠাৎ সমুদ্রের সঙ্গে শস্যখেতের তুলনা করার জন্য সে নিজের ওপর খাপ্পা হল; যখন দিনার ঘণ্টা বাজে তখনই তার এরকম মনে হয়। 'না, না, সাগরের ব্যাপারই আলাদা,' নিজেকে ভ্রূকুটি করে সে বলল। সাগরের বুকে তো আগাছা ওপড়াতে হয় না। সেথায় মাছ যেন পবনপক্ষী। মুহূর্তেক থেমে পরম প্রত্যয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সায়রের জাত এমন নয়।'

চালাঘরে এসে দেখে সবাই পৌঁছে গেছে। কারো খাওয়াও হয়ে গেছে। আগাছা কুড়ানির দল সবসময়েই আগে পৌঁছয়, তারা এখন ছায়ায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অনেকে দিনের ক্লান্তি ঘুমিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে। ফার্ম গ্যাংয়ের লোকেদের আসতে দেরি হয়, ওদের কুকা (রাঁধুনি) যোসে তখনো বোটওয়ার (তিনপেয়ে লোহার কড়াই) জন্য আগুন ধরাচ্ছিল।

মাদালা একটা শেডের তলায় ক্রাল গ্যাংয়ের দলে গিয়ে বসল। ওকে আসতে দেখেই ওরা নারীপ্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করল। 'মাদালা, তোমার দলের খবর কী,' একজনের গলা শোনা গেল। মাদালা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর করল না, প্রশ্নটা ওকে নিজেকেই করে নিজের জবাব ভেতর থেকে আদায় করতে হবে, তবে অন্যাকে উত্তর দেওয়া।

'রোদ কি কড়ারে মাঠে,' নিশ্চুপ মাদালার কাছে যেন অপরাধীর মত বলল লোকটা। 'হ্যাঁ সত্যি,' বলে মাদালা তখনো প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই লোকটি আবার বলে, 'তার ওপর ওভারশিয়ার ব্যাটাও তো ঘাড়ে চেপে বসে আছে চব্বিশ ঘণ্টা।'

মাদালা এবার প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকালো, ছোকড়াকে বলতে ইচ্ছে করল খেতের কাজ নিয়ে কচকচিতে লাভ কী ? কিন্তু কীভাবে বলবে ভেবে পেল না।

'ওভারশিয়ারটা বজ্জাতের ধাড়ি !' ছেলেটা বলেই চলল, 'ছুটি দিতে শালা ইচ্ছে করে দেরি করে। একটু যে পিঠটাকে টান করব ব্যাটা তাও দেবে না।' হঠাৎ দ্বিগুণ উৎসাহে দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাইরি বলছি, নিজের চোখে দেখেছি আমি, সাধে কি আর বলছি ব্যাটা বজ্জাত ! সেদিন, মাঠে কাঠফাটা রোদ, কী রকম গরম হয় জানিস তো মাঠে ?' মাদালাকে ভুলে ছেলেটা এবার দলের লোকগুলোকে উত্তেজিত হয়ে ব্যাখ্যান শুরু করে।

মাদালা দূর থেকে লক্ষ্য করে, ছায়াতে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ওভারশিয়ার দুপুরের খাওয়া খাচ্ছে। অন্য একটা বাক্স দিয়ে টেবিল বানানো হয়েছে। গোগ্রাসে খাবার খাচ্ছে, ঢোকে ঢোকে মদ নিয়ে খাবারকে পাকস্থলীতে ঠেলে দিচ্ছে।

মাসের শেষে মাদালাকে সবসময় সাথীদের সঙ্গে মদ ভাগাভাগি করে খেতে হয়। ওভারশিয়ারের বেলা ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠে না। এক এক দিনতো বউয়ের পাঠানো বোতলে বেশ খানিকটা তলানি থেকেই যায়। দেখে ওরা ঠোঁট চাটে।

লালচে হলুদ রঙের নোংরা মদ, বোতলের মুখে চিনির দানা। গেলার সময় ওভারশিয়ারটা মাঝে মাঝে চোখ বুজত।

'মাদালা,' জিমোর গলা শোনা গেল, 'এই মাদালা, খাবি চল।'

ছায়ায় বসে নানা গ্যাংয়ের লোক খাচ্ছে। মাদালা তাদের অনেককে চেনে না, কিন্তু ওকে সবাই চেনে, পাশ দিয়ে গেলে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করে।

'মাদালা ! ওভারশিয়ারটা ছিল বলে আগে বলি নি, তোর মেয়ে এসেছে, দেখা করতে চায়।'

মারিয়া এই দিকেই আসছিল। বলল, 'গুড আফটারনুন, বাবা !'

'গুড আফটারনুন, মারিয়া।'

জিমো মারিয়ার কাছে এসে বলে, 'মারিয়া, আমি তোর বাপকে শুধু বলেছি যে তুই এসেছিস, আর কিছু বলি নি, কাছেই ওভারশিয়ারটা বসেছিল।'

'মারিয়া, বাড়িতে সবাই কেমন আছে রে ?'

'মারিয়া, ঐ শেডের তলায় গিয়ে কথা বল। ওখানে রোদ নেই, যা, ঐদিকে যা বাপবেটিতে,' জিমো বলে।

জিমো মারিয়াকে খুব পছন্দ করে; কিন্তু মেয়েটা অনেকের অঙ্কশায়িনী হয়েছে বলে কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় না।

'কী খবর রে, মারিয়া, বাড়িতে সবাই···'

'বাড়িতে সবাই ভাল আছে, বাবা। আমি এমনিই এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমিও ভালই আছি রে।'

ক্যাম্পের সবকটা মানুষের দৃষ্টি মারিয়ার দিকে নিবদ্ধ, 'কাপুলানা' পোশাকের তলায় তার শুদ্ধ শরীর সকলকে টেনেছে।

'গুড আফটারনুন, মারিয়া,' সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জানালো তার চাহনির আশায়, কিন্তু সে কারো দিকে চোখ না তুলেই ভদ্রবচন ফিরিয়ে দিল।

বাপ-বেটিতে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। পুরুষের দৃষ্টির আঁচ পেয়ে মারিয়া অস্বস্তি বোধ করছিল।

'কিরে মাদালা, খাবার ইচ্ছে নেই নাকি আজ,' জিমো আবার বলে। 'বেশি সময় নেই, নগুইয়ানা আর মুখাকাটি খাবার নিয়ে বসে আছে। ওভারশিয়ার যদি দেখে ফেলে এখানে দাঁড়িয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিস? যা, খেয়ে নে!'

'জিমো, আমি মেয়ের সঙ্গে কথা কই, তুই যা।'

হাতে সিগারেট নিয়ে ওভারশিয়ার বাবু এদিকে এসে ওদের দেখতে পেয়ে বলে, 'আরে, মারিয়া যে! এখানে কী করছিস? মাদালার জন্য টোপ ফেলছিস বুঝি! আরে ও তো বুড়ো ভাম! জিমোকে লটকাবি মনে হচ্ছে? কিরে মারিয়া?'

'না, জিমোকে আমি চেষ্টা করি নি গাঁথতে,' মারিয়া পর্তুগিজ ভাষায় বলতে চেষ্টা করল।

মজা পেয়ে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে ওভারশিয়ার বলে, 'বটে, তা ওর সঙ্গে শোয়ার শখ নেই তোর?'

উত্তর না দিয়ে মারিয়া মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'মাদালা, চল খাবি। দিনার সময় না খেলে মাঠে খাটবি কী করে?'

মাদালা ভ্রূক্ষেপ করল না। ওভারশিয়ারের কথায় মেয়ের মুখে প্রতিক্রিয়া খুঁজতে সে আগ্রহী। মারিয়া চোখ ফেরায় অন্য দিকে।

বুড়ো আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে মারিয়া বলে, 'বাবা, আমার মনে হয় তোমার খেতে যাওয়া উচিত।' ওর বাপ অপ্রস্তুত ভাব টের পেয়ে গেছে দেখে সে তৎক্ষণাৎ পা থামিয়ে দুহাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

কাছে এসে মাদালা মেয়ের চোখের দিকে চাইতে গিয়ে দেখে ঘনপক্ষ্মের আঁধার তাকে আড়াল করেছে।

'মনে হয়, কেন মনে হয়?'

মুখের কাছে ঐ শুকনো কণ্ঠস্বর শুনে মারিয়া ঝট করে একটু দূরে সরে গিয়ে বাবার দিকে প্রায় পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। 'না, মানে এমনি মনে হল।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'জানি না কেন মনে হল, কিন্তু যাও, খেতে যাওয়া উচিত

তোমার এখন ।'

সবল হাতজোড়া দিয়ে বাপ মেয়েকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে আবার মেয়ের চোখের ওপর চোখ রাখতে চেষ্টা করে, ফল হয় না ।

'বাবা, যাও, খেতে যাও,' মারিয়া এবার আদেশের সুরে বলে।

'আমার পেটে খিদে নেই বলছি !' মাদালা উত্তেজিত হয়ে বলে । মারিয়া নিরুত্তর । 'আর তুই খাবি না ?'

'আমি এখানে আসার আগে কান্তিনাতে খেয়ে নিয়েছি । পাশ দিয়ে যেতেই ভেতর থেকে এক বন্ধু আমায় ডাকল । আমার জন্য খাবার কিনে দিয়ে বলল, "নে খা", আমিও খেয়ে নিলাম,' বলেই মারিয়া আবার চোখ নামিয়ে নিল ।

'তা ঐটুকুতে পেট ভরে নাকি ? চল, আমার গ্যাংয়ের সঙ্গে কিছু খাবি, যাবি ?' মাদালা বলে ।

'না বাবা, সে একগাদা ছিল, আমার পেটে আর যায়গা নেই । যাও, তুমি খেয়ে এস, আমি এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি ।'

জিমো এবার মাদালাকে ধমক দিয়ে বলে, 'বাড়াবাড়ি করিস না, চল । মেয়েতো ঠিক কথাই বলেছে ।'

এবার মাদালা রাজি হল । বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি । তুই এখানেই বসে থাক, পালাস না মেয়ে ।'

বাপ চলে গেলে মারিয়া ভাল করে চোখ খুলল ।

একদলা কই (সেদ্ধ-করা ভুট্টার ছাতু) নিয়ে মুচোভেলোতে (বাদামের ঝোল) ডুবিয়ে মাদালা মুখে পুরল । সবাই নিঃশব্দে খেতে লাগল । ঝোলটা মন্দ হয় নি, চর্বিতে রাঁধা তো !

খাবার যায়গায় বসে মাদালা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছিল । সবসময়ে ওর দিকে চোখ রেখেছিল, তবু ওভারশিয়ার কখন গিয়ে ওর সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছে টের পায় নি ।

মারিয়া ওভারশিয়ারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল মাটির দিকে তাকিয়ে ।

ওরা কী নিয়ে কথা কইছে জানতে না পেরে মাদালার মনটা উশখুশ করতে লাগল । নিশ্চয়ই ব্যাটার কুমতলব আছে ! কী ভাষায় প্রস্তাব করছে কে জানে !

ওভারশিয়ার মারিয়ার ওপর চটেই ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে মিষ্টি কথায় ওকে ভেজাতে চেষ্টা করছিল । পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে খুলে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চাপল । সেটা জ্বালিয়ে কাঠিটা নিবিয়ে মেঘের মত একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল । কাঠিটা মাটিতে ফেলল না, সেটাকেই নাচাতে নাচাতে কথা বলতে লাগল ।

ধূমপান শেষ হলে মারিয়াকে ছেড়ে সে গোলাঘরের দিকে চলে গেল । এতক্ষণ পর্যন্ত মারিয়া মাটি থেকে চোখ তোলে নি ।

সামান্য কিছু কই বাকি ছিল । মাদালা তবু নিশ্চিত যে কারো তেমন করে পেট ভরে নি । বাকিটুকু আর ঝোল রইল নগুইয়ানা এবং মুখাকাটির

জন্য—কুকা হবার ফাউ।

আঙুল চেটেপুটে প্যান্টে হাত মুছে সে-হাতই মাদালা চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল। খাবার শেষ, উঠে দাঁড়াল। অন্যরাও তাই করে। আবার খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়বার কিছুটা দেরি ছিল, এদিক সেদিক তাকিয়ে সে একটু জিরিয়ে নেবার যায়গা খুঁজল।

কাল গ্যাং চলে গেছে, মাদালা আগের জায়গায় এসে দেখে সেই ছোকরাটা তখনো বসে। এবার একটু ধূর্ত হাসি হেসে ছোকরা বলল, 'মাদালা, মেয়ে তো দেখছি ওভারশিয়ারবাবুর সঙ্গে বাতচিত করছে।'

ওদের দলের ফোরম্যান এলিয়াস বিরক্ত হয়ে বলল, 'ব্যাপার না বুঝে কারো কিছু বলা উচিত নয়।' সরাসরি ছোঁড়াটাকে সে কিছু বলল না অবশ্য।

নৈঃশব্দ্য পাথরের মত দুর্বিষহ মনে হয়। মাদালা বাঁ-পায়ের কাছে আধ-উপড়ানো ঝাড়টা ধরে কষে টান দিল। একটা ভোঁতা শব্দ করে শেকড়-শুদ্ধ ঝোপটা মাটি থেকে উঠে এল।

জিমো কাছে ছিল; জিজ্ঞাসা করল, 'মাদালারে, তোর ভালর জন্য কিছু করতে মন চায়। করতে দিবি?'

মাদালা উত্তর দিল না। জিমোর পাশের আলপথ দিয়ে ওভারশিয়ার এগিয়ে গেল, পিছু পিছু মাথা নিচু করে যায় মারিয়া।

মাদালার দৃষ্টি যুগলের ওপর নিবদ্ধ। তার হাতদুটো মাটিতে কী যেন খোঁজে। কাল্পনিক আগাছার গুচ্ছকে নিষ্পিষ্ট করে অজানা আক্রোশে।

সবুজ সমুদ্রের মধ্যে মারিয়া নামে, ছোট চারাগুলো তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে, তবু সে এগিয়ে যায়। স্রোতের বিপরীতে তাকে গতি ধীর করতে হয়। দূরে ওভারশিয়ারবাবু দাঁড়ায় মারিয়ার দিকে মুখ করে। মারিয়াও থেমে যায়।

'মাদালা, বল না আমি কী করলে তোর খুশ হবে, মাদালা?'

ওভারশিয়ার মারিয়ার সন্নিকট হবার জন্য এগোয়, মাদালা দেখে। হঠাৎ দেখা যায় বাবু থামে।

বাবু হাঁটে আবার, যেন নদী পেরোবার বাসনা।

জিমোকে এবার কিছু বলা উচিত। কিন্তু অন্তর মন্থন করেও মাদালা বলার কথা খুঁজে পায় না।

ওভারশিয়ার মারিয়াকে ইশারা করে, মারিয়া মনে হয় বোঝে না সে-ভাষা। মাদালার মুঠোয় ধরা ঝোপ যেন গোঁয়ার শিশু, কবজির জোর হার মানে তার কাছে।

ওভারশিয়ার আর মারিয়া ডুব দেয় মাঠে, পাশের ভুট্টাগাছগুলি কাঁপে, পরে আবার নিথর।

জিমোর গলা কাঁপে: 'মাদালা!' কিন্তু পরমুহূর্তে আদেশের সুরে বলে, 'ওদিকে তাকাবি না, মাদালা!'

মাদালার শরীরের ভেতর কী যেন কুঁচকে ওঠে। না, পুরনো ব্যথাটা নয়।

মাঠের ওপারে আবছা সবুজের ছায়ায় মারিয়া ওভারশিয়ারের মুখে তাকায় না। ছটফট করে পা-দুটো মুক্ত করবার জন্য। সবল বাহু তার কাঁধ বেষ্টন করে।

পুরুষের উষ্ণ অম্ল নিঃশ্বাস তার মুখের সন্নিকট হয়। স্বল্পকালের ধস্তাধস্তির পর মারিয়ার কাপুলানা খুলে আসে। শরীরে জলের শীতল স্পর্শ, কেঁপে কুঁকড়ে যায় মারিয়া। অনাবৃত জানুতে পুরুষের উষ্ণ কর্কশ সোহাগ অনুভব করে।

মাদালা চারদিকে চায়। কেউ তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে নেই। কিন্তু ক্যাম্পের সবাই এমন জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে ওকে দেখা যায়। কেবল ক্রাল গ্যাংয়ের সেই ছোকরা মুখে উদ্ধতভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নৈঃশব্দ্যে বিপদের চাপা সংকেত। যোসে ক্রমাগত কেশে চলে, কিন্তু তবু নৈঃশব্দ্য অটুট।

মাঠের মাঝখানে সবুজ গোধূলির আলোতে ওভারশিয়ারের মুখের ফ্যাকাসে সাদা চামড়ার ওপর সবুজে রঙ ধরে। তার কঠিন কামকাতর দৃষ্টি পলকের জন্য মারিয়ার দৃষ্টিগোচর হল।

পুরুষের আগ্নেয় শ্বাস তার আধখোলা ঠোঁটের আড়াল ভেদ করে, নেশা-গ্রস্তের মত এক তরল ঘূর্ণিতে আকৃষ্ট মারিয়া সহজে চোখ বোজে, নিজেকে ছেড়ে দেয় ঢেউয়ের দোলায়।

অন্তর্লীন স্রোত হতে এক আবছা উষ্ণতা উঠে আসে, আগাছার ঝুরঝুরে ভাবের সঙ্গে মিশে সেই উষ্ণতার বুদ্বুদ মারিয়ার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হল।

কর্কশ প্রাপ্তিকে চাপা দেয় এক খাবি-খাওয়া দীর্ঘশ্বাস।

একে একে, মাদালা তার হাতে ধরা কাল্পনিক পাতাগুলিকে নিষ্পিষ্ট করে। নিদারুণ রোষ তার হাতকে পরাস্ত করে শিশু চারাগাছের কাছে, তার গলা দিয়ে অতর্কিতে একটা ফোঁপানির শব্দ বেরিয়ে আসে।

'কাঁদিস না, মাদালা!' জিমোর কণ্ঠস্বর। নগুইয়ানা আর ফিলিমোন, কোদালি গ্যাংয়ের কর্মী, তারা এগিয়ে আসে। যোসে আর মালেইস আসে তাদের পিছু পিছু, কুড়ানির দলে কাজ করলেও মূলত তারা মাদালার দলের শ্রমিক। স্বল্পক্ষণে কোদালি দলের বাকি সবাই আর অন্যান্য দল থেকেও ভিড় করে মাদালাকে ঘিরে।

কাল্পনিক ঝোপের ডালগুলি আদর করে মাদালা।

'মারিয়া, তুই এখানে এসেছিলি কেন?' হেঁড়ে গলায় ওভারশিয়ার জিজ্ঞাসা করে। মানুষটার ওজনের চাপে মারিয়ার বুক থেকে ধীর প্রমিত নিঃশ্বাস নির্গত হয়। লোকটার কথা কানে যায় দূরাগত কল্লোলের মত।

'আপনি কেন এসব করেন?' কোনোমতে মারিয়া বলে।

'উম্...'

'কেন?' লোকটাকে ধরে এবার ঝাঁকায় মারিয়া।

'উম ?' লোকটার হাত মারিয়ার বুকের সঙ্গে অলসভাবে সংলগ্ন।

'কেন, ভাল লাগে নি ?' একলাফে উঠে দাঁড়ায় মানুষটা। 'বটে, তোর তবে খুত হয় নি ?' প্যান্ট ঠিকঠাক করে মারিয়ার দিকে ফিরে বলে, 'এই ওঠ, খেল খতম ! উঠে পড় !'

আবছা আলোতে মারিয়ার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে।

'এরকম ভাল লাগে না। রাতের বেলা আরো অনেক ভাল লাগে,' ভুল পথু'গিজে বলে মারিয়া। হঠাৎ আতঙ্ক ফোটে কণ্ঠে, 'কিন্তু মাদালা দেখে ফেলেছে ! আপনি তো বলেছিলেন আমাদের মধ্যে যা কিছু হবে সব রাতে ?'

'নে, ওঠ ছুঁড়ি, পার্টি শেষ। যা পয়সা এখুনি পাবি, যা !'

মারিয়া হঠাৎ বোধ করল তার পিঠের তলার মাটি কঠিন।

সবুজ সমুদ্রের ওপরে প্রথম ওভারশিয়ারের মাথাটি ভেসে উঠল। দুই হাতে খেতের গাছ ঠেলে ক্যাম্পে যাবার আলপথ ধরল লোকটা।

মারিয়া মাথা তুলতেই সমুদ্রের দীর্ঘ বিলাপী কান্না তাকে ঘিরে বয়। কাপুলানা থেকে মাটির দলা ঝেড়ে সে ক্যাম্পে ফিরে গেল। সামনের মানুষটার সরিয়ে-দেওয়া ভুট্টাগাছের মাথাগুলো স্বস্থানে এসে তার গতিরোধ করছিল, তাকে সেগুলো ঠেলে এগোতে হল।

মারিয়াকে পথ করে দেবার জন্য কাল গ্যাংয়ের লোকেরা পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। নৈঃশব্দ্য তখনো অটুট।

মারিয়ার নাকে সমুদ্রের ঘ্রাণ।

কাল গ্যাংয়ের সেই ছোকরার মুখের ভাব বদলে গেছে। বিদ্রূপের হাসি মুছে সেখানে ঘৃণার রেখা দেখা যায়। চতুর্থ চেষ্টায় তার মুখে কথা ফুটল কোনোমতে, 'মাদালা···রোদ বড় চড়া···ঐ খেতে···'

এবার কিছু বলা বিধেয় বিবেচনায় মাদালা বলে, 'হ্যাঁ রে বেটা, খেতে প্রাণ-পোড়ানো তেজ সূর্যের।'

কিন্তু নীরবতাভঙ্গে অসমর্থ হল মাদালার কথা। মারিয়া চোখ তুলল না। থামের মত স্থাণু হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাম্পের সব কর্মী।

'মাদালা !' কষ্টে কথা কয় সেই যুবক। 'মাদালা, আমাদের কি করার কিছু নেই ! বলো না মাদালা, আজ একটা এসপার-ওসপার হোক ! মারে মারুক, মরণকে ডরাই না !'

সমবেত জনতার মুখ থেকে সম্মতিসূচক গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়।

চোখ তুলে মাদালা তার সাথীকর্মীদের মুখে চাপা ক্রোধের চিহ্ন দেখে।

'মাদালা, তোমার চোখের সামনে তোমার মেয়েকে নিয়ে পাষণ্ড কী করল সবাই দেখেছে তো, মাদালা ! বলো, কিছু বলো মুখ ফুটে, মাদালা।' যুবকের সংরক্ত আঁখি মাদালার চোখে লোভীর মত বিদ্রোহের চিহ্ন খোঁজে।

মাদালার অন্তরে আত্মা মৃতপ্রায় !

পুরনো গোলাঘরের কাছে এসে ওভারশিয়ার মারিয়াকে খোঁজে। তাকে

দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে কোলের ওপর একটা রৌপ্যমুদ্রা ফেলে বলে, 'এই নে তোর পাওনা।' ঠোঁট থেকে ঝোলে একটা জবলন্ত সিগারেট, আত্ম-তৃপ্তির হাসিতে বাঁকা দুই ঠোঁট।

মারিয়া হাত বাড়িয়ে দিতেই কে যেন কেশে উঠল। স্নায়বিক অধীরতায় সে হাতটা গুটিয়ে নেয়, তারপর দুই হাতে বুক ঢাকে আড়াআড়ি ভাবে।

'কিরে মারিয়া, কী হল,' অবাক হয়ে বলে ওভারশিয়ার।

দেয়ালের ওপর দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে মারিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিষন্ন চোখে মাদালা দেখে মেয়ের মুখ। মারিয়া চোখ বোজে।

'আপনি কেন করলেন এটা, কেন বাবু ?' নিস্তেজ গলায় ওভারশিয়ারকে বলে মারিয়া।

কোমরে হাত রেখে বাবু একটা জান্তব আওয়াজ বার করে গলা থেকে। 'হল কীরে, ছুঁড়ি ? পয়সা চাস না ? পয়সা নিতে শরম হয়, অ্যাঁ ?' মারিয়ার উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ থামে। তারপর আবার বলে, 'কী রে, ঐ ছোকরাগুলো ধরে ফেলবে তুই বেশ্যা, তাই ভয় খাচ্ছিস ?'

মারিয়া আরো জোরে নিজের বাহুতে নিজেকে বাঁধে। নখের আঘাতে পিঠে আঁচড় কাটে। ফুঁপিয়ে বলে, 'মাদালা যে জেনে গেল, মাদালা যে দেখেছে গো !'

'তাতে হয়েছে কী শুনি ! দুদিকে দু'হাত বাড়িয়ে ওভারশিয়ার নিজের বিস্ময় প্রকাশ করে।

'মাদালা যে মোর বাপ।' নিজের ওপর রাগে মারিয়া নিরুপায় হয়ে মাটিতে থুতু ফেলে।

স্থানু মানুষগুলি বাবুর মুখখানা খুঁটিয়ে দেখে শুধু। নৈঃশব্দ্যের ছুরির আঘাতে ফালাফালা করে সাহেবের দেহ।

'কী বললি ? ওভারশিয়ার হাঁকে। রাগে মুখ লাল টকটক। 'আমি কি জানি তুই মাদালার বেটি ?' উত্তেজনায় হাত-পা নাড়ে বাবু, দম বন্ধ হবার যোগাড়। 'আমি জানতাম না, সত্যিই জানতাম না, জানতাম না তোর একটা মেয়ে আছে ! এমন সুন্দর মেয়ে···আমি, মানে আমি ওর বন্ধু।'

জনতার নীরবতা বিস্ফোরণে উন্মুখ।

'মাদালা, শোন, চাস তো আজ বাদ দে। বস, এখানে মেয়ের সঙ্গে বসে কথা বল,' বাবু বলে।

মাদালা বিষন্নচোখে তাকায় মাটির দিকে। আবার এক কল্পিত আগাছা ধরার জন্য তার আঙুল আকুলিবিকুলি করে।

নীরবতা ওভারশিয়ারের অসহ্য ঠেকে। আপসের খোঁজে তাকায়, ভাঙা গলায় বলে, 'গন্ধোস্রাব !'

মূক মানুষগুলি অচল, অনমনীয়।

'গন্ধোস্রাব !' আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে ওভারশিয়ার সাহেব। 'মাদালা, আমি

তোকে পয়সা দিচ্ছি, যা মেয়েকে নিয়ে কাস্কিনাতে যা। মাদালার জড়প্রায় দেহে উৎসাহের চিহ্নের বৃথা সন্ধান করে বাবু। মাদালার মাথাটা আরো একটু ঝুঁকে পড়ে শুধু।

'মাদালা…গন্ধোগ্রাব !' বাবু গোলাঘরের পিছনে অদৃশ্য হয়।

ক্লাল গ্যাংয়ের সেই যুবক এবার উচ্চকণ্ঠে নীরবতা ভঙ্গ করে, 'মাদালা, তোমার চোখের সামনে তোমার মেয়ের কী করল আমরা সবাই দেখেছি !' অন্যেরা নীরবে সমর্থন জানায়। এবার মারিয়া কান্নায় ভাঙে। মাদালার মাথাটা বুক স্পর্শ করে তখন।

এক বোতল মদ হাতে বাবু পুনরাবির্ভূত হয়। এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'এই, চল সব, চল ! কাজে চল, সময় হয়ে গেছে। আয়, দেড়টা বেজে গেছে। কুড়ানির দল। মালেইস ! এলিয়াস ! আলবের্তো ! কই সব, এই চল ! কুড়ানিরা যা, আগে নদীর ধারটা সাফ কর। খামারী দল, যা বাঁধাকপির পোকা বাছগে ! ক্লাল গ্যাং ! যা গরুগুলোকে জল খাইয়ে আন ! কোদালি দল, আমার পেছু আয়। চল, চল সব, মাঠে চল।'

কেউ নড়ল না। মাদালা হঠাৎ যেন জেগে উঠে কাল্পনিক পাতা পেষে হাতে।

'কিরে, কথা কানে যায় না ? ঘণ্টা শুনলি না ? দিনা শেষ !' বিরক্তির ঝাঁঝ বাড়ে বাবুর গলায়। বোতলটার দিকে একবার তাকিয়ে বলে, 'মাদালা !'

মাদালা উঠে দাঁড়ায়।

'শুনতে পাস না, আমি যে যেতে বলছি, যা শুয়োরের বাচ্চারা, কাজ শুরু কর।'

মাদালা বোতলটা বাবুর হাত থেকে নেয়।

'শুয়োরের বাচ্চারা, বেজন্মার দল, বলছি কাজে যা !'

ক্যাম্পসুদ্ধ লোক মাদালার দিকে তাকিয়ে আছে। যুবকটি এক পা এগিয়ে এসে বলে, 'মাদালা !'

কঠোর দৃষ্টিতে মাদালা সবার পানে চায়। তারপর বোতল খুলে ঢকঢক করে নোংরা লাল মদ গেলে, কিছুটা উপচে পড়ে তার দাড়ি ভেজায়, ঘাড়ে চুঁইয়ে পড়ে। খালি বোতল ফিরিয়ে দেয় বাবুকে।

'কই বেজন্মার দল, কাজে যা,' বাবু হাঁকে।

অনিশ্চিত পদে মানুষগুলি সচল হল। নৈঃশব্দ্য পরাজয় মানে। মারিয়া সব দেখে আতঙ্কভরা চোখে।

খালি বোতলটাকে বিপজ্জনক ভাবে ঘুরিয়ে বাবু বলে, 'শালা কালা আদমি, বেজন্মার দল !'

যুবক মাদালার পায়ের কাছে থুথু ফেলে বলে, 'কুত্তা কাহিকার !'

মাদালা অপমান গায়ে মাখে না। পিছন ফিরে খেতের দিকে হাঁটে। নগুইয়ানা আর ফিলিমোন যায় পিছু পিছু।

দলের অন্যাদের দিকে ঘুরে জিমো বলে, 'চল যাই।'

'জলদি কর, জলদি!' ওভারশিয়ার চেঁচায়।

জিমোকে অনুসরণ করে ওরা কাজে ফিরে যায়। 'জলদি!' বাবু আবার হাঁকে।

এক ঘায়েই বোতলটা ভাঙল; যুবক তবু অনড়। দ্বিতীয় ঘায়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ঝরল।

ওভারশিয়ারের বুটের তলায় পিষ্ট হল ওর মুখ। হিংস্র চিৎকার শোনা গেল, 'বেশ্যার বাচ্চা!'

ঝুঁকে পড়ে মাদালা একটা ঝোপ ধরে টান দিল। আলতোভাবে টান দিয়ে পরখ করল শেকড় কতটা শক্ত। তারপর শরীরটা পেছনে হেলিয়ে মারল জোরে টান, আগাছা উঠে এল। আগে তোলা আগাছাগুলোর পাশে সযত্নে সারিতে শুইয়ে দিল সেটাকে। মাথা তুলে আশেপাশে সবাইকে দেখতে পেল সে, ফিলিমোন, জিমো, নগুইয়ানা, মুথাকাটি, টানদানে, মুথাম্বি—সবাই আছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে কাজে হাত লাগালো।

অদ্ভুত মাছের মত মানুষগুলির মাথার উপরে সবুজ সমুদ্রের বুকে মৃদু হাওয়া খেলে যায়। ছোট ছোট ঢেউগুলি ভাঙে, ওঠানামা করে, আবার ভাঙে, শোনা যায় গোপন সমুদ্রশঙ্খের ধ্বনি!

গ্যাস্টন বার্ট উইলিয়ামস

বেড-সিটার

সিয়েরা লিয়নের স্থান পশ্চিম আফ্রিকাতে বিশিষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ কলোনি থেকে মুক্ত দাসদের পুনর্বাসনের জন্য এই দেশটি ব্রিটিশ কলোনি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকা মহাদেশে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তারের প্রাথমিক কেন্দ্র এই দেশের লেখক দুই সংস্কৃতির সংঘাতকে কৌতুকের চোখে দেখেন। বর্তমান গল্পটিতে সে-কৌতুকের স্পর্শ আছে। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের লেখক সিলভাঁ বেম্বার 'ডার্ক রুম' গল্পটির সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়বার মত। বিখ্যাত সমালোচক উলি বাইয়ের এ-গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'লেখক জানেন কী করে একজন উপহাসাস্পদ ব্যক্তিকে ঘৃণার বদলে সহানুভূতির পাত্র করা যায়'।

'নোটিশ এসেছে, এক সপ্তাহর মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!' কোবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, দুঃখে উদ্বেগে মুখে বিকারের চিহ্ন দেখা যায়।

বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট সহ একটা হোটেলের ছোট একটা ঘরে দুঃসহ একাকী, হতাশাকর দিন কাটিয়েছে পঁয়ত্রিশ শিলিংয়ের বিনিময়ে।

হাতে একটি পয়সাও নেই তার। এক আফ্রিকান পাদরির ছেলে তার সমস্ত সঞ্চয় ঠকিয়ে নিয়ে গেছে, সে-টাকা পকেটস্থ করেছে নিশ্চয় সেই দুর্নীতিগ্রস্ত আফ্রিকান দেশের কোনো মানুষ! মুখে তার তিক্ত হাসি ফুটল, সে-হাসিতে ঢাকা পড়ল না তার মনের চেহারা। পকেট থেকে বাইবেল বার করে কয়েকটা ছত্র পড়ে প্রার্থনা সেরে সে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

বার কয়েক ব্যর্থ হয়ে, একদিন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় হর্নসে এলাকাতে একটা বেড-সিটারের বিজ্ঞাপন দেখে সে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ল।

পয়সাওয়ালা আফ্রিকান লন্ডন বা কেন্ট, মিডলসেক্স বা সারে জাতীয় বনেদী মফস্বলে বাসা খুঁজতে গিয়ে খুঁতখুঁতে হবার স্পর্ধা রাখে, কিন্তু একজন স্নব বুদ্ধিজীবীর উদ্ধত স্নব বংশধরের পক্ষে এই অত্যাশ্চর্য লন্ডন শহরের যেকোনো অঞ্চলই স্বর্গীয়। তবু বরাত মন্দ হলেই, কুসংস্কার, যুদ্ধ-হিস্টেরিয়া, স্নায়ুরোগ, মদ ও ড্রাগের নেশা, সমকামিতা, ভণ্ডামি ও অসংখ্য কুকর্মের সাক্ষী এই লন্ডন শহরের ভয়ংকর কোনো এলাকায় ফেঁসে যেতে পারেন। নিঃসঙ্গ দরিদ্র

আফ্রিকান যুবকের পক্ষে লন্ডন ভয়াবহ হতে পারে, নানাবিধ যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা এবং স্থায়ী মানসিক ক্রুশবিদ্ধতার শিকার হতে পারে সে।

ভাবী বাড়িওয়ালা সন্দিগ্ধ পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলেন। নিজের অজ্ঞাতেই কোবি হাতে চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'আপনার নামই তো মিস্টার···, তাই না?' সে বলল। বাড়ির মালিক দায়সারা গোছের একটা 'হ্যাঁ' বলে রান্নার ধোঁয়ায় ভরা একটা হলঘরের মধ্য দিয়ে তাকে আরেকজন লোকের কাছে নিয়ে গেল, দেখতে সে অনেকটা ভাবী বাড়িওয়ালারই মত। 'হ্যালো' মতন কী একটা বলে রোগাপটকা শরীরটা নিয়ে সে হল-কিচেনেট-এর মধ্যে দিয়ে চলে গেল। লোকটা রান্না করছিল, তেল ও আফ্রিকান রান্নার গন্ধে ঘর ভরে গেছে। অনতিবিলম্বে কোবিকে জানানো হল যে তারাও পশ্চিম আফ্রিকার লোক। বড় ভাই, যিনি বাড়িওয়ালা হবেন, তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ইংলন্ডে বসবাস করছেন, বললেন মাত্র একশ বার চাকরি বদল করেছেন। ঠিকানা বদল করেছেন পঞ্চাশবার, অবিচলিত কণ্ঠে তা জানালেন। 'বাঃ, বেশ তো,' কোবি বলল।

'বুঝলেন,' বাড়িওয়ালা বলেই চলেন, 'ও আমার ভাই।' অগোছালো ঘরটার মধ্যে কোবি যতটা সম্ভব স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করল, এটাকে কি লিভিং রুম বলে? 'বাড়িটাকে কি নোংরা করে রেখেছে, সত্যি!' গৃহস্বামী বলেই চলেন, 'তবে শীগগিরি আমার বউ আসছে, সে এসে সব ঠিকঠাক করে দেবে।'

গাঢ় থ্রি-পিস স্যুট পরা কালো মানুষটি জানালেন যে শুক্রবার, অর্থাৎ পরশুদিন তাঁর স্ত্রী প্লেনে করে ফিরবেন। তখন হেমন্তকাল। হর্নসের বাড়িগুলি, কোবির জীবনের মতই ধূসর, আবহাওয়ার শিকার। পশ্চিম আফ্রিকাতে এখন ঘোর বর্ষা, সেখানে লাগোসে কিংবা অন্যত্র ভাবী গৃহ-স্বামিনী আজই এই বুধবারই প্লেনে উঠছেন, তাঁর সম্মতি ছাড়াই তাঁর কর্তা ভাড়াটে ঠিক করছেন। ভাড়াটেকে দেখে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। বিশেষ করে কোবির ক্ষেত্রে, গৃহস্বামীর ওপর নিজের নিয়ম খাটাবার প্রবণতা তার মধ্যে প্রবল।

পরিপার্শ্ব ও রুচি থেকে মানুষের মানসিক অবস্থা টের পাওয়া যায়। কোবির মত স্বাস্থ্যবান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন লোকের পক্ষে দরকার ছিমছাম বাসা, শিক্ষিত মার্জিত প্রতিবেশী। আফ্রিকান বাড়িতে শান্ত পরিবেশ বিলাসিতা বিশেষ, উচ্চমধ্যবিত্ত ঘর ছাড়া অন্যত্র তা লভ্য নয়। নির্বোধ পপ-সংগীত বাজছে, নোংরা শালে ঢাকা অবিবাহিত মায়েরা নির্লজ্জভাবে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, তাদের চেহারা আমোস তুতুয়ালার 'ফেদার উওম্যান অফ দ্য জাঙ্গল'-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

'বাড়িটা ভালই,' কোবি বলে, 'আপনার স্ত্রী এলেই সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দেবেন। হবু গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলেন কথাটাতে। বিলেতী

মেয়েরা ঘরদোর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে সাধারণত পুরুষদের চেয়ে বেশি পটু। আফ্রিকান মেয়েরা এ-দাবি করতে পারে না। হবু গৃহস্বামিনীর বিষয়ে কোবির অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।

অ্যাটিকের যে-ঘরটা কোবিকে দেওয়া হবে তা মোটের ওপর বড়ই বলতে হবে। জানালা দিয়ে বাইরে জীর্ণ ধূসর বাড়িগুলি দেখা যায়। 'মিসেস এলে ওয়াল-পেপারগুলি নিশ্চয় বদলাবেন,' কোবি বলে। ভাবলেশহীন গলায় গৃহস্বামী বলেন, 'হ্যাঁ।' তাঁর দৃষ্টি তখন বাতিদানের ওপর একটি নিগ্রোরমণীর আবক্ষমূর্তির প্লাস্টিকের তৈরি নকলটার ওপর নিবদ্ধ; মূর্তিটিতে নিগ্রোশরীরের আভাসমাত্র নেই।

'আচ্ছা, আমার ওপর তলায় কোনো ভাড়াটে আছে কি?' কোবি বলে।

'তার মানে?' বাড়িওয়ালা এবার যেন বিরক্ত। 'ওটার কথা বলছেন? ওটা তো লফট্।'

'না, মানে—' কোবি সামলাবার চেষ্টা করল। 'সেদিন পামাস' গ্রীনের বাড়িগুলোর লফটে বেশ কয়েকটা কালা আদমির ইঁদুরের মত গাদাগাদি করে থাকার খবর বেরিয়েছিল কিনা, তাই…।'

'এ-ঘরের ভাড়া চার পাউন্ড দশ শিলিং,' বাড়িওয়ালা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন।

'চার পাউন্ড দশ! এ-ঘরের—' কোবি কথাটা শেষ করল না। মনের ভেতরকার ক্ষোভ চাপা দিয়ে বাইরে সহিষ্ণুতা বজায় রাখা কখনো কখনো যে নিতান্ত প্রয়োজন তা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখতে পারার জন্য কোবি তাদের ধন্যবাদ দিল। ইংরেজদের মতই সে মুখে একটা যান্ত্রিক হাসি লাগিয়ে বিলিতী কায়দায় অভিবাদন জানালো। যাক শেষ পর্যন্ত একটা আস্তানা জুটল তাহলে। ঠিক করল গৃহকর্তী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এখুনি হর্নসে পাড়ার এই অ্যাটিক ঘরটাতে আসবে না। কিন্তু নতুন বাড়িউলিকে পছন্দ হবে তো! ভাবল এবার বোধহয় কেটে পড়া উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে বাইরে এল।

'শুক্রবার দেখা হবে,' কোবি দরজার কাছে এসে গৃহস্বামীকে বলল।

'ছটা নাগাদ এয়ারপোর্টে যেতে হবে। পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন? যাবেন নাকি আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে আপনার বাড়িউলিকে রিসিভ করতে, যদি অসুবিধা না থাকে? অবশ্য অনুরোধটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধ হয়,' বাড়িওয়ালা বলেন।

'বাড়াবাড়ি·· অনুরোধ···, না না, তা ঠিক নয়, তবে···'

'তবে কী?'

'না, মানে শুক্রবার আবার একটা মিনিক্যাবের খরচা আছে তো। খরচার ব্যাপার আর কি।'

সায় দেবার মত একটা সাধারণ ভঙ্গি করে বাড়িওয়ালা বলেন, 'ওকে,

শুক্রবার পাঁচটার সময় দেখা হবে তাহলে । পাকা কথা রইল ।'

কিংস ক্রসের মাঝামাঝি এলাকায় একসারি কুৎসিত-দর্শন বাড়ির মধ্যে একটাতে কোবির হোটেল। কাছেই কিংস ক্রস আর সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনের অবিরাম ধোঁয়া লেগে বাড়িগুলির রঙ কালো । অবশ্য, এখন সব ইলেকট্রিক ট্রেন, তবু কোবির কেমন মনে হল কালো কসমেটিকসের ওপর ঝোঁকের জন্যই এককালের গোলাপী যুবতীদের এই দশা হয়েছে।

হোটেলে এসে ডেরার জন্য বিজ্ঞাপনের যেসব উত্তর এসেছিল কোবি সেগুলো নিয়ে নিল । ওগুলো খুলে দেখবার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করল না সে । তার বদলে সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপন-গুলো বাতিল করবে ঠিক করল সে । খামের ওপর স্ট্যাম্প থেকে বোঝা গেল উত্তরগুলো মিডলসেক্সের এনফিল্ড থেকে কেন্টের ডার্টফোর্ড পর্যন্ত বিভিন্ন যায়গা থেকে এসেছে । উত্তরদাতাদের হস্তাক্ষর বা ভাষাশৈলীর পরিচয় নেবার স্পৃহা তার ছিল না।

হোটেলটার বারে এল সে । একটা পানীয় অর্ডার করে সেটা নিয়ে নতুন বাসাকে 'উইশ' করে গ্লাসটা হেলাভরে ঠোঁটে ঠেকালো ।

আঁদ্রে নামে এক ফরাসি ক্রেয়োল তার টেবিলে এল । 'শুভ সন্ধ্যা; নতুন বাসা পেয়েছেন ?' আঁদ্রের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোবি ছোট্ট করে একটা হ্যাঁ বলে, স্বচ্ছে আরেকটা চুমুক দেয়, তরল পদার্থ তখন মাথায় চড়তে শুরু করেছে।

'সেই বেলগ্রেভিয়ার বাড়িটাতে বুঝি ? ওটাতে আপনার খুব ইনটারেস্ট ছিল।'

'না,' বলে কোবি আরেক চুমুক টানে। তারপর যান্ত্রিকভাবে গ্লাসটা খালি করে চিঠিগুলো নিয়ে বাইরে চলে আসে। আঁদ্রে চারদিকে চেয়ে আরেক গ্লাস লাল মদ অর্ডার করে কি করে বন্ধু জোটাতে এবং অপরকে প্রভাবিত করতে হয় সেই বিষয়ে এক মার্কিনীর লেখা একটা বইতে মন দেয় ।

গ্লাসের ঠোকাঠুকির আর গলার আওয়াজ মিলিয়ে এল। কোবি আঁদ্রে ও অন্যান্যদের হতবুদ্ধি করে নিজের ঘরে চলে গেল।

কোবির মনে হল শুক্রবারটা এবার এল বড় দেরি করে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ, কেবল সুন্দরী নিগ্রো মহিলা অ্যাঞ্জেলার ফটোগ্রাফটা বাইরে ম্যান্টেলপিসের ওপর রয়েছে। বাড়িউলি এলেই তাকে নিজের ঘরটার ঠিক করার বিষয়ে কী নির্দেশ দেবে সে তাই ভাবতে শুরু করল। ডবল-ব্রেস্ট শার্ট, ব্রোঞ্জ রঙের মোহেয়ার স্যুট, বাদামী রঙের চকচকে জুতোয় তাকে স্মার্ট দেখাচ্ছে। অ্যাঞ্জেলার ছবিটা ম্যান্টেলপিস থেকে নিয়ে সে ডায়রির মধ্যে রাখল। ছবিটাকে ঘিরে ওর মনে এক ধরনের কুসংস্কার বাসা বেঁধেছে। ছবিটা সর্বদা ওর সান্নিধ্যে থাকে, ওটাকে সৌভাগ্যের সাথী বলে মনে করার দরুন রোজ একাধিকবার ছবিটাকে সে চুম্বন করে, এমনকি রাত্রে মনে মনে কথাও

বলে। অ্যাঞ্জেলাকে পকেটস্থ করে সে হর্নসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

বিকেল পাঁচটা, লন্ডন ইতিমধ্যেই নাইট-গাউনে নিজেকে ঢেকেছে। তার গায়ের ওপর দিয়ে গাড়িঘোড়া লোকজন দ্রুত ছুটেছে ছারপোকার মত, পেটের ভেতর পাতাল রেল শুঁয়োপোকার মত আসাযাওয়া করছে। মুসড়ে-পড়া ধূসর রঙের নগরীর জোলাপ দরকার মেজাজ শরীফ করবার জন্য। মিনি-ট্যাকসি হর্নসের ঠিকানায় পৌঁছলে বাড়িওয়ালার ভাই তাকে ভেতরে আসতে বললেন, একটা চেয়ার এগিয়ে তাকে বসতে বলে ভাইয়ের দেরি হবার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি তখনো টয়লেটে দাঁত মাজছেন।

অগোছালো বসবার ঘরটাতে তাকে তেইশ মিনিট বসিয়ে রাখবার পর গৃহ-স্বামী টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে ট্যাকসিটা তখনো অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। মনের ভেতর কে যেন কোবিকে বলছিল, 'হাল ছেড়ো না।' ট্যাকসির বিল উঠতে লাগল ক্রমাগত. বাড়িওয়ালার ভাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী একা ঘোরাঘুরি করছিল, নোংরা অস্নাত চেহারা, চুলগুলি সজারুর কাঁটার মত উঁচিয়ে আছে। মেয়েটার রাতের খাবার গ্যাস-কুকারটার ওপর রয়েছে, তা থেকে বাসি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাধে কি আর ওর বয়-ফ্রেন্ডটাকে অমন যক্ষারুগীর মত দেখতে ? কোবি ভাবল।

শেষ পর্যন্ত হবু বাড়িওয়ালা তৈরি হয়ে এলেন। ট্যাকসিতে যেতে যেতে পশ্চিম-আফ্রিকার টিকিট-আঁটা একটা খাম থেকে একটা ফোটো বার করে কোবিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মনে হয় দেখে ?'

'বাঃ, বেশ দেখতে। আপনার স্ত্রী নিশ্চয় ?'

'আলবাৎ।'

বছর সতেরর একটা সাদাসিধে দেখতে মেয়ে। মুখে লাজুক হাসি, নাকটা বালতির মত থ্যাবড়া, দুই গাল যেন দুটো ছোট পাকা লাউ।

কোবির অ্যাঞ্জেলা বা 'অ্যাঞ্জেল ফেস' (ঐ নামেও তাকে কোবি ডাকে) এর তুলনায় নেহাতই গোবেচারা।

'সবে বিয়ে হয়েছে বুঝি ?' কোবি জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, মানে ইয়ে···' একটু থেমে তারপর বলেন, 'ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমাদের ইয়ে প্রকসি-বিয়ে হয়েছিল, আগে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। তবে ভাই আমার বেছেছেছে বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে জোগাড় করে দিয়েছে, আমি খুব খুশি।'

কোবি নিজে কেগোল, প্রকসি-বিবাহের সঙ্গে পরিচয় তার কখনো হয় নি। কাজেই বুঝল, বেশ নতুন অভিজ্ঞতা হবে একটা। ফোটোর ছবির সঙ্গে আসল মানুষ যদি না মেলে তবে তো কেচ্ছা হবে।

দুজনেই উত্তেজনায় ভরপুর, যদিও ধরন ভিন্ন। অবশ্য দুজনেই গোবেচারী মেয়েটির দেখা পাবার জন্য উৎসুক। কিন্তু ছবির থেকে চেহারা যদি আলাদা হয়, তবে দুজনের একজনও কি তাকে চিনতে পারবে ?

ইলিউশিন বিমানটি থামল। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আগত অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য রঙচঙে পোশাক পরা মানুষগুলি কলরব করতে করতে এগিয়ে গেল। কোবি লক্ষ্য করল কয়েকটা গাড়িতে সদ্যস্বাধীন আফ্রিকান দেশের জাতীয় পতাকা লাগানো, নিশ্চয় কোনো আফ্রিকান ভি-আই-পি আসছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন থেকে যাত্রীরা নেমে এলেন। তার মধ্যেই গৃহস্বামীটি ফোটো থেকে চোখ তুলে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন তাঁর গিন্নি প্লেন থেকে নামছেন কি না। যাত্রীদের মধ্যে কাউকেই কোবির তার হবু গৃহস্বামিনী বলে মনে হল না। হঠাৎ দেখে হবু গৃহস্বামী একটি মিষ্টি শান্ত-মতন তরুণীর দিকে এগিয়ে চলেছেন, মেয়েটি সবে কাস্টমস পেরিয়েছে। গৃহস্বামী উত্তেজনার বশে দুহাতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যালো, ডার্লিং! আমি কোয়ামিনা।' জাপটে ধরে তাকে সবলে মোক্ষম চুম্বন করলেন।

মেয়েটা তার জিব কামড়ে, মুখের ওপর থুতু ছিটিয়ে, মুখে রোদ-ছাতার বাড়ি মেরে চিল্লাতে শুরু করল। ছুটে গিয়ে আফ্রিকা থেকে আগত রাজনীতিক অতিথিদের দলে আশ্রয় নেয় সে, রাজনীতিকের দল তখন উচ্চকণ্ঠে অসংকোচে জানান দিচ্ছেন যে তাঁরা সদ্য স্বাধীন আফ্রিকান দেশগুলির রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের ওপরই অবশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার স্বাধীনতা অর্জন নির্ভর করছে।

কোবি দ্রুতপদে কোয়ামিনার দিকে এগিয়ে গেল, সে তখন ওয়েটিং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'ব্যাপারটা কী?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'ভুল করেছি, ও নয়।'

'অ্যাঁ! কেলেঙ্কারি!'

তা কী আর এমন হয়েছে। বউ ছাড়া অন্য মেয়েকে কেউ কখনো চুমু খায় নি নাকি?'

মুখ তার রক্তে টুকটুক করছে। 'ভুল করেছি, তা বউ মাপ করে দেবে নিশ্চয়। যাকগে সে-কথা, আমাদেব মানে আত্মসচেতন আফ্রিকানদের ট্রাডিশন মেনে চলতে হবে, ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে। মহান আফ্রিকান পার্সনালিটির আদর্শ ভুললে চলবে না। এই যে হর্নসে আমার বাড়ি, এ তো শ্বশুরমশায় আমাকে যৌতুক দিয়েছেন। আমার স্ত্রী আফ্রিকা থেকে দুশ পাউন্ড আমার পড়ার খরচ বাবদ পাঠিয়েছেন।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই পুলিশ, দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ ভদ্র দুই শান্তিরক্ষী এসে পড়ে কোয়ামিনার বক্তৃতায় ছেদ টানল। তাদের পিছনে পিছনে এলেন 'অপমানিতা' তরুণী, সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞদের একজন। তার বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, গাঢ় ছাইরঙের স্যুট পরনে, পদযুগল সাদা মোজা ও বাদামী জুতোয় আবদ্ধ। পঞ্চদশীটি নাকি তার 'রমণী'—রমণী বলতে কী

বোঝানো হল কোবি জানে না। মেয়েটা বাচ্চাদের মত কাঁদছিল, একটা নীল রুমাল দিয়ে অনবরত মুখ ঘষছিল, কোয়ামিনার চুম্বনের শেষ চিহ্নটিও যেন সে তুলে ফেলতে চায়।

কোয়ামিনাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি মেয়েটিকে বলপ্রয়োগ করবার অভিযোগ আনার ব্যাপারে কোনো বক্তব্য রাখবেন কিনা। অসংলগ্ন ভাবে কোয়ামিনা যা বলেন তার সারাংশ হল, কর্মটি তিনি করেছেন, কিন্তু সেটা সজ্ঞানে কৃত অপরাধ নয়। কিন্তু লন্ডনের পুলিশরা সভ্য ও সহানুভূতিপ্রবণ হলেও জনগণকে বলপ্রয়োগের হাত থেকে রক্ষা করার কর্তব্য বিষয়ে সজাগ ও সক্রিয়। অন্য ভি-আই-পি-রা ইতিমধ্যে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, — ব্রিটেন তাদের যথা-প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিনা, দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে আফ্রিকানদের রক্ষার দায়িত্বপালন করে কিনা দেখতে, কারণ তাদের বিবেচনায় তারা ইংলন্ডীয়দের সমান, তাছাড়া তারা কৃষ্ণবর্ণ মানুষের ত্রাতা এবং গৌরবজনক আফ্রিকান ব্যক্তিত্বের ধারক। তাদের মধ্যে একজন হোমড়াচোমড়া বলেন, 'এরপর দেখব লন্ডন শহরের বুকে একজন আফ্রিকান অন্য আফ্রিকানের গায়ে পচা ডিম ছুড়ছে!'

একজন বিপুলা বয়স্কা আফ্রিকান মহিলা, সর্বাঙ্গে তার চর্বিঠাসা, কোবিকে ঠেলে সরিয়ে অন্যসকলের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোলেন। যারা ভি-আই-পি নয় তাদের সঙ্গে তিনি কাস্টমস থেকে সবে বেরিয়ে এসেছেন। 'এক্সকিউজ মি' বলার তোয়াক্কা না করে তিনি কোয়ামিনার দিকে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে 'হ্যালো ডার্লিং' বলে সজোরে চুম্বন করলেন।

কোয়ামিনা খাম থেকে ফোটোগ্রাফটি বার করে সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার মহিলার দিকে তাকান।

'ওটা দেখছ কেন, ওটা তো তোমার ডার্লিংয়ের তিরিশ বছর আগেকার ছবি, তখন আমার বয়েস ছিল উনিশ। কি গো, দেখতে সুন্দর ছিলাম না তখন?' আশপাশের জনতার তোয়াক্কা না রেখে মহিলা বকবক করেই চললেন। কোয়ামিনার মুখে রঙের চিহ্ন দেখে তিনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন! স্বামীর মুখ থেকে লিপস্টিকের রঙ মুছে ফেলে একাই একশ হয়ে সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অবিকল মার্কেট মামির মত দেখতে, বিশালাঙ্গী, প্রগল্‌ভা, উচ্চকণ্ঠী। চারটি সুসন্তানকে হেঁকে বললেন, 'এই যে এইদিকে, আয় আয়, ড্যাডিকে 'হ্যালো' বল তোরা। এই ক্রোবো আয়, হ্যালো বল!'

মুখে আঙুল পুরে বছর সাতেকের একটা লাজুক বাচ্চা বলে, 'হ্যালো, ড্যাডি!'

'কোয়ামে, আয় আয়, হ্যালো বল!' মুখে মার্বেল নিয়ে একটা ছ'-বছরের ছেলে পিতাকে শ্রদ্ধা জানায়।

'এবার তুই আয়, এফুয়া!' এক ব্র্যান্ডের রুমালে মুখ-ঢাকা পাঁচ বছরের মেয়ে মিষ্টি করে বলে, 'হ্যালো, ড্যাডি!' শেষ পুত্রসন্তান কোবিনা ভেবাচেকা খেয়ে চুপ করে থাকে। দর্শকরাও চুপ।

'তাহলে, স্যার…?' পুলিশমুটোর একটি জিজ্ঞাসু স্বরে বলে। পঞ্চদশী কান্না ছেড়ে তখন অভদ্রের মত খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছেন, তাঁর স্বামী ভদ্রতা রেখে হাস্য করেন।

'থানায় আসবেন দয়া করে ?' পুলিশটি আবার বলে। অন্য পুলিশটি তখন ভিড় সরাতে ব্যস্ত।

'বাচ্চাদের কথা ভেবে দয়া করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। বাছারা বাপকে দেখবার জন্য অস্থির হয়েছিল। ক্ষমা করুন, ভুল হয়ে গেছে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার চেহারার মিল দেখেই বোধ হয়…'

রাগতস্বরে আফ্রিকান 'চীফ' কোয়ামিনাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইনি আপনার স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছুক কণ্ঠে কোয়ামিনা বলেন।

'যদি ভবিষ্যতে এমন ভুল আর না করার প্রতিশ্রুতি দেন তবে পুলিশদের বলে কয়ে আমি অভিযোগ তুলে নিতে পারি।'

সে-রাতে কিংস ক্রসের পুরনো হোটেলে ফিরে এসে কোবি দেখে এক রাশ চিঠি রয়েছে তার অপেক্ষায়। প্রথমেই সে অ্যাঞ্জেলার, তারপর মা-র এবং তারপর তার আদরের ভাইঝির কচি হাতের লেখার খোঁজ করে। এই ট্রিনিটির প্রতি তার অনুরাগ ক্রসের প্রতি পাদরির আকুতি তুল্য।

অ্যাঞ্জেলার চিঠিগুলি সাধারণত স্বর্গীয় হত। সহজ সরল ঋজু ভাষায় লেখা চিঠি। কখনো সখনো কবিতা লিখেও পাঠাত সে। টেপ রেকর্ড করেও খবর আদানপ্রদান করত তারা। গভীর প্রেম তাদের মধ্যে। তাদের এই প্লেটোনিক প্রেম অভিভাবকদের পছন্দ হত না। অ্যাঞ্জেলার চিঠি কোবির মনে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করত। লন্ডনের একাকিত্বের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে দরকার ছিল কোবির সে-ধরনের একটা কিছুর।

সে-রাতে বার ঘণ্টা ধরে ঘুমোলো সে। সকাল তাকে এমন উজ্জ্বল অভ্যর্থনা জানাল যে তার মনে হল এখানকার কুশ্রী হেমন্তকালটাও মাঝে মধ্যে আলো-করা হাসি হেসে তাকে আশা দিতে এবং ক্ষণকালের জন্য হলেও তাকে ট্রপিকাল উষ্ণতার স্বাদ দিতে পারে।

পরিচারিকা কফির সঙ্গে একটা চিঠি নিয়ে হাজির হল। হর্নসের সেই গৃহস্বামিনীর চিঠি। তিনি লিখেছেন :

> প্রিয় মিঃ কোবি বার্নার্ড টেলর,
> প্রথমেই আমার স্বামীকে এবং আমাকে অনুগ্রহ করার জন্য 'ধন্যবাদ জানাই। আপনার মত ভদ্র যুবককে ভাড়াটে হিসাবে পেলে ধন্য হতাম, কিন্তু স্থানাভাব হেতু তা সম্ভব হল না। মহাশয়, আমাদের চারটি সন্তান আছে, পঞ্চমটি ন' সপ্তাহ পরে ভূমিষ্ঠ হবে। তার খ্রাইশটেনিঙের সময়, আশা করি, আপনাকে

নিমন্ত্রণ করতে পারব ।

তবে বাসস্থানের অভাবে যদি নিতান্ত নিরুপায় হন (মনে হয় আপনি সত্যিই নিরুপায়) তবে আমাদের বাথরুমে থাকতে পারেন । ওটাকে আমরা লিভিং রুমে পরিণত করব ঠিক করেছি । অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন । দিনের বেলা যে কোনো সময় ফোন করতে পারেন, সাক্ষাতে কথা হলে অবশ্য আরো ভাল হয় । আমার স্বামী রোজই কাজে যান, তবে আমি বাড়িতেই থাকি । ইতি—

(মিসেস) আম্মা কে···

কোবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে । 'কত রঙ্গই জানো, আফ্রিকা ।' এবার তার বিজ্ঞাপনের উত্তরের পাঁজাগুলি খোলে । তাদের একটাতে রয়েছে 'বেলগ্রেভিয়াতে ফ্ল্যাট শেয়ার করতে পারেন । ব্যাচেলরের বাসা । গাত্রবর্ণ বা ধর্মবিশ্বাস কোনো অন্তরায় নয় । কিন্তু নারীর আগমন নিষেধ ।'

কেন ? নারীর আগমন নিষেধ কেন ? আর এক অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরোয় সে ।

জঁ প্লিয়া

মন্ত্রপূত বৃক্ষ

প্রাক্তন ফরাসি কলোনি দাহোমেতে প্লিয়ার জন্ম। বেশ কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করেন। স্বাধীনতার (১৯৬০) পরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন, এবং দাহোমে (বর্তমানে বেনিন প্রজাতন্ত্র) পরিষদের সদস্য হন। উগ্র জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী লেখক বর্তমান গল্পটিতে আফ্রিকার সনাতনী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। অবশ্য নিছক নিয়তি নিংপিষ্ট মানুষের কাহিনী হিসাবেও গল্পটি পাঠ করা যেতে পারে।

দাহোমে রাজ্যের রাজধানী প্রাচীন আবোমে নগরের স্থান আফ্রিকার ইতিহাসে বিশিষ্ট। সে-শহরের শিল্পকলা, শাসনপদ্ধতি ও সামরিক শক্তির গুণগানে ঐতিহাসিকরা মুখর। কিন্তু তারা পুরুষ-পরম্পরায় প্রাপ্ত প্রথা ও প্রতিমার মন্ত্রশক্তির ব্যাপারে নীরব। ফরাসি শাসনের ফলে দাহোমে সমাজে যে-বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, সে-ক্রমবর্ধমান বিরোধের বলি তাদের ঐতিহ্য।

পীচঢালা বোহিকন রোডকে এ-শহরের মেরুদণ্ড বলা চলে। নববিধানের মৌল প্রাসাদসমূহ এই পথেরই দুধারে স্থিত। স্কুল, হাসপাতাল, পোস্টঅফিস, জলের ট্যাংক, থানা আর নগরপ্রান্তে কবরখানা সবই এই রাস্তার ধারে। গোরস্থানের শতেক শ্বেত সমাধিসৌধ রৌদ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। সেকালে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে; মৃতের আত্মাকে পরিবারের সঙ্গে সংপৃক্ত মনে করা হত। তাদের স্মৃতির প্রতি জীবিতদের আনুগত্য ছিল তাদের ধর্মের ভিত্তি। আধুনিক সমাজে তারা অসংলগ্ন, তার মধ্যে নিহিত একটি বেদনাবিধুর বিচ্ছেদের বীজ।

পশ্চিম থেকে পুবে প্রসারিত পাকা রাস্তাটি এক জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। সেখানে পথটি একটি চতুষ্কোণ চত্বরে পড়েছে। চত্বরের ঠিক মাঝখানে একটি সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভ প্রোথিত। চত্বরকে ঘিরে রয়েছে প্রশাসনিক সৌধশ্রেণী—স্থাপত্য তাদের ঔপনিবেশিক বা অতি আধুনিক, আছে জেলা-পরিষদ, আদালত আর কাউন্সিল চেম্বার।

শহরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে হুঁজরো মার্কেট, চেহারাচরিত্রে চত্বরের সম্পূর্ণ বিপরীত। করোগেটেড টিনের শেড আর খড়-ছাওয়া ছাদের দোকানঘরের কুশ্রী সমাবেশ।

সদর রাস্তার দুধারেই, প্রাচীন আবোমে, নিপুণ শিল্পী আর পরাক্রান্ত রাজনের আবোমে একদা সমৃদ্ধ সভ্যতার অবশেষকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। রাজবাড়ি বর্তমানে সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত, তাতে রক্ষিত সম্পদ এখন টুরিস্টের দৃষ্টির বেসাতি। কালেভদ্রে ঘেজোর বাড়ির সামনে সনাতনী নৃত্যের আয়োজন করা হয়, রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা উৎসবের মাধ্যমে অতীতকে স্মৃতির অর্ঘ্য দান করেন।

সদর রাস্তাকে অবলম্বন করে যে-জীবনস্পন্দন ওঠে তাই সমস্ত শহরটির সুর বেঁধে দেয়। তবু যে-রহস্যাবৃত শক্তি নৃপতিবর্গকে ক্ষমতা যোগাত, সেই শক্তি সেই জ্ঞান এখনো পূর্বধদের মস্তিষ্কে সঞ্চিত, মূর্তি মন্দিরে, অশরীরীদের সভায় সজীব। শহর ছেড়ে জেলার ভেতর একটু এগোলেই দেখা যাবে রাঙামাটির পথ-গুলি হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বাঁক নিয়েছে। মনে হয় গলিগুলি যেন সামনে-পড়া পর্ণকুটির আর একক বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করছে। যদি পথভ্রষ্ট হয়ে অগণিত দীপ্তচক্ষু বালকদের কাউকে পথের বক্রগতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে ওরা জানাবে ঐ জীর্ণ কুটির দেবমূর্তির (সাহেবরা যাকে অবজ্ঞা করে বলেন 'ফেটিশ') মন্দির, গাছগুলি প্রয়াত পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি।

আধুনিকতার দাবি মেটাতে অতীতের কতিপয় স্মৃতিচিহ্নকে বিলীন হতে হবে। কিন্তু সরকারি আমলাদের প্রায়ই উভয় সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে ছোকরা কর্মচারীদের, অতীত সভ্যতার সামান্যতম পরিচয়ও যাদের নেই।

তরুণ যুবক পল লান্টা তাদেরই একজন। ওঁর জন্ম কতোনু শহরে। বৃহদাকৃতি কর্মচঞ্চল এই শহরের কোনো অতীত নেই। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত ঐ শহরে ছিল তাঁর অবস্থিতি। ভূবিদ্যায় প্রশিক্ষণ সমাপান্তে তিনি নগর-পরিকল্পনা বিভাগে কেরানির কাজ পান। কিন্তু লান্টা নিজেকে সিভিল ইঞ্জি-নিয়ার বলে গণ্য করতেন। আপাদমস্তক আধুনিক ছিলেন তিনি; স্থির বিশ্বাস ছিল তাঁর যে দেশের যুবশক্তি বাধাবন্ধনহীন হবে। পেশায় পরিশ্রমের ফলে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত আবোমে শহর-পরিষদের পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হল।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে লান্টা বিশেষ সযত্ন ছিলেন। নিখুঁত ভাঁজ-করা টেরিলিন প্যান্ট, নাইলনের শার্ট আর লাল রেশমের টাই, বাকলস-আঁটা জুতোয় তাঁকে সর্বদা ছিমছাম দেখাতো। খর্বাকৃতি মানুষটা যখন দৃঢ় পদক্ষেপে মাথা তুলে হাঁটতেন, তখন বোঝা যেত আপন ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বিষয়ে তিনি সদা সচেতন। তাঁর মেলামেশা ছিল শুধু শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে, সম্ভ্রান্ত পাড়ায় তাঁর বাস, বয়োবৃদ্ধদের ধারে কাছে ঘেঁষতেন না তিনি। তাদের সান্নিধ্যে শেখবার আছে বা কী এ-প্রশ্নের সদুত্তর কখনো তিনি পান নি।

সেদিন সকালে টাউন হলে নিজের অফিসে এসে ম্যসিয় (Monsieur) লান্টা সযত্নে টেবিলের ধুলো ঝেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। কাজেকর্মে নিয়ম মেনে চলা

তাঁর দপ্তর, ব্লক ক্যালেন্ডার খুলে তিনি দেখলেন যাদের কাজের তদারকি তিনি করছেন, সেই শ্রমিকদের সেদিনই একটা নতুন রাস্তা তৈরি আরম্ভ করবার কথা। ডেস্ক থেকে পেতলের ঘণ্টাটা বার করে সজোরে নাড়তে লাগলেন। যৌন রোগে আক্রান্ত লোকের মত হতশ্রী চেহারা নিয়ে জীর্ণ কোট পরিহিত বুড়ো আর্দালিটি দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই একটা কেঠো মিলিটারি স্যালুট ঠুকল।

'সোজা রিপাব্লিকান গার্ডের ক্যাম্পে চলে যাও,' লাম্টা সাহেব বলেন, 'নতুন রাস্তা কাটবার কয়েদিদের সর্দার আনাতোলকে ডেকে নিয়ে এস এখুনি।'

'আচ্ছা স্যার,' আর্দালি উত্তরে বলল।

'দলবল নিয়ে এই মুহূর্তেই যেন সে এখানে এসে পড়ে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

আর্দালি চলে গেল। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হল। ডেস্ক পরিষ্কার করে লাম্টা সাহেব অফিস পরিদর্শনে বেরলেন। টাউন হলের বিরাট চত্বরে সবুজ গালিচা-সদৃশ লনে নানা বয়স ও নানা দৈর্ঘ্যের ডজন খানেক কয়েদি দুটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পরনে কলার ও বোতামহীন হাফহাতা সার্ট আর নীল রঙের শর্টস। পায়ের দিকে তাকালে বোঝা যায় জীবনে জুতো পরে নি। কেউ বা কোদাল, কেউ বা গাঁইতি, কেউ বা কাঠের নিড়ানি নিয়ে তারা তৈরি।

'আজ আমরা সিনহুয়ে রোডে কাজ করব,' লাম্টা সাহেব আনাতোলকে বলেন; গিলটি-করা বোতাম বসানো, ধূসর-ঘেঁষা রুপোলি রঙের মাথা-বিশিষ্ট টুপিটা তিনি সবে ঠিকঠাক করে মাথায় বসিয়েছেন। 'হুঙ্গরো মার্কেটের পশ্চিম দিকে যে-রাস্তাটা গেছে, তার ওপর নব্বই ডিগ্রি কোণ করে রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাটতে হবে। যাও, দলবল নিয়ে চলে যাও কাজের যায়গায়।'

আনাতোলের আদেশে কয়েদিরা পীচের রাস্তার ওপর হেঁটে কর্মস্থলের দিকে চলল। রাস্তার সংলগ্ন মাটিতে প্রবল বর্ষণের ফলে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বেলা বেশি হয় নি, তবু মসৃণ পীচ তখনই তপ্ত হতে শুরু করেছে। তবে দুপাশে পোঁতা আকাসিয়া গাছের নরম ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া তখনো দরকার মনে হচ্ছে না। বাতাসের বাষ্প আর্দ্রতায় আসন্ন ঝড়বৃষ্টির সংকেত। শুষ্ক ঋতুর শেষে মার্চ মাসে প্রতি বছরই এমন হয়ে থাকে, বিশেষ করে এই মধ্য-উপত্যকা অঞ্চলে।

বাজারে পেঁছে তারা ডান দিকের পথ ধরল। লাল ল্যাটেরাইট মাটির ওপর কোয়ার্টস পাথর-বিছানো পথ। আধ কিলোমিটার দূরেই এ-পথ থেকে একটা রাস্তা বেরিয়েছে। এটাই সিনহুয়ে রোড। শর্টকাট রাস্তা ধরে লাম্টা সাহেব আগেই অকুস্থলে পেঁছে গেছেন। এদের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

এই আঁকাবাঁকা রাস্তাটাকেই কেটে সোজা ও চওড়া করতে হবে ভেবে কয়েদিকুল একটু ভড়কে গেল। কাজটা খুব সোজা নয়। বাঁ-দিকে প্রথম বাঁকেই রয়েছে একটি অপূর্ব ইরোকো বৃক্ষ, লোকে যাকে এখনো ভক্তিভরে বলে 'লোকো'। উদ্ভিদবিদের ভাষায় 'ক্লোরোফোরা এক্সেলসা'। দূরে থেকে গাছের গুঁড়িটা দেখা

যায় না, ঘন বনঝোপে তা আবৃত। সে-আবরণ ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠেছে মহীরুহ, কাণ্ডটি তার গির্জাস্তম্ভের মত সরল সমুন্নত, তারই ঊর্ধ্বে শোভা পায় ঘনসবুজ পত্রগুচ্ছ। টেলিগ্রাফের তারের মত পোক্ত লতার জাল গাছের মাথা থেকে নিম্নগামী। বিশাল ডালপালার পাতা তলায় নিশ্ছিদ্র ছায়া ফেলেছে।

গাছটি দেখে নিজের অজ্ঞাতেই মনে কেবল ভয় মিশ্রিত অনুভূতি জাগে।

কয়েদিদের মনে মুহূর্তের মধ্যে দ্বিধা জাগে: বলপ্রয়োগে ঐ গাছ কাটতে বাধ্য করা হবে কি তাদের? কথাটি না বলে কাজ শুরু করে দেয় ওরা। বাজারের রাস্তা থেকে ভাবি রাস্তাটির সম্ভাব্য প্রস্থ তারা ফিতে দিয়ে মেপে নেয়। গাছটির দিকে কিছুটা এগোবার পর কাঠি পুঁতে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন তৈরি করে তাতে সুতো বেঁধে দেয়। এ-ভাবে কাজের যায়গা নির্দিষ্ট করবার পর তারা লেগে যায় আগাছা পরিষ্কারের কাজে। কিন্তু সমস্যাটাকে আর তো চাপা দেওয়া যায় না। আনাতোল নিজে আবোমের মানুষ, সে ব্যাপারটা ভাল করেই জানে, তার মনেও সেই একই ভয়। ইরোকো নির্মূল করবার নির্দেশ দেবার অস্বস্তিকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে উৎসুক সে। লাম্টা সাহেব একটু দূরে একটা পাথরের ওপর বসে। জনা কয়েক লোক এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আনাতোল আগ্রহে সম্মতি দিল।

'বস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি অভয় দেন,' ওদের মুখপাত্র বলল, 'ঐ গাছটার কী করব আমরা?'

'কী করব মানে?' সরকারি আমলা বলেন, 'রাস্তার মধ্যিখানে একটা পেল্লায় গাছ কেউ রাখে শুনেছিস? প্ল্যান করা হয়েছে শহরে সুন্দর সোজা চওড়া রাস্তা তৈরি করার। সামনে যদি বড় গাছ পড়ে তো উপড়ে ফেলতেই হবে, না হলে পীচ ঢালা হবে কী করে?'

'কিন্তু কাটব কী দিয়ে? কুড়ুল নেই, করাত নেই!'

'যা, যা, কাজ করগে।' সাহেব এবার চেঁচান, 'এই প্রথম গাছ কাটছিস, অ্যাঁ?'

'বস, সেসব তো ছোট ছোট গাছ, না হয় তো ঝোপঝাড়। এত বড় গাছ তো আমরা আগে কাটি নি। ওটা নাকি ইরোকো। কাটলে বেজায় বিপদ হতে পারে। ওরা তাই ভয় পেয়েছে, বস।'

'কোনো কথা শুনতে চাই না; ব্যস! অকম্মার ধাড়ি! ঠিক আছে, আজ শুধু জঙ্গল পরিষ্কারই চলুক। কালকে করাত কোদাল এনে দেওয়া যাবে। যা, কাজে যা।'

ফিরে গিয়ে এ-কথা বলতেই কয়েদিরা চঞ্চল হল। ঘর্মাক্ত মুখগুলিতে সবুজ ঘাসের টুকরো ইতস্তত লেগে রয়েছে, সেই মুখে অসন্তোষের রেখা দেখা দিল। নিজেদের মধ্যে অস্ফুটে কথা বলে তারা অসন্তোষকে লাগাম পরিয়ে আবার কাজে লাগে অনিচ্ছুকভাবে। গাছটির যত কাছে পৌঁছয় তারা ততই কাজের গতি শ্লথ হয়। দূরে থেকে মাসিয় লাম্টা তা দেখে হতবুদ্ধি হন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি

আনাতোলকে এই গতি হ্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কয়েদিদের চেয়ে আনাতোল এ-বিষয়ে কম উত্তেজিত নয়। লান্টার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধি করে সে ওদের হয়ে ওকালতি করতে গিয়েছিল যে-লোকটা তার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। বলে যে দলের অন্যদের ওপর ওর নাকি বেশ প্রতিপত্তি আছে।

'লোকটা বলছে,' আনাতোল বলে, 'ও-গাছটা নাকি দেববৃক্ষ, ওর ডাল কাটাও মানা। ও-ই নিশ্চয় অন্যগুলোকে তাতিয়েছে!'

কয়েদিরা আর এগোবে বলে মনে হচ্ছে না। গালিগালাজ, শাস্তির ভয় বৃথা গেল, ম্যাসিয় লান্টা জোর করে কাজ করাবার সিদ্ধান্ত নেন অগত্যা। আনাতোল যার কথা বলেছিল তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে যান। লোকটার নাম মেহু। আধাপাকা চুলগুলো ছোট ছোট বলের মত গোল্লা পাকিয়ে আছে। প্রশস্ত ললাট আর উজ্জ্বল চোখদুটো মুখটাকে হাজারের মধ্যে আলাদা করে রেখেছে।

অন্যেরা অনিচ্ছুক হাতে কোদাল চালাচ্ছে, মেহুকে নিয়ে লান্টা একটু তফাতে যান।

'কি রে, কী সব গাঁজাখুরি গপ্পো ছড়াচ্ছিস ওদের মধ্যে? বেআদবি চলবে না বলছি! এ-ব্যাপারে নিয়মকানুন কিন্তু খুব কড়া, খেয়াল থাকে যেন!' দিশি সাহেব বলে চলেন। 'বল, কী বলবার আছে তোর।'

সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়েছে মেহু, মাথা তার ঈষৎ নমিত, দুহাত পিঠের পিছনে জোড়া। সে বলে, 'বস্, গাঁজাখুরি গপ্পো নয়। আমার চুল পেকেছে, আজকের মানুষ নই আমি। এই আবোমেতেই জন্মেছি আমি, নিজের চোখে দেখেছি রাজা বেহানজিনকে ধরে ধলা সাহেবদের দেশে চালান দিতে। আমার বাবা ছিলেন নামডাকের পুরোহিত, সেকালে প্রেতাত্মাদের বসতি ছিল যেসব পবিত্র বনে তার সব ইতিহাস আমার জানা। সেই রাজারাজড়াদের কালে এ-অঞ্চল ইরোকো গাছের জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেসব গাছ স্পর্শ করবার অধিকার ছিল না কারো, করলে কঠিন শাস্তিবিধান করা হত। কিন্তু কিছুদিন আগে থেকেই দেখছি, লোকেরা সেসব গাছ কেটে, তাই দিয়ে চেয়ার, টেবিল, দরজা বানাতে শুরু করেছে। তাই এখন মাত্র কয়েকটি গাছ বাকি। তাই, কাঠুরের কুড়ুলের ঘা থেকে বেঁচে রয়েছে যে-কটি গাছ তাদের মূল্য অসীম। আমাদের গুনিনরা সেসব গাছকে ঘিরে নিশির আসর বসান। ভগবানের ভোগ সাজানো হয় সেইসব গাছের তলায়, না হলে চৌমাথার মোড়ে, চারদিকের বাতাসে ভোগের নিবেদন ছড়িয়ে পড়ে। এসব গুনিনদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করা নিরাপদ নয়। শান্তিতে বসবাস করতে হলে, বহাল তবিয়তে থাকতে হলে, কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চালাতে হলে তাঁদের আশ্রয় ছাড়া চলে না।'

'বস্, যে-ইরোকোটি আমাদের কাটতে বলছেন তার ইতিহাস শুনুন। রাজা তেগবেসুকে তার শত্রু জা'র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাদের চালাকির ব্যাপারে সাবধান করে দিত এক পাখি, এই গাছের ডালেই ছিল তার বাসা।

ডান রাজ্যে তাই এই গাছ চিরকাল পুজো পেয়ে আসছে। তাই বলছি, বস্, এ-গাছটা থাক। গাছটাতে একটু চড়লেই বুঝতে পারবেন এর কাণ্ডটা একদম ফাঁপা। লোকে বলে ওর মধ্যে আছে এক সাপের বাসা, গাছের ডগা থেকে সে সবকিছুর ওপর নজর রাখে, অশুভ আত্মার কোপে পড়লে মানুষ এখানে এসে পুজো দেয় সেই মহাসর্পকে। সাপ থাকুক বা না থাকুক, গোটা গাছটাই আমাদের সর্বশক্তিমান দেবতাস্বরূপ। মাপ করে দিন, বস্, ঐ মহাবৃক্ষের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি দিন।'

বৃদ্ধের দীর্ঘ কাহিনী শুনে লান্টা বিরক্তিবোধ করলেন, মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন লেগে রইল। বিদ্রুপের হাসিও দেখা গেল চোখে। এমনি করে মন্ত্রপূত প্রতীকের প্রতি সম্মান দেখাবার ও দুষ্ট প্রেতাত্মার কবল থেকে সাবধান থাকবার উপদেশ এর আগেও তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা দিয়েছে। ভিতরে ভিতরে আশ্চর্য হন তিনি, কী করে লোকে এসব অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশ্বাস করে।

'শুনলাম তো সবই,' তিনি বললেন, 'কিন্তু প্রমাণ কোথায়? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এসব মূর্তিপুজোতে কেউ বিশ্বাস করে? করলে, এই স্বাধীনতা পাবার পরও আমরা আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র গড়ে তুলব কী করে? ও-গাছ আমাদের কাটতেই হবে, এটা সর্বসাধারণের মঙ্গলের ব্যাপার। না, আমার হুকুমের নড়চড় হবে না। এই পুরনো আবোমে শহরটাকে আধুনিক করে তুলতেই হবে।'

ঠিক সে-সময় আরেকটি কয়েদি-শ্রমিক এসে বলল, ও-গাছ কাটতে রাজি এমন কাঠুরিয়া ও ধরে আনতে পারে। সে-কাঠুরের নাম দোসু।

লান্টার বাস্তব চেতনা সজাগ, তিনি সেদিনকার মত কাজ বন্ধ রাখবার হুকুম দিলেন। পরদিন গাছ কাটার কাজে দোসুকেই লাগাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে কয়েদিরা ক্যাম্পে ফিরে গেল।

রাতে দোসুকে চেনে যে-কয়েদিটা তাকে নিয়ে আনাতোল গেল তার খোঁজে। শহরের উপকণ্ঠে হুতুঞ্জি কামারদের এলাকায় দোসুর বাড়ি, গোলাকৃতি কুটির, কোনো জানালা নেই তাতে। মাটির দেয়াল এবড়ো খেবড়ো, চুনকাম করা, খড়ের চাল দিয়ে ঢাকা। হোগলার তৈরি কপাটের ভেতর দিয়ে টিমটিমে আলোর হলদে আভা চোখে পড়ে। একটু দূরে দেয়ালের গায়ে একটা তালপাতা-ছাওয়া ছোট রান্নাঘর। মাটির উনুন থেকে কাঠের আগুনের হলকা দেখা যাচ্ছিল। রান্নার গন্ধে বাতাস ভরপুর। মাটির হাঁড়ি পাতিল ইতস্তত গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাতের মোরগের খোঁজে মুরগিগুলো কলরব করে বেড়াচ্ছে উঠোনে। কয়েদিটি হাতে তালি বাজিয়ে আগমনবার্তা জানাল।

'কে ওখানে?' গম্ভীর শান্ত পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল। উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই প্রশ্নকর্তা বলল, 'কোসি! দেখতো গিয়ে দরজায়, ডাকে কে!'

কোসি নামে সাড়া দিল যে-যুবক, গলায় জড়ানো একটা কাপড়ের ফালি কাঁধ ঢেকেছে তার। সহাস্যমুখে ঝাঁপ খুলে দিয়ে দাঁড়াল সে, কিন্তু আনাতোলের

মাথার টুপির দিকে তাকিয়ে সে ভয় খেয়ে গেল। মুখ থেকে হাসি মুছে নম্র-স্বরে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, স্যার !'

আনাতোল তার ইউনিফর্মের প্রতিক্রিয়া টের পেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আমি তোমার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আচ্ছা, ডাকছি তাকে।'

রিপাব্লিকান গার্ড দেখা করতে চায় শুনে দোস্তু ভাবল পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ ধরতে এসেছে তাকে। কী অপরাধ করেছে সে ভাবতে লাগল। সাধুতার জন্য তার খ্যাতি ছিল, নিজেকে নিশ্চিতভাবে নিরপরাধ জেনে সে উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের ভেতরে আসতে বলল। করমর্দন করতে গিয়ে আনাতোল দোস্তুর কব্জির জোরের পরিচয় পেল।

একটা দেয়াল ঘরটাকে দুভাগে ভাগ করেছে। তার একটা শোবার ঘর, অন্যটা বসবার। কাঠের তৈরি তেপায়া টুলের ওপর অতিথিদের বসতে দেওয়া হল। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে কুড়ুল, করাত, গাঁইতি আর মোটা দড়ি।

দোস্তুর চেহারা পাকা খেলোয়াড়ের মত—বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহুতে পাকানো মাংসপেশি। চোখদুটি ঈষৎ টেরা, সর্বক্ষণ হাসিতে উজ্জ্বল। পরনে মোটা কাপড়ের কটিবাস মাত্র। আনাতোলের টুলের দিকে এগিয়ে আসতেই দেখা গেল, ডান পা-টা একটু ছোট বলে সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ওর যত শক্তি তা ঐ পেশল বাহুদুটিতে।

কোর্সি দরজার কাছে হাঁটু মুড়ে বসল, এমন অতিথি সমাগমের উদ্দেশ্য জানবার জন্য সে উৎসুক। ভূমিকা না করে আনাতোল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সংক্ষেপে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাল। গাছ কাটতে রাজি হলে কী বিপদ ঘটতে পারে সেটাও সে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় সে সম্মত কি না। দোস্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে; তারপর হঠাৎ হেসে উঠে। সরকার তাকে একটা স্বীকৃতি দিয়েছে জেনে সে আত্মতুষ্টি অনুভব করল, উল্লাস গোপন করবার চেষ্টাও করল না সে। কে বলতে পারে, সরকারি নেকনজর যখন পড়েছে, কালে সে একটা সরকারি কাজ পেয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার মনে সর্বদা স্থির বিশ্বাস ছিল। সে ছিল আল্লাদার ছেলে। চোদ্দ বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে তার ডান পা ভাঙে। সেদিনই সে প্রতিজ্ঞা করে যে কাঠুরেগিরি হবে তার একমাত্র পেশা।

সেদিন থেকেই গাছ কেটে সে এক ধরনের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করত, তার অঙ্গহানির কারণ একটি গাছ, তাই গাছের ডাল কেটে সে এক ধরনের আনন্দ পেত। কুড়ুল হল তার একমাত্র অস্ত্র। কত জোয়ান তো রয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে একমাত্র তাকেই এ-কাজে বহাল করা হল ভেবে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

'যদ্দুর স্মরণ হয় আমি কবজা করতে পারি নি এমন গাছ এ-তল্লাটে জন্মায়

নি। কোস্তের কাছের সেই বাওবাব গাছটার কথা মনে আছে ? আমি ছাড়া ও-গাছ সাবাড় করার হিম্মত কারো ছিল না। মনে নেই ? পাঁচ বছর আগে-কার কথা, সাহেব-কমাণ্ডারদের সময় ঘটেছিল ব্যাপারটা। সভা করে আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, একটা মেডেল দেবে এমন কথাও হয়েছিল তখন।'

অতিথিদের উসখুস করতে দেখে দোসু স্মৃতিচারণ স্থগিত রেখে সজাগ হল।

'কাল কী বার ?'

'হাটের দিন, বেস্পতিবার হবে,' কয়েদিটি বলল।

'বাঃ, বেশ ! সুলক্ষণ বলতে হবে। আচ্ছা তাহলে সিনহুয়ে রোডে দেখা হবে কাল ?'

'হ্যাঁ। দেরি হয় না যেন। সিভিল সার্ভিসে সময়ের দাম আছে কিন্তু,' আনাতোল গুরুগম্ভীর গলায় বলল।

'সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দোসুর ঘর থেকে যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পাম তেলের ধোঁয়াটে আলো থেকে চোখ ফেরানোর ফলে অন্ধকার গাঢ়তর মনে হল। হাতড়ে হাতড়ে শেষে রাস্তার হদিস মিলল। শুষ্ক ঋতুর স্বভাব অনুযায়ী আকাশে নির্দয় নির্মলতা বিরাজ করছে, এই চারপাঁচ মাস ধরে চাষিরা এখানে শীতল বৃষ্টিধারার স্বপ্ন দেখে। বাতাস টাটকা। পথের দুধারের ঘাসে জোনাকি সবুজ ফসফরাস জ্বালিয়েছে। কার্যসিদ্ধির দরুন আনাতোলের মেজাজ ভাল। কয়েদিটাকে ক্যাম্পে পেঁছে দিয়েই সে ছুটল ম্যাসিয় লান্টার কাছে সুখবরটা দিতে।

পরদিন ভোরে উঠে দোসু তার সাকরেদ কোসিকে জানাল যে মোক্ষম এক কাজের দায়িত্ব আছে আজ। জীবনে এমন সুযোগ জোটে নি। হাসিল করলে মিলবে প্রচুর সম্মান ও অর্থ। গভর্নরের আদেশে সিনহুয়ে রোডের ইরোকো কাটতে হবে। কোসি কাল রাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, রাতভর ভেবেছে কাজটা উচিত হবে কি না। সাহস করে সে মিনমিন করে বলল, 'সর্দার, কাজটা কি না করলেই নয় ?'

'চুপ কর গাড়ল, উলটোপালটা কথা বলিস না। আমাকে চিনিস না তুই ? এ্যাদ্দিন আছিস আমার সঙ্গে, অ্যাঁ ? নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে নাকি আমার হিম্মতের ?'

'মাপ করুন, সর্দার, আমি আপনার শক্তিকে সন্দেহ করছি না। লোকে বলে ঐ ইরোকোটা মন্তর জানে। কাটলে যদি ক্ষতি করে, তাই।'

'থাম ! আমি তুকতাককে ঠেকাতে পারি, সেটা তোর জানা নেই ? আমি কি কাল জন্মেছি নাকি ! যাকগে কাপুরুষের সঙ্গে তক্কো করার অভ্যেস আমার নেই। যা, আমার সবচেয়ে ভাল কুড়ুল নিয়ে ধার দে গে।'

দেয়াল থেকে ভারি কুড়ুলদুটো নামিয়ে কোসি রান্নাঘরের দিকে গেল। প্রথমে একটা বড় পাথরের ওপর বেশ খানিকটা তেল ঢেলে নিল। ঘষে ঘষে

কুড়ুলটাকে ক্ষুরধার করে তুলল। তারপর মুখ গোমড়া করে যন্ত্রপাতি নিয়ে দোসুর আগে আগে চলল।

জবলজবলে রঙিন পোশাক পরে দোসু এগিয়ে গেল ধীর গতিতে। অনতি-দূরে এক পড়শির সঙ্গে দেখা, সে ফিরছিল। বিরক্তকণ্ঠে সে স্বগতোক্তি করে, 'না, আদৌ ভাল হচ্ছে না কাজটা। অশুভ ভবিষ্যতের সূচনা আছে এতে।' লোকেরা যে গাছ-গাছড়া, পাথর পুজো করত তাতে দোসুর সায় ছিল না, তাই বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে সে নিরুৎসাহ ছিল। সে শুধু মেনে চলত পরম দেবতা দাদা সেগবোর বিধি, যিনি দিবসরাত্রির, দুনিয়ার তাবৎ প্রাণী ও বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর বিপদ সংকেত শুধু দীক্ষিতরাই বুঝতে পারে। তাঁর কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্য সে সযত্নে কাজের শুভদিন বেছে নিত। কর্মকার, যোদ্ধা এবং ধারালো হাতিয়ার নিয়ে কাজ করে যারা তাদের রক্ষকদেবতা গু'র প্রতি উৎসর্গ-করা দিনগুলিতে সে ধাতু স্পর্শ করত না। তেমনি করে কাজে বেরিয়ে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হত, চেহারা দেখেই সে বুঝে নিত সে-দিনটা কেমন যাবে। এছাড়া ঐ সাপ, পাথরের নুড়ি বা গাছকে পুজো দেওয়া তার মত লোকের কাছে কুসংস্কার মনে হত। যাই হোক, আজকে ভাগ্য তাকে এমন এক কাজের ভার দিয়েছে, তাতে তার সন্দেহ রইল না যে এ দাদা সেগবোর আশীর্বাদ না হয়ে যায় না।

ভোরের আকাশে গতরাতের নির্মলতা অটুট, তফাত শুধু এই—রুপোলি তারা অদৃশ্য হয়েছে, তাদের যায়গা নিয়েছে স্বর্ণাভ সূর্য।

কিছুক্ষণ পরেই দোসু ও কোসি হুংজরো মার্কেটের পাশ দিয়ে চলে গেল, সেখানে সবে বাজার বসছে। সাইকেলে ব্যাপারীরা যাচ্ছে, পেছনে কেরিয়ারে বসে আছে বউ, তাদের পিঠে বাচ্চা বাঁধা, মাথায় বেসাতি। পথচারীরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সাইকেলের পথ করে দিচ্ছে। আলু-ভর্তি একটা লরি যেতেই দোসু আর কোসি লাল ধুলোয় মাখামাখি হল। পাছে ধুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে যায়, তাই তারা দু-আঙুলে নাক টিপে ধরে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর আবার চলতে শুরু করল। কোসি চুপ। তার চোখে অনেক কুলক্ষণ ধরা পড়েছে, তাই সে বিমর্ষ।

কর্মস্থলে পেঁছেই দোসু ইরোকোর দিকে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ ধরে সে বিশাল গাছটির দিকে তাকিয়ে রইল, জাহাজের খোলের ঠেকার মত চারদিকে ঝুরির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মহীরুহ। ছাই রঙের গুঁড়িটার কিছুটা মসৃণ, বাকিটায় ছাল উঠেছে, অথবা ফেটে গিয়ে দেখাচ্ছে কুমীরের চামড়ার মত। দক্ষ কারিগরের মত দোসু মুহূর্তে কাজের ছক কেটে নিল মনে; যেসব কর্মেদি ওকে সাহায্য করবে তাদের গাছটার চারপাশের আগাছা ছাঁটতে বলল। মুহূর্তে ঝোপঝাড় পরিষ্কার হয়ে গেল। লতাজাল কাটা হল ডাল পরিষ্কার করার জন্য। জঙ্গল সাফ করে একধারে সরিয়ে রাখল তারা, শুকোলে জ্বালানি হবে।

গাছটার গায়ে একটা খড়ের ঘরের ভেতর দুটো মাটির ঢেলা দিয়ে তৈরি একটি মূর্তি ছিল, ছোট ঢেলাটি মাথা, বড় ঢেলাটি ধড়, ধড়ের নিচে একটি কাষ্ঠনির্মিত লিঙ্গপ্রতীক। এই দেবমূর্তি—টোলেগবা—দাহোমে রাজ্যে যত্রতত্র দেখা যায়; দেব খুবই জাগ্রত। পুণ্যার্থীরা মূর্তিকে পাম তেলে সিক্ত করে। কয়েদিরা সে-মূর্তি চুরমার করে দিল।

জলাটা সাফ হলে দোসু তার রোমানদের টোগার মত গাত্রবস্ত্রটি খুলে কটিবাস সর্বস্ব শরীরে এগিয়ে এল। দুহাতের পেশি চাপড়ে হাতের তালু থুতু দিয়ে ভিজিয়ে ঘষে নিল, যাতে হাতের বাঁধন শক্ত হয়, তারপর কুস্তিগিরের মত একটা কুড়ুল ধরল বজ্রমুষ্টিতে। বাকলটাকে আলগা করে নিল প্রথমে, গাছের গায়ে সুবিধামত একটা দাগ কেটে নিল তার ওপর কুঠার চালাবে বলে। ঠিক যায়গায় ফেলবার জন্য গাছের ডগায় কাউকে দড়ি বাঁধতে পাঠাল না সে, অভ্যস্ত চোখে গাছটা কোথায় পড়বে মনে মনে হিসাব করে নিল মাত্র।

তারপর শুরু হল কুঠারের নাচ। প্রথম আঘাতেই কাছেই পামগাছের ওপর বাসা বাঁধছিল যে-পাখিরা, তারা উড়ে পালাল দলে দলে। লাল পিঁপড়ের দল কয়েদিদের আক্রমণ করল, নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াল তারা। কুঠারের বলাৎকারে দৈত্যাকার বৃক্ষ কেঁপে উঠল। বাকলের নিচে ইঁটের মত লাল রঙের পেশি দেখা দিল। কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। ঝকমকে ইস্পাত বাতাসে নীলাভ বৃত্ত রচনা করল, প্রান্তে তাদের রুপোর ঝলক। দোসুর মুখ থেকে ঘাম পিঠ বেয়ে নেমে তার কটিবাস ভিজিয়ে দিল। পশ্চিমে স্লেট রঙের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক সহ ঝড়ের পূর্বাভাস পরিবেশকে আরো থমথমে করে তুলেছিল। কোপ দেবার সময় দোসু হাঁফিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। একবার কুড়োলটা এমনি আটকে গেল যে দোসু দেহটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়েও সেটাকে টেনে তুলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মুক্ত করতে সাহায্যের দরকার হল।

'কুছ পরোয়া নেই,' দোসু বলল, 'এখুনি সাবাড় করছি!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে খাওয়ার জন্য অল্পক্ষণের জন্য গাছকাটা বন্ধ রাখতে রাজি হল। কয়েদিরা সর্দার সহ খাওয়া সেরে ফিরে এসে দেখে চারভাগের তিনভাগ কাটা হয়ে গেছে। কাঠের গুঁড়ো পরীক্ষা করে দেখে একজন অভিজ্ঞ লোক বলতে পারতেন যে ইরোকোটি প্রায় তিনশ' বছরের প্রাচীন।

কাঠুরের দেহসঞ্চালনের গতি প্রথমে ছিল সবল কিন্তু শান্ত, ক্রমে তা উদ্দাম হল। চোখ রক্তবর্ণ হল। গাছে-মানুষে সমানে সমানে যুদ্ধ। গাছের ভার-গুলি যতই হালকা হতে লাগল, দোসুর মাথায় ততই খুন চেপে গেল। এক নির্মম সংগ্রামে রত যেন সে। কারো সাহায্যের দরকার নেই তার, লাম্বা সাহেব যখন তাকে বিশ্রাম করতে বললেন, সে বিরক্ত হয়ে শুধু বলল, 'কাজ করতে দিন।' ঘন ঘন কোপ পড়তে লাগল গাছের ওপর।

কাঠুরের সংক্রামক আত্মবিশ্বাস আর পরাক্রমের হতবাক দর্শকরা তারিফ করতে

লাগল তার. দোস্থুর জয় এখন নিশ্চিত। চারণদলের গানের মত তারা দোস্থুর গুণগান গাইতে লাগল। বুকে হাত দিয়ে তাল ঠুকে তারা দোস্থুর গৌরব কীর্তন করল।

বিশাল মহীরুহ মাত্র ইঞ্চিকয়েক কাঠের বন্ধনে যখন আবদ্ধ, মাত্র কয়েক ঘা'তে ধরাশায়ী হবে মহাবৃক্ষ, আঘাত থামিয়ে ঘর্মাক্ত এবোনি কাঠসদৃশ পেশল দেহ নিয়ে দোস্থু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কাজ শেষ তোদের,' বিজেতার মত দোস্থু বলল কয়েদিদের।

কোসি আর কয়েদিদের একজন যেন খেলাচ্ছলে দোস্থুর বাকি কাজ সমাপ্ত করতে লাগল। রহস্যময় এক নিশ্চয়তায় কাঠুরে ভেবে নেয়, রাস্তার যেখানে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে তার উলটো দিকে গাছটা পড়বে। এ-ব্যাপারে যে কোনো ভয় নেই, সে দৃঢ় প্রত্যয়ে তা ঘোষণা করেছিল। তবু সাবধানের মার নেই বলে ম্যাসিয় লান্টা, আনাতোল এবং কয়েদিরা যারা গাছটির দুদিকে দাঁড়িয়েছিল, তারা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল।

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে দোস্থু বিজয়ীর দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল। কোনো রকম বিপদের সামান্য আশঙ্কাও তার মনে স্থান পায় নি। নিজের হিসেব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তার ছিল না, কয়েদিদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, তাদের উত্তেজনা, চোখে প্রশংসার দীপ্তি তার মনে এক ধরনের আত্মতুষ্টি এনে দিচ্ছিল। জনকয়েক দোকানী বাড়ি ফেরার পথে ইরোকোর দশা দেখে, 'ধর্মনাশার মরণ হোক' বলে দ্রুতপদে সরে গেল।

ইরোকোর মূলোচ্ছেদ হল শেষ পর্যন্ত। ঝড়ের মুখে নৌকার মাস্তুলের মত ডালপালা দুলতে শুরু করল। দৈত্যসম বৃক্ষের প্রতি অঙ্গে জাগল প্রবল কম্পন। একটা ভোঁতা আওয়াজে বোঝা গেল গাছ এখন সম্পূর্ণভাবে সম্বলচ্যুত। দোস্থু রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়েছিল গাছটির ঠিক বিপরীতে। কাণ্ডের পতন শুরু হয়েছে। ঘনসবুজ ছত্র অপ্রত্যাশিতভাবে ঝুঁকল রাস্তার দিকে। সমবেত মানুষ আতঙ্কে আড়ষ্ট। তাদের ভীত চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দোস্থু ঘুরে দাঁড়াল। উদ্যত বিপদ এড়াবার সময় পেল না সে। প্রতিপক্ষের প্রতারণায় হতবুদ্ধি হয়ে সে মরীয়া হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল, কিন্তু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার পঙ্গুদেহে যথেষ্ট বেগ জাগাতে পারল না। কোনদিকে গাছটা পড়বে তা অনুধাবন করতে পারল না সে, ভীষণ আঘাতে তার দেহ ভূমিতে সমতল হল। তার অমানুষিক আর্তনাদ ঢেকে গেল বৃক্ষপাতনের ঘোর নিনাদে। ঘূর্ণিবায়ুতে ছেঁড়া পাতা, শঙ্কাগ্রস্ত পতঙ্গ পাক খেল। আকস্মিক নীরবতা ঢেকে দিল চারদিক। সে-গভীর নৈঃশব্দ্যে তুকান পাখির দূরাগত ডাকও শোনা গেল পরিষ্কার, ডালপালার ভেতর থেকে দোস্থুর উঠে আসার অপেক্ষায় সবাই বজ্রাহত। যখন তারা নিশ্চিত হল যে সামান্য কাতরোক্তিও শোনা যাবে না সেখান থেকে, ভয়ে তাড়া-খাওয়া পিঁপড়ের মত সবাই একযোগে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল।

সারাদিনের থমথমে আবহাওয়া কেটে ঝড় ফেটে পড়ল তখনই।

বজ্রগর্জন আর বিদ্যুতের অন্ধ-করা ঝলক ভয়াবহ দৃশ্যের যথাযোগ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি করল যেন। বজ্রদেবতা হেভিয়োসো আগুনের থুতু ছিটিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করলেন। প্রবল বর্ষণ মাথায় করে কুড়ুল করাত নিয়ে লোকেরা দোসুর আকৃতি-ভ্রষ্ট দেহপিণ্ড উদ্ধারে এগিয়ে এল; বহু ডালপালা কাটতে হল বস্তুটির সন্নিকটে হতে। ইরোকোর প্রত্যাঘাতের আসল চেহারা আবিষ্কৃত হল তখনই। বিরাট হাতুড়ির মাথার মত দেখতে একটা ডালের গ্রন্থি সোজা দোসুর পিঠে আঘাত করেছে। পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরেছে, ইতিমধ্যে কালো হয়ে গেছে তার রঙ, যেন পিষ্ট পাতা শুষেছে সেই রক্ত। শ্বেতাভ মস্তিষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ চুল এবং চূর্ণ অস্থি মিশে দোসুর করোটি একটি অবর্ণনীয় বস্তুপিণ্ডে পরিণত। দোসুর দেহাবশেষের শেষকৃত্যের ভার নেবার দুঃসাহস কারো হল না, এমনকি কোসিরও নয়। অঝোরে কাঁদছিল সে। ডালপালা দিয়ে দেহ-পিণ্ড ঢেকে দিয়ে নির্বাক ভয়ে তাড়া-খাওয়া কয়েদির দল সরে গেল সেখান থেকে। ম্যাসিয় লাণ্টা হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলেন, কিছুই বললেন না তিনি, বোঝার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর।

রাতে ইরোকো উপাসকের দল সারি বেঁধে এল দেহাবশেষ নিয়ে যেতে। বাঁশের মাচায় তুলে মশালের আলোয় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সারা শহর ঘুরে বেড়াল তারা। শেষ শোভাযাত্রা দেখতে দোরে দোরে দাঁড়াল উৎসুক জনতা, দেহাবশেষ এক লহমায় দেখেই যাত্রার উপলক্ষ্য বুঝে নিল তারা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা শহর জেনে গেল ঘটনাটা।

মৃত্যুজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি বেজে চলল, ভবিষ্যতে এ-ধরনের অধর্মাচরণ যেন কেউ না করে—এ যেন তারই সতর্কবাণী। সবশেষে দোসুর দেহাবশেষ শেয়াল ও শকুনের মুখে ছুড়ে দেওয়া হল। ইরোকো পুরোহিতের বিধানে মৃত্যু এ-জাতীয় পাপের যথেষ্ট বেতন নয়।

কো য়া নি য়াং গা মু লি কি তা

সু যো গ

কোয়ানিয়াংগা মুলিকিতার জন্ম বর্তমান জাম্বিয়ায় ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। রাজধানী লুসাকাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে বেশ কিছুদিন হাইকোর্টে কেরানির কাজ করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন কিছুকাল। উচ্চশিক্ষার্থে একাধিকবার আমেরিকাতে যান। ক্যালিফোর্নিয়া ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মনোবিজ্ঞান, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনা করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে তিনিই ছিলেন স্বাধীন জাম্বিয়ার প্রথম দূত। পরে তিনি শিক্ষামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর গল্পটির কালগত পটভূমিকা ১৯৬৩, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছর আগে। স্থান লুসাকা।

জর্জ বান্দার খেপবার কারণ ছিল। ঘণ্টা কয়েক দেরি হয়ে গেল পৌঁছতে। একটা বিপুলাঙ্গী আফ্রিকান মহিলার ধাক্কা খেয়ে ও টার্মিনাসে বাস থেকে ছিটকে পড়েছে। মেয়েমানুষের ধাক্কায় বেসামাল হওয়া! মেজাজটা তার আরো খিঁচড়ে গেল।

আসলে শহর থেকে চিলাংগার শহরতলিতে আসবার জন্য তাকে ঠায় দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। সেখান থেকে তার মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পায়দল যেতে হয়েছে কালিংগালিংগার বেআইনী বস্তিতে। লুসাকার চারপাশে এ-ধরনের বস্তি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। প্রতি শনিবার তার এপথে যতায়ত বাঁধা। কাজেই এ-অভিজ্ঞতা তার কাছে নতুন নয়।

তবু এ-শনিবার তার হয়রানিটা আরো বেশি হয়েছে। তিনঘণ্টা বাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েও উঠতে পারবার কোনো উপায় করতে পারে নি। এত লোক, আর এত কম বাসের সংখ্যা! তিন ঘণ্টা দাঁড়াবার পর কয়েক মিনিটের জন্য একটু পেচ্ছাপ করতে গেছে মাত্র। ছেলেমেয়েদের জন্য যথারীতি আলাদা টয়লেট। সে-দুটোতেই আবার তিনটে করে ভাগ: 'ইউরোপীয়ান টাইপ', 'এশিয়ান টাইপ' আর 'আফ্রিকান টাইপ'।

হঠাৎ 'শালা এত ভাগাভাগি কিসের' বলে বুক ঠুকে ইউরোপীয়ান মার্কাটাতেই ঢুকে পড়ল। দু'টো রোদে পোড়া সাদাচামড়া হকচকিয়ে গিয়ে ওর দিকে তাকাল। এই কেলে কাফ্রিটার এত আস্পর্ধা! আফ্রিকান নেতাগুলো এদের

বারোটা বাজিয়েছে। কী দুঃসাহস, কী ঔদ্ধত্য! সাদাচামড়া দুটো ওকে প্রায় তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলল।

জর্জ এবার এশিয়ান মার্কাটাতে ঢুকল। গিজ্‌গিজ্‌ করছে লোক, নোংরা! বেরিয়ে এসে আফ্রিকানটাতেই ঢুকল। সেটার অবস্থাও তথৈবচ। ব্যবস্থা কিন্তু তিনটেতেই একই, সেই দুপোনি ফেলে ভেতরের দরজা খোলা। এ-ধরনের পেচ্ছাপখানা সে আগে দেখে নি।

কিন্তু যে-ই এর প্ল্যান তৈরি করুক না কেন অঙ্কে সে গাড্ডা খেয়েছে নিশ্চয়। অন্য দু'টোকে একটু বড় করবি তো, কটা সাদাচামড়া এখানে মুততে আসে? শালারা এখানেও গায়ের রঙের দেমাক দেখাবে। 'দুত্তোরি!' বলে সে কিছু দূরে আফ্রিকানদের জন্য নির্দিষ্ট পায়খানার দিকে এগিয়ে গেল। ঢুকেই বীভৎস দুর্গন্ধের ধাক্কায় তার প্রচণ্ড বমি পেল। জঘন্য নরক, অসহ্য অসামাজিক অবস্থা। দু'হাতে সবুজ মাছি তাড়াতে লাগল ক্রমাগত। উপায়ান্তর নেই বলেই আফ্রিকানরা এই অপমানজনক ব্যবস্থাকে মেনে নেয়। মেঝের ওপর দেখেশুনে শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে পা ফেলতে হয়। নাক বন্ধ করে রাখা ছাড়া গতি নেই। হঠাৎ বাড়িতে সদ্য-কেনা সাবানটার কথা মনে পড়ায় সে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল। লোকে বলে এক সাহেবের কুত্তা এখানে ঢুকে পড়েছিল বলে সাহেব নাকি গুলি করে মারতে বসেছিল: ওটাকে সে আর ছুঁতে তো পারেই নি, বাড়িতে ঢুকতেও দিতে পারে নি। জাত-যাওয়া কুকুরকে খতম করা ছাড়া উপায় ছিল না!

টার্মিনাসে ফিরে দেখে লাইনটা আরো লম্বা হয়েছে। আসলে এখন একটার যায়গায় দুটো লাইন হয়েছে। ইস্, একটা শেয়ার ট্যাক্সি নিতে পারত যদি! কিন্তু এখান থেকে কালিংগালিংগা, অত পয়সা কই! কাজেই চিলাংগার বাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই। আরো ঘণ্টাখানেক গেল, তবু তার সুযোগ এল না। এক ঘণ্টা পর কোনোরকমে একটা বাসের কাছে পেঁছিতে পারল। পাগলের মত লোকগুলি গুঁতোগুঁতি করছে, কনুই দিয়ে এ ওকে ঠেলছে। পিঠে বাচ্চা-বাঁধা মায়েরা ওরই মধ্যে যতটা পারা যায় সাবধান হবার চেষ্টা করছে বাচ্চারা যাতে চাপ খেয়ে না মরে।

এক বিশাল জাঁদরেল মহিলা ভিড় ঠেলে অনায়াসে পুরুষযাত্রীদেরও এদিক ওদিক ছিটকে ফেলে জর্জকে এক ধাক্কা দিয়ে ফুটবোর্ড থেকে ফেলে দিয়ে যায়গা করে নিল। ওর প্যান্টটা ময়লা হয়ে গেল, মাথার টুপি কোথায় খসে পড়ল, সেটা আর পাওয়াই গেল না।

এ-অবস্থায় পকেটমারদের পোয়াবারো! সেদিন কোনো এক গাড়ি-ড্রাইভারের মানিব্যাগ খোয়া গিয়েছিল এই বাসে, ম্যাজিস্ট্রেট তার আগের দিনই তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করেছিল। বেচারার পঞ্চাশ পাউন্ড জলে গেল!

কোনোমতে দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে জর্জ পরের বাসটাতে উঠতে পারল। ছেঁড়া কাগজ, রুটির টুকরো আর আইসক্রিমের আধখাওয়া কোনে মেঝেটা ভরতি।

কোথাও কোথাও জল, ফানতা কোকাকোলা পড়েছে। দু-একটা বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদছে। মায়েদের মধ্যে কয়েকজনের পোশাক বেশ দুরস্ত, কিন্তু পিঠের বাচ্চাটা নোংরা দাগধরা কাপড়ে বাঁধা। বাসে লোকের গাদাগাদি। বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে, তবু ভেতরে অসহ্য গরম। ঘামের গন্ধে অবস্থা আরো অসহ্য।

শেষ পর্যন্ত বাসটা চিলাংগার শেষ স্টপেজে থামতেই বান্দা নেমে পড়ল। জামাকাপড়ের দশা শোচনীয়। একটা গাড়ি ওদিকে যাচ্ছিল, হাত দেখাতেই গাড়িটা থামল, ড্রাইভার ওকে তুলে নিল, সেও কালিংগালিংগার দিকেই যাচ্ছিল। গাড়িতে বসে জর্জ গোটা দিনটার কথা ভাবছিল। তারপর সে জ্যানেটের কথা ভাবতে শুরু করল। এবার তার চার নম্বর বাচ্চা জন্ম নেবে। জ্যানেট জাম্বিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, অবৈধ উপায়ে যদিও। এভাবে সে হয়তো না বুঝেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। অবশ্য তার মত পুরুষরাও যে এর জন্য দায়ী একথা ভেবে সে নিজেকেও অপরাধী করল মনে মনে। এটা কি পুরুষের দুর্বলতা না সামাজিক অবস্থার ফল সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

'আপনাকে খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে,' ড্রাইভারটি বলল।

'না, তেমন কিছু নয়…'

'শ্যান্টি টাউনের দিকে যেতে গিয়ে সবাইকেই এরকম চিন্তামগ্ন হতে দেখি। যা জঘন্য যায়গা সব! মানুষের বাসের যোগ্য নাকি! নেহাত কজন আত্মীয় থাকে বলেই যাওয়া।'

'আপনাকে তো দেখে বেশ অবস্থাপন্নই মনে হচ্ছে, আপনি ওদের ওখানে থাকতে দেন কেন?'

'এ-শহরের অবস্থা তো জানেনই। টাকাটা তেমন বড় কথা নয়। বছরের পর বছর ধরে ভাল পাড়ায় বাড়ি খুঁজেছি, পাই নি। আমি নিজে এক বন্ধুর বাসায় থাকি।'

'বুঝতে পারছি। সবাই গ্রাম ছেড়ে শহরে ছুটে আসছে। চুরি ডাকাতি কি-রকম বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে এসব শ্যান্টি টাউনে!'

'সবকটা শ্যান্টি টাউন ঘুরে দেখেছি—মানডেভু, চিনিকা, কানিয়ামা, চিবোলিয়া। সব জায়গার একই হাল।'

'সত্যিই। ঐরকম খোঁয়াড়ে থাকলে মানুষ আপনিই চোরচোট্টা হয়ে যায়।'

'আর কী হবে তাছাড়া। ভাঙা বাক্স, লরিতে পর্যন্ত মানুষ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এখানেও দেখছেন তো, প্যাকিং বাক্স, অ্যাসবেস্টসের টুকরো, কাঠের তক্তা—যেখানে যা পেয়েছে, তাই দিয়ে কীভাবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে কোনোমতে।'

'আর পায়খানা? আজ শহরে ওরকম একটাতে ঢুকেছিলাম। অবশ্য অনেক যায়গায় তো এদের তাও নেই। সেখানে তারা কী করে কাজ সারে তা তো কহতব্য নয়!'

'অথচ দেখুন কাছেই সাহেবদের নতুন পাড়া—ঝকঝকে নতুন ধরনের বাড়ি, রেডিও, গাড়ি, ফ্রিজ।'

'মাথার ওপর দিয়ে প্লেনগুলো উড়ে ঐখানে এয়ারপোর্টে যখন নামে শব্দে এদের ডেরাগুলো উড়ে যাবার যোগাড় হয়।'

'মশায়, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আপনার নামটি যদি···?'

'জর্জ বান্দা। আপনার?'

'এডোয়ার্ড কাটুয়েলে।'

'লিফটের জন্য ধন্যবাদ, মিঃ কাটুয়েলে।'

'ওয়েলকাম। আমিও কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। আচ্ছা চলি।' গাড়িটা এগিয়ে গেল।

দেরি হবার কারণ বলবার আগেই জ্যানেট চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় ছিলে এত-ক্ষণ শুনি?'

'শহরে দেরি হয়ে গেল।'

'দেরি হয়ে গেল মানে?'

'জানই তো বাসের কী অবস্থা। পাঁচ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, তবে জায়গা পেয়েছি। বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আমাকে বোকা পেয়েছ?'

'আমি তো তা বলি নি।

'তবে আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করছ কেন?'

'ঠকাতে?'

'নিশ্চয়ই। আমি জানি তুমি সারা বিকেলটা তোমার মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়েছ।'

'সত্যি বলছি, বাস টার্মিনাসেই সমস্ত সময়টা গেছে।' এক ধুমসি আমাকে ধাক্কা মেরে বাস থেকে ফেলে দিয়েছিল। দেখছ না, জামাকাপড়ের কী হাল হয়েছে?'

'মাথাটাকে ফাটিয়ে দিলেই পারত!'

জর্জ বুঝতে পারল, ওর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। এ-অবস্থায় তা বোধ হয় সকলেরই হবার কথা। সবে চার মাস। আর ছ'মাস বাদে ওর ষষ্ঠ অবৈধ সন্তানটি আলোর মুখ দেখবে।

'কাঁচ খোকা, তোমার এখন ফুর্তি মারবার সময়?'

জর্জ অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইল। টুপিটার কথা আর বলার দরকার নেই, সে মনে মনে ঠিক করল। জ্যানেটের তিন বাচ্চা খেলতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এল। ছ' বছরের মেয়ে বেরিটার বাপ কে, জ্যানেটও জানে না। একসময় সে বলত চিনিকার এক দোকানদার মাপাপার কথা। মাপাপা অস্বীকার করলে বলেছিল মানডেভুর সামেন্দু ওর জন্মদাতা, কিন্তু সে-ও দায়িত্ব স্বীকার করে নি।

দ্বিতীয়টি ছেলে, চিপিলি, বয়স চার বছর। ওর বাপ তহবিল তছরুপের

দায়ে জেল খাটছে। বেরিটার পেছন পেছন এসে সে ঢুকল। তিন নম্বর, তিন বছরের ছেলে নগুইয়ানা এল সবশেষে। সবকটা মেঝের ওপর ঝপ্ করে বসে পড়ল। ছ'মাস বাদে জর্জ বান্দার ঔরসের ফসল এদের দল ভারি করবে।

অসহ্য কষ্টে কালিংগালিংগায় জ্যানেট টিলিপোর দিন কাটে। আবর্জনার স্তূপের মধ্যে তার বসতি। এখানকার অন্য অনেক মেয়ের মত বাধ্য হয়ে তাকে বেশ্যাগিরি করে খেতে হচ্ছে।

জ্যানেট আর জর্জ চুপচাপ বসে। একটু আধটু যা কথা হয়েছে তাতে হুল ফোটাবার চেষ্টাই মুখ্য ছিল। পেটে বিয়ার না পড়লে জর্জের মত শান্তশিষ্ট লোকের মুখে কথা ফোটে না।

দরজায় টোকা পড়ল। জ্যানেট দরজা খুলতে প্রিসিলা পেনসুলুর মুখটা দেখা গেল।

'হ্যাল্লো বয়' বলতে জ্যানেটও তাকে 'বয়' বলে ডেকে ঘরে ঢুকতে বলল। এখানকার এসব মেয়েরা পরস্পরকে 'বয়' ডাকে আর অদ্ভুত এক ইংরেজিতে কথাবার্তা বলে।

'তোর জন্যে আসলি চীজ আছে, বয়!' প্রিসিলা বলল।

'আসলি চীজ' মানে ব্র্যান্ডি, ভদকা, ড্রাই জিন। কাসুল বিয়ারকেও ওরা 'জল' বলে থাকে। একসময় প্রিসিলা প্রচুর পয়সা করেছিল স্কোকিয়ান চোলাই করে, ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দিতে পারে ঐ দিশী মাল।

'কোথায়, দে?' জ্যানেট হৈ হৈ করে উঠল। 'আরে এখানে কই, আমার ঘরে আছে,' প্রিসিলা বলল। ওর চোখদুটো ঘোলাটে, গায়ে মদের গন্ধ। আসলে শহরের এক সাদাচামড়া মদের স্টোর-মালিকের দালালের কাজ করে ও। বেশ ভাল কমিশন পায় এই চোরাই কারবারে।

'জর্জকে তো তুই চিনিস, চিনিস না?' জ্যানেট বলল।

'চিনি না মানে? চিনিকায় ওর বাসাটাও জানি। হ্যালো জর্জ, মেজাজ শরীফ নয় মনে হচ্ছে আজ?'

'কিছু হয় নি, হবার আছেই বা কী,' বহুক্ষণ পরে জর্জ মুখ খুলল।

'সবাই কিন্তু তোমার বাস থেকে পড়ে যাবার গপ্পো করছে,' বলে প্রিসিলা হাসল।

জ্যানেটের দিকে তাকিয়ে জর্জ বলল, 'তাহলে কী হবে, অনেকেরও ধারণা ওটা আমার বানানো গপ্পো।

'আরে ছেড়ে দাও ওসব কথা, চলো আমার বাসায়। সবাই বলে না যে শনি-বারের রাত ফুর্তির রাত?'

বাচ্চাগুলো ধুলোয় গড়াচ্ছে, পেটে কিছু পড়ে নি। ভ্রূক্ষেপ না করে জ্যানেট আর জর্জ বেরিয়ে গেল।

প্রিসিলার ডেরা বেশি দূরে নয়। 'জর্জ, ঐ চেয়ারটায় বোসো।' 'ধন্যবাদ' বলে সে ভাঙাচোরা চেয়ারটাতে সাবধানে বসল।

'এ বয় !' প্রিসিলা জ্যানেটকে বলল, 'ম্যানেজ করে কোথাও বোস, এ তো তোরই বাড়ি, বয় !' একটা টুলের ওপর বসে প্রিসিলা বলল, 'আসলে কি জানিস, আমার বোয়ানা আমাকে একটা বড় বাড়ি বানিয়ে দেবে বলেছে ।' একটু গর্বের সঙ্গে হাসল সে । ওর এখনকার নাগর সেই মদের চোরাকারবারি সাদাচামড়া লোকটা ।'

'কোথায় রে বয় ?' জ্যানেট জিজ্ঞাসা করল ।

'এখানেই, আবার কোথায়,' প্রিসিলা মদের ঝোঁকে বলল ।

'কী বরাত রে তোর, বয় !' টিলিপো ঈর্ষামেশানো গলায় বলল ।

'নতুন খাট-পালঙ্ও কিনে দেবে বলেছে, পরের বার এলে ভাল নতুন চেয়ারে বসতে পাবি ।'

নতুন বোতল খুলে ওদের গেলাসে জিন ঢালতে ঢালতে বলল, 'বয়, কাল এক ব্যাটাকে খেদিয়েছি, বুঝলি । ঐ যে একদল ছোকরা আফ্রিকান আসে না, মুখ ভরতি হাসি, কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ, তাদেরই একটা ।'

'তারপর কী হল ?' জর্জ জিজ্ঞাসা করল । তার ভেতরটা চাঙ্গা হতে শুরু করেছে ।

'এসে বললে "আমি তোকে ভালবাসি" । কত দিবি জিজ্ঞেস করতেই ন্যাকার মত হাসতে লাগল । আমি বললাম, "তোর হাসি দিয়ে আমার বালবাচ্চার পেট ভরবে, ছুঁচো" ?'

'বেশ বলেছিস, সাফ কথা,' জ্যানেটের জিবে আড় ।

জর্জ নিজের জন্য ব্রান্ডি আর জ্যানেটের জন্য ড্রাই জিন অর্ডার দিল । মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার, দশ পাউন্ড ঐতে উবে গেল ।

'আরো লোক আসবে আজ, শনিবারের বাজার, মাল কাটে ভাল ।'

দুটো লোক টলতে টলতে ঘরে ঢুকল । প্রথমটা ঢ্যাঙা, ভুঁড়ো পেট । চোখ দেখলেই বোঝা যায় জাত মাতাল । 'ফিলিপ ব্রাউন' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ধপ্ করে একটা খালি সাবানের বাক্সর ওপর বসে পড়ল । অন্যটার নাম বলল ডেভিড মাটেপেটা—বেঁটে, থ্যাবড়া নাক । পায়ে বহুকালের পুরনো মিলিটারি বুট ।

'প্রিসিলা, আমাকে একটা ভদকা,' ফিলিপ ব্রাউন বলল । পদবী তো সাহেবি, গায়ের রঙ এবোনি কাঠের মত কালো । কোটের পকেট থেকে একটা এক পাউন্ডের নোট বার করে সে বলল, 'দেখি, দে জলদি ।' বোঝা গেল প্রিসিলার পুরনো খদ্দেরদের একজন ।

'আমাকে একটু ব্রান্ডি,' মাটেপেটাও এক পাউন্ডের একটা নোট বার করে দিয়ে বলল ।

'শালা গাঁয়ে আর ফিরব না ভাবছি মাইরি,' ব্রাউন হঠাৎ বলে উঠল । জর্জ জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

'আরে দূরে, "আমার সবকিছু তোমার, তোমার সবকিছু আমার"; এদিকে আর

চলে না।'

'কেন মন্দটা কী, সোশ্যালিজম না কমিউনিজম তো এই বলে,' জর্জ মাস্টারি ভঙ্গিতে বলল। ব্রাউন মাথার খুশকি চুলকাচ্ছিল, ওসব কেতাবি কথা ওর মাথায় ঢুকল না।

'আরে ওসব বুজরুকি, হাভাতের ফিকিরবাজি। "তোমার সবকিছু আমার" বলে পরের কাছে জিনিস বাগাও, আর "আমার সবকিছু তোমার"—এর বেলা লবডঙ্কা! দেবে কোত্থেকে, ফুটো মাদারি,' ব্রাউন বলল।

'যা বলেচো, দাদা,' মাটেপেটা জড়ানো গলায় তারিফ করল।

'দরকারে একে অন্যকে দেখবে এটাই হল মূল কথা, শুধু পয়সাকড়ির ব্যাপারে নয়,' নাইট স্কুলের ছাত্র জর্জ বলল।

'আমার নাম ফিলিপ ব্রাউন হল কেন জানো,' কথা ঘোরাবার জন্য ব্রাউন বলল।

মোমবাতির আলোতে খাটের তলা থেকে বোতল বার করতে করতে প্রিসিলা বলল, 'বলো, বলো কেন।'

'আমার আফ্রিকান নামটা বুঝলি বেজায় বদখৎ—মোলোকো মুনিয়োটো। বোয়ানা বলল, বড্ড লম্বা! বেচারা উচ্চারণই করতে পারত না। আ্যা, হাঃ হাঃ…'

'চেষ্টা করলে সব নামই উচ্চারণ করা যায়। আপনার বোয়ানা আসলে কুঁড়ের ডিম। তাছাড়া নামে কী এসে যায়?' জর্জ বলল।

শেক্সপীয়রের নাম মাতালদুটো জন্মে শোনে নি।

'না বে, সাহেবদের মাথায় কত বুদ্ধি! আমাদের তো গোবর পোরা,' মাটেপেটা বলল। ওর কাছে সব সাদাচামড়াই প্রতিভা। কত কী পারে তারা, এরোপ্লেন বানায়, রেডিও বানায়, গাড়ি বানায়! এসবের পেছনে কত বছরের অভিজ্ঞতা, কত শ্রম, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেসব ওর মাথায় ঢুকবে না।

'আমার বোয়ানা কী বলে জানিস? বলে তোরা আফ্রিকানরা কখনই নিজেদের দেশ চালাতে পারবি না, দেখ না তোদের জাতভাইরা স্বাধীন দেশ-গুলোর কী হাল করেছে?' ব্রাউন বলল। বিয়ার পার্টিতে এ-জাতীয় কথা জর্জ অনেকের মুখে শুনেছে।

'বাঃ, বাঃ, কালোসাহেব, খুব শেখানো বুলি আওড়ানো হচ্ছে? সাদাদের গোলামি করে করে নিজের মানও খুইয়ে ফেলিস তোরা!' হঠাৎ খেপে গিয়ে জর্জ বলল। ব্রাউন কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে বলল, 'বোয়ানাকে না জিজ্ঞেস করে আমি কিছু কিনি না জানিস বে!'

জর্জ তার নাইট স্কুলের শিক্ষা কাজে লাগালো। বলল, 'স্বাধীনতার জন্য আফ্রিকানরা লড়ছে, আর তোরা শালা বোয়ানাদের পা-চাটা কুত্তা! চোখ মেলে দুনিয়াকে দেখিসও না ভাল করে। সাদাদের মার খাবি পড়ে পড়ে, তবু বলবি ওদের সব ভাল, আর আমাদের সব খারাপ, বেহায়া কোথাকার!'

'চুপ যা শালা, মাল খাচ্ছিস মাল খা! অত রোয়াব কিসের!' এবার ব্রাউনও

ফুঁসে উঠল।

জর্জ ভাবল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এরা পরাধীনতার মানসিক শিকার—একেবারে চাকরবাকর হয়ে গেছে। এর চেয়ে শরীরে মার খাওয়াও অনেক ভাল। নিজেকে এদের থেকে আলাদা ভেবে সে আত্মপ্রসন্ন হল।

মাঝখানে প্রিসিলার ঘরে খদ্দেরের গাদাগাদি। প্রায় জনা বারো লোক। অচেনা লোকও জুটেছে কিছু। ভেতরটা গরম। সবাই গিলছে আর চেঁচাচ্ছে। এখন তারা বিয়ার খাচ্ছে, কিন্তু হার্ড লিকার ইতিমধ্যে মাথায় চড়েছে। জ্যানেট আর জর্জ পুরো মাতাল। ব্রাউন আর মাটেপেটা বুঁদ হয়ে গেছে, থেকে থেকে মুখখিস্তি করছে।

হঠাৎ পাঁচজনের একটা দল এসে হাজির, ব্রাউন আর মাটেপেটার দল। নাম দিয়েছে 'ফিলিপ ব্রাউন্‌স বয়েজ'। চিৎকার করে তারা দলের বাইরের লোকদের শাসাতে শুরু করল। কয়েক মিনিট পরে পাল্টা দল 'কংকারার্স' উপস্থিত। জর্জের ভাই গ্রীনওয়েল বান্দা এদের পাণ্ডা। বেশ কয়েক মাস ধরে দু'দলে রেষারেষি হাতাহাতি চলছে চিনিকা, কানিয়ামা, মানডেভুর বস্তিতে। এর আবার অন্যদিক আছে। জর্জরা বেম্বা উপজাতির লোক, ব্রাউনরা নিয়াঞ্জা। ট্রাইবাল দাঙ্গার চেহারা নিতে পারে মারামারি। প্রিসিলার নেশা কেটে গেল। বিপদ বুঝে সে মাতালগুলোকে ধরে ধরে বাইরে বার করে দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দিল।

'আয় দেখি দাঁত-পড়া বেবুনের দল,' ব্রাউনের দলের একজন চেঁচিয়ে উঠল।

'আয় শালা কুত্তার বাচ্চা,' কংকারার্সদের একজন জবাব দিল। ওপরে তখন পরিষ্কার আকাশে চাঁদের আলো ঝলমল করছে। মাতাল গলায় ব্রাউন চেঁচিয়ে উঠল, 'বয়েজ, ঝাঁপিয়ে পড়।' 'জান নিয়ে নে কুত্তার বাচ্চাদের,' গ্রীনওয়েলের পাল্টা চিৎকার শোনা গেল। ফিলিপ ব্রাউনের প্রচণ্ড এক ঘুষির আঘাতে গ্রীনওয়েল ধরাশায়ী হল। ওদিকে কংকারার্সের একজনের হাতুড়ির ঘায় ব্রাউন বয়দের একজনের মাথার খুলি হাঁ হয়ে গেল। ভাইয়ের জীবনের বদলা নিতে মরীয়া জর্জ ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে ফিলিপ ব্রাউনকে বার করে নিয়ে এল। ব্রান্ডির বোতলের এক ঘায়ে ব্রাউনের প্রাণহীন শরীরটা মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল। দলের সর্দারের দশা দেখে চেলারা একযোগে জর্জ বান্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আদিম জন্তুরা যেন পরস্পরকে ছিঁড়ে খাবেই!

গর্ত-ভরতি রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সটার ব্রেকডাউন হয়েছিল। যখন সেটা এসে পৌঁছাল তখন জর্জের জ্ঞান নেই। আরো সাতটি মৃতদেহ প্রিসিলার ঘরের সামনে পড়ে আছে।

জ্যানেটের মনে পড়ল যে দিন কয়েক আগেই জর্জ বলেছিল, 'বাচ্চাটার জন্মের আগেই তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। এখানে ইস্কুল নেই, খেতে পাবে না; ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াবে, ভিখিরি আর চোরের দলে মিশবে।'

হাসপাতালে একবার মাত্র জ্ঞান ফিরেছিল জর্জের। 'বাচ্চাটাকে দেখো,' বলে তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। কে যেন হাত দিয়ে তার চোখের পাতা বন্ধ করে

দিল ।

মর্গে ফিলিপের পকেটে বিলেতে তার বোয়ানাকে লেখা একটা পোস্ট কার্ড পাওয়া যায় । লিখেছে, সে তার ঘরে ক্রিস্টমাস ট্রি সাজিয়েছে । দ. পাউন্ড খরচ করে মেয়ের জন্য নতুন পোশাক বানাবে না সেটা ব্যাংকে রাখবে সে-বিষয়ে উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছে ।

কালিংগালিংগার বাসিন্দারা 'ও জিও, জিও !' বলে খুব কান্নাকাটি করেছে । জ্যানেট টিলিপোও ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছে, 'জিও, তোমাকে কোনোদিন ভুলব না, জিও !'

কিন্তু মানুষ ভোলে, সেটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি !

তাবান লো লিয়ং

লেক্সিকোগ্রাফিসাইড

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উগান্ডায় জন্ম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়াতে আয়োজিত রাইটার্স ওয়র্কশপে কাজ করে তিনি আফ্রিকানদের মধ্যে প্রথম মাস্টার অফ ফাইন আর্টস ডিগ্রি পান। কেনিয়ার নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে শিক্ষকতা করেন। নাইজেরিয়ার লেখক আমোস টুটুওলার মত তিনি ইংরেজী ভাষাকে আফ্রিকান ভাষার আদলে বিশেষ চেহারা দিতে সচেষ্ট। সমাজচেতনা ও পরীক্ষামূলকতার চমৎকার যৌগিক ফল তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। কবি হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর বর্তমান গল্পে সাম্প্রতিক উগান্ডার শ্বাসরোধকারী রাজনৈতিক আবহাওয়া ধরা পড়েছে।

নিচে দু'টি চিরকুট পাওয়া গেছে মৃতের বিছানার পাশে। ওর সংক্ষিপ্ত জীবনী : সাত বছর বয়সে স্কুল পালায়, তাতে সময় নষ্ট হয় বলে। পরের তিন মাস তার লেখা প্রবন্ধ 'দ্য লাইট'-এর মত পত্রিকায়ও ছাপা হয় এবং প্রাপ্য প্রশংসা লাভ করে। আপনাদের নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের 'দ্য লাইট' বিলেতের 'দ্য টাইমস্'-এর সমমূল্য। কোনো অজ্ঞাত কারণে সে লেখা বন্ধ করে এবং এরপর বেশ কিছুদিন যাবত তার কোনো হদিস মেলে নি। এর পরের সংবাদটি আমার কাছ থেকে পাওয়া, কারণ আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। আমায় ও বলেছিল যে অনেক ছোটগল্প লিখেছে সে, গড়ে দিনে চারটে করে। ছাপা হয় নি কেন? সম্পাদকদের সাহস হয় নি বলে। সেসব গল্প ছাপা হল না বলে সম্পাদকদের মনে মনে আচ্ছা করে শাপশাপান্ত করলাম। ব্যাটারা কেবল বিক্রিবাজ, সরকারের ভয়ে এতই জড়সড় যে কখনো অসাধারণ বা অসাধারণ করে লেখা জিনিস ছাপাবে না।

ও অবশ্য বলেছিল যে ও খুব ব্যস্ত। আমাদের দ্বীপের শাসক হবার বাসনা ছিল ওর—পাকা একনায়ক হবার। তা সম্ভব হলে ও নিজে দাঁড়িয়ে জেড অভিধান রচনার তদারকি করবে ঠিক করেছিল। জেড আমাদের দ্বীপের একমাত্র ভাষা। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের দ্বীপের এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অধিবাসীর প্রায় সকলেই জেড-ভাষী। এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ আছে। আমাদের সঙ্গে আপনাদের দেশের অধিবাসীর কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে, কেন না বাণিজ্যিক বা

অন্য কোনো সূত্রেই বিদেশীদের আমরা আকৃষ্ট করি না। এ-ব্যাপারে আমাদের গর্ব আছে, আমাদের দ্বীপবাসীদের মধ্যে কেউ বাইরে যাবে না। পদাধিকার পেলে সে এই ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ করবে ভেবেছিল, মানে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারটা আর কি! ও, ভুলে যাবার আগে এখানেই অভিধানটির কথা বলে নিই। অন্যান্য অভিধান থেকে এটা আলাদা ধরনের হবার কথা (বলার সময় ও শুধু ক্রিয়ার বর্তমান কাল ব্যবহার করত)। ঠিক ছিল, ওটাই হবে আমাদের একমাত্র অভিধান। প্রত্যেককে আমাদের নববর্ষে, মানে মে মাসে একটা করে কপি দেওয়া হবে সাব্যস্ত হয়েছিল। ঐ অভিধান-বহির্ভূত শব্দ বা ঘোৎকার ব্যবহারের ক্ষমতা কারো থাকবে না স্থির হয়েছিল, অপরাধের শাস্তি হবে মৃত্যু। অপরাধী তল্লাশি করা খুব কঠিন হত না। প্রতি শনিবার দ্বীপবাসীরা বাজারে রেশন আনতে যায়। বাজারে যন্ত্র বসানো আছে, তা মনের চিন্তার পাঠও নিতে পারে, প্রত্যেকের মগজের নতুন শব্দ বা নতুন ভাবনা ধরে ফেলতে পারে ঐ যন্ত্র। প্রতি বছরের শেষেই অভিধানের ব্যবহৃত সংস্করণ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন, বদলে তাদের নতুন সংস্করণ দেওয়া হবে ঠিক ছিল। কথা ছিল, প্রতি বছরই তিনশ' করে শব্দ বাদ যাবে।

প্রথম নোট —

রাত এগারটা : স্পোর্টরুমে গেছিলাম আজ। যোদ্ধাদের দেখলাম—মুষ্টি-যোদ্ধাদের। ভাল লাগল না।

ভোর চারটে : বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। কী দুর্ভোগ! প্রথমে গাড়ি চালিয়ে চলো খেলাঘরে, তারপর ঢোকো ভেতরে। তারপর যাও ড্রেসিং রুমে (লোকে তো সেখানে পোশাক খোলে, ড্রেসিং রুম বলে কেন জানি না!)। যাক গে, এই মান্ধাতা আমলের সরকারের আমলে এ-দুর্ভোগ পোয়াতেই হবে।

দ্বিতীয় নোট —

রাত দশটা : সমুদ্রতীরে গিয়েছিলাম স্নান করতে। গাদা গাদা মেয়ে মন্দ উদোম গা দেখাচ্ছে জলকে, সূর্যকে, বাতাসকে। আকারে রকমফের আছে, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা। শরীর যদি খোয়া যায়, ফিরিয়ে পেলেও এরা সনাক্ত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

তৃতীয় নোট —

রাত তিনটে : 'আমার মত' লিখে ক্লান্ত। একটু হাঁটতে গেলাম। একটা ঘরে ঢুকে পড়ি। গিজ্‌গিজ্‌ করছে মানুষ, বাজনা বাজছে। এক ভদ্রমহিলা মঞ্চে এলেন। ভেবেছিলাম আমাদের সমাজে 'ভদ্রমহিলা' আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এই তো সামনেই রয়েছে একজন। মাথায় একটা ছাতাও রয়েছে। বেশ ছন্দে ছন্দে দোদুল হয়ে হাঁটছেন। বাজনা শোনা যাচ্ছে। ছাতাটা খসল, হাঁটছেন

তিনি, টুপি খসল এবার। তবু হাঁটা চলল, বাজনা শোনা যাচ্ছে। দস্তানা খুলেলেন। আমার কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি তাঁর কাজ করেই চলেছেন। কৌতূহলী চোখের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নেই। এবার অঙ্গের পোশাকও খসে পড়ল। চুল খুলে পড়ল পিঠের ওপর। সামনের বব-করা চুল স্তনযুগলকে ঢেকে দিচ্ছিল, বক্ষবন্ধনী ছিল, চুলের আড়ালের প্রয়োজন ছিল না। অন্তর্বাস পরা ছিল। নাচতে শুরু করলেন তিনি উন্মত্তের মত (ক্রমশ)।

চতুর্থ নোট —

রাত সাড়ে তিনটে : ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিবরণ ঠিকমত লিখতে পারছি না, সময়ের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। একটা কথা ভাল মনে আছে—বাড়িটা থেকে আমাকে ঠিক সাড়ে চারটায় বার করে দেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চম নোট —

ভোর সাড়ে চারটে : উৎখাত হয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। অর্ধেকটা পথ এসেছি, চারটে মুখোশ-পরা মানুষ আমাকে পাকড়াও করেছে। বলল, পরনের কাপড় নেই, টাকাকড়ি নেই, লেখার সরঞ্জাম নেই, এবং একটা লোককে পুরো দু দিনের জন্য নিঃস্ব করবার আনন্দও পায় নি কখনো। যদি দয়া করে ওদের কোটটা খুলে দিই, সঙ্গে চশমা (কেসসহ, যদি থাকে), ঘড়ি, চাবিকাঠি, ফিতেসহ জুতোজোড়া, মোজা (ফুটো আর গন্ধ থাকলে তাদের পক্ষে তা ভালই), প্যান্ট—বোতাম ও বোতামঘর সমেত, জিপটার জন্যও কৌশিশ করতে তারা রাজি; এবং একটা বেল্ট যদি থাকে সেটাও তাদের বিশেষ আগ্রহের বস্তু, শার্ট, টাই, টাইপিন, ভেস্ট এবং অন্তর্বাস। আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারি নি।

ষষ্ঠ নোট —

সকাল পাঁচটা : রাতে লম্বা স্বপ্ন দেখেছি। যেন একটা ক্লাসঘরে আছি—আমি অধ্যাপক (আমার বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল!)। ছাত্রদের মধ্যে থেকেই একদল গুন্ডা বক্তৃতায় বাধা দিল। একদল গুন্ডা আমারই ক্লাসে ঢুকে আমাকে খাতক বলবার স্পর্ধা রাখে? পলকের মধ্যেই ধারশোধ হিসেবে আমার শেষ সুতো-গাছিও নিয়ে নিল, সব সুতো, সিনথেটিক মালসমেত; একটা কাঠকুটো, ঘাসের গুচ্ছও বাদ রাখল না, সবই নাকি ওদের কাছে আমার ধার ছিল, ওরা বলল। এরপর আমার চামড়ায় ওরা দাঁত বসাতে শুরু করল। তিল তিল করে, পায়ের আঙুল আর হাতের আঙুল থেকে শুরু করে। আমি নিশ্চিতভাবে অবধারিত ভাবে ভার লাঘব করতে শুরু করলাম। সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছিল দ্রুত, ওরা দলে ভারি ছিল। আমার হৃৎপিন্ড আক্রমণ করবার আগে তারা একটু থামল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে। আমার হতবুদ্ধি ছাত্রদের দৃষ্টি আমার হৃৎপিন্ডের দিকে আকৃষ্ট করবার সাধারণ জ্ঞানটা তাদের ছিল। বলল, 'এই অঙ্গটি হয়তো

আপনাকে বাঁচিয়ে দিতে পারত। কিন্তু…' ছাত্রদের চিৎকারে সেই অমোঘ বাক্য অসমাপ্ত রইল। নতুন উদ্যমে ওরা আবার কাজ শুরু করল; থাবা, দাঁত আর ফুলে-ওঠা কণ্ঠনালি দিয়ে। এখানে তাদের সময় লাগল একটু বেশি। তারপর ফুসফুস, লিভার, গলা আর ঘাড় সাবাড় করতে বেশি বেগ পেতে হল না। আমার মাথায় যখন পেঁছাল, আমার জঙ্গুলে চুলের মালিকদের পাওনা আদায় করে কেটে পড়বার হুকুম দেওয়া হল। সে-কাজ সারা হলে, তারা আমার চোখের পাতা, ভুরু, গোঁফ ও দাড়ি (আমি একজন পরিবর্তনক্ষম চিন্তাশীল, এটা আপনাদের জানা উচিত) আর মুখের রোম যা ছিল তা নেওয়া হল। মাথার চামড়া ছোলা হল (কান ও নাকসহ), নিচের চোয়াল খুলে নেওয়া হল, জিভ, দাঁত ও টাকরা সহ। দুটি প্রাণী (মনে হয় কর্তাগিন্নি) একযোগে আমার অক্ষি-গোলকদুটি শুষে নিল। এরপর খুলিটা খেয়ে নিল এবং সবশেষে কেঁচোদের আমার মগজটি সাবাড় করবার সুযোগ দেওয়া হল।

উপসংহার: একজন লোকের কথা আমার মনে আছে, পাগলের ভান করে সে আয়কর ফাঁকি দিত। একটা গান গাইত সে, তারপর ড্রাম বাজাতে শুরু করত, শেষে নাচ জুড়ে দিত। শেষমেষ একযোগে নেচে গেয়ে বাদ্য বাজিয়ে একশা হত লোকটা।

সেমবেন উসমান

বিবেক

জন্ম ১৯২৩ সালে। সূত্রধর, মিস্ত্রির কাজ করে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনকালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে। মার্সেই বন্দরে ডক শ্রমিকের কাজ করে বামপন্থী রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। ফ্রান্সে থাকাকালীন চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী হন, পরে রাশিয়াতে চলচ্চিত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। প্রথম ওলোফ ভাষার মাসিক পত্রিকা 'কাদদু' প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই এ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ডাকার শহরে ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নিগ্রো আর্ট উৎসবে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রথম পুরস্কার পান। ফরাসি ভাষায় রচিত গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের মধ্যে 'গডস বিট অফ উড', 'মনি অর্ডার', 'ক্‌সালা' ও 'ভোলতেইক' ইংরেজী ভাষাতে লভ্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার। ছবির মধ্যে 'মনি অর্ডার', 'ক্‌সালা', 'এমিতেই' ও 'সেডো' বিখ্যাত। নিচের গল্পটি একটি উপন্যাসের অংশ হলেও গল্পের সম্পূর্ণতা আছে। রেলকর্মীদের ধর্মঘট (১৯৪৮) এ গল্পের পটভূমি।

থিয়েং রোডের দিকের জানালাদুটো খোলা ছিল, কিন্তু রুফিস্ক রোডের দিককার জানালাদুটো পাগল-করা রোদের জন্য বন্ধ। সেদিন বিকেলে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে বাক্যবাগীশ ইবরা টেবিলের ওপর ঝুঁকে বক্তৃতা দিচ্ছিল। কুচকুচে কালো গাট্টাগোট্টা চেহারা, মাথায় আধপাকা চুল। অফিসের কর্মীরা শুনছিল, তাদের মধ্যে তিনজন একটা বেঞ্চে বসে আছে; মাঝখানের লোকটার মুখে বোকা-বোকা হাসি, বেশি কোলা বাদাম খাওয়ার দরুন খয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়েছিল।

'কাল রাতে গেছিলুম, বুঝলি। জব্বর মেয়েছেলে,' ইবরা বলছিল। 'গিয়ে কী দেখলুম জানিস? দেখি গোটা কয়েক ছাঁটাই-হওয়া অকম্মার ধাড়ি বসে আছে। জন্মে একটাও কাজ করে নি হতচ্ছাড়াগুলো। আমি তো এক নজরেই বুঝে নিয়েছি ওদের হালচাল। দেখি বিছানাটাও (আমার মত মরদ ছাড়া সেখানে আর কেউ বসে কোন সাহসে) দখল করেছে তারা। আরে, আমার মত পুরনো পাপীর আবার শরম কী? তাই ওদের সামনেই বললাম, "চলি তবে, মেয়ে"। শুনে তো সে আমার পেছু পেছু বাইরে এল। তারপর হল কী

জানিস, ওকে ওর মাসির বাড়ি নিয়ে গেলাম । সে-বাড়িতে আমার তুরুপের তাস আছে । মাসির বাড়ি পে'ছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিগো, এত্তালা পাও নি আমার আসার" ?'

' "পেয়েছি" , ও বলল, "কিন্তু ভাই, ওদের ওমনি ফিরিয়ে দিই কী করে ? বদলে কী পাব না জেনে হাতের ধন কি ফেলতে পারি" ?'

'ভাবলাম সত্যিই তো । তবে আমার দাবি ছাড়ব কেন ? আমি আমার শর্ত-গুলো আবার বললাম, আমাকেই যদি চাও তো আর কাউকে আসতে দেওয়া চলবে না বাপু, বুঝেছ ? হয় শুধু আমি, নয় আমি নেই, সাফ কথা ।'

'কাজের লোক বটে,' বেঞ্চ থেকে কে একটা বলল । তারিফ শুনে খুশি হয়ে ইবরা বুক চেতিয়ে গাছের গুঁড়ির মত পাদুটো নাচিয়ে গত রাতের কেচ্ছা সবিস্তারে বলে চলল ।

'একটু দোনামোনা করে সে বলল, "ঠিক আছে, ওদের তাহলে বলে দেব এদিককার ছায়া না মাড়াতে ।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, তাই চাই, এখন কে তোমার ভার নিল বুঝলে তো ? তোমার সব সাধ মেটাবো আমি, শুধু আমি ।" ওর মাসিতো নিজের শোবার ঘরটা ছেড়ে দিল, রাত তিনটে অবধি সেখানে কাটালাম । অন্য লোকগুলোর কী হাল হল কে জানে ! আসবার সময় টেবিলের ওপর একটা পাঁচহাজারি ক্রাঁর নোট রেখে এসেছি ।'

'পাঁচ হাজার !' একটি লোক চেঁচিয়ে উঠল । 'মাসের আজ উনিশ দিন । পার্লামেন্টের মেম্বারদের পক্ষেই সম্ভব ! আরে মাসের উনিশ দিনের পক্ষে এ তো বহুত টাকা, ভাই !'

'আর এত তুচ্ছ ! ওর জন্য আমি অনেক করব, দেখবি ।' ইবরা তার খয়ে-যাওয়া দাঁত বের করে বলল । 'ও আমার তিসরা বিবি হবে নাকি ?'

'না, তা নয় । যাই হোক, মেয়েটার গতি হল ।'

'পরিবারের মত করে না নিলে দুদিন বাদেই তো ছেড়ে দিবি,' ইবরার দিকে চেয়ে আরেকজন বলল ।

'ওকে কেরেস্তান করে নেব,' ইবরা হেসে বলল ।

শ্রমিকদের মধ্যে ইবরা ভরসার পাত্র । যারা কলোনিয়াল শাসনদুর্গে ঝড়ের বেগে আঘাত করে সাহেবদের সঙ্গে আফ্রিকানদের সমান মাইনে আদায় করে নিয়েছে ও তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরুত্তাপ । স্বাধীনতা এল, সে-সময়কার সব-চেয়ে কষ্টের দিনগুলি তার চেনা । ওর চেলার দল ক্রমেই বাড়তে লাগল । শেষ পর্যন্ত ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বিরি জন্য ভোটে দাঁড়ালো । জিতেও গেল (এখনো সে এম. পি.) । তারপর হঠাৎ সব কেমন বদলে গেল । আগে যারা ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিত, এখন তারা ওকে স্বাগত জানাতে লাগল, প্রত্যেক রিসেপশনে বসরা তাকে দেখে খুশি হতে লাগল । একপয়সা খরচ করতে হল না, জুটে গেল একটা বাগানবাড়ি আর একটা গাড়ি ; ব্যাংকেও একটা অ্যাকাউন্ট হল, তাতে লাভের অঙ্ক জমল না বটে, কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মিটিং

উপলক্ষ্যে ওভারটাইম খেটে তাতে জমার অঙ্ক ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগল। ছুটি কাটাতে যাতায়াত শুরু করল ফ্রানসে। ট্রেড ইউনিয়ন কাউনসিলে ওর একটা অফিস হল।

মালেক ভেতরে এল। 'হ্যালো এভরিবডি' বলে সে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। রোগা ফ্যাকাসে মুখ, গর্তে-বসা চোখ, দৃঢ় চোয়াল, ছোট দাড়ি মুখে, বয়সে যুবক।

'তোর সব খবর ভাল?' টেবিলের ওপর ঝুঁকে-পড়া অবস্থাতেই ইবরা বলল।

'না!'

'কেন, কী হল?'

'কেন কী হল!' রাগে গরগর করতে করতে মালেক বলল, 'গত হপ্তায় আমাদের হাল সম্পর্কে এ-অফিসে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, বহু শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, রেট না বাড়িয়ে অন্যদের ওভারটাইম খাটতে বলা হচ্ছে।

মালেক ডানদিকে কেরানিটির দিকে চাইতেই সে চট করে বলল, 'আমি তো রিপোর্টটা ওঁকে দিয়েছি।'

'ও হ্যাঁ,' ইবরা স্বীকার করল, 'এখানেই আছে, ঠিক আছে দেখব 'খন।'

'কিন্তু বস, আজ রাতেই একশন নেবে, নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই। পুরনোদেরই ডিসমিস করা হচ্ছে—পনের থেকে কুড়ি বছর ধরে যারা কাজ করছে তাদের। নোটিশের সঙ্গে আগাম মাসের মাইনে দেবে কিনা সন্দেহ। টি. ইউ সি এ-ব্যাপারে কী ভাবছে জানতে চাই—আপনি আমাদের প্রতিনিধি। আমরা ঠিক করেছি যে…'

'কী ঠিক করেছিস?' মাথা তুলে চোখ কুঁচকে ইবরা জিজ্ঞাসা করল। থ্যাবড়া মুখটা আরো কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। 'পয়লা কথা, আমিও ওসব শেষ বাতচীত পছন্দ করি না।' টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে ইবরা বলল। 'মালেক তুই কাজে যোগ দেবার আগে থেকেই আমি শ্রমিক আন্দোলন করছি, এই যে ইউনিয়নের মেম্বাররা এখন নানারকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করছে সে তো আমারই জন্যে। ঠিক করেছি! তুই ভেবে ঠিক করলেই সব মিটে গেল? আমি তোদের কাগজপত্র এখনো পড়ি নি। আমার এখন বড় কাজের চাপ—ফেডারেশন (মালি ও সেনেগাল যুক্ত হয়ে মালি ফেডারেশন তৈরি হয়েছিল) ভেঙে যাওয়ায় কাজ বেড়েছে।'

'ও তো আপনার ড্রয়ারেই আছে। এক হপ্তা আগে ওটা আপনার কাছে পাঠিয়েছি,' টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মালেক বলল।

ইবরা ওর পথ আটকাল। 'এখানে কিস্যু নেই। এ-অফিস আমার। শ্রমিকদের সমস্যা আমি চোখে দেখে রাখছি অবশ্যই। এখন যা হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? তোরা, আমি বা কর্তৃপক্ষ কেউ নয়, যত 'গণ্ডগোল' ঐ মালি সরকারের জন্য। রেললাইন কেটে দিয়েছে, ফ্যাক্টরির এখন ছাঁটাই করা ছাড়া গতি নেই, বিশেষ করে তোদের ক্ষেত্রে, তোদের কাজের ফসল তো সবই মালিতে

চালান হয়। দেখছিস তোর চেয়ে আমিই ভাল জানি অবস্থা এখন কেমন?'

'বলতে চান দোষটা মালির লোকদের? আপনি নিজে সব মজুরদের নামে একটা ঘোষণাপত্র পাঠিয়েছেন এই বলতে যে সরকারের কাজ আমরা সমর্থন করি। ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো শলাপরামর্শ না করেই আপনি এটা করেছেন। সেটা…'

'ও, বুঝলাম…'

'আমাকে শেষ করতে দিন,' মালেক চেঁচিয়ে উঠল। থিয়ং রোডের দিককার খোলা জানালায় জনকয়েক মজুর আর মস্তান জড় হয়েছে। 'যেভাবে আপনি কাজ করেন, তাতে মনে হয় অনেক গোলমাল আছে। গিনির স্বাধীনতার সময়ও একই ব্যাপার ঘটেছিল, একইভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছিল।'

'দেখ মালেক,' ইবরা চেঁচিয়ে উঠল, 'তোদের কাছ থেকে হুকুম নেবার লোক নই আমি। যদি বেচাল কাজকর্ম করিস তবে টের পাবি কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছিস, আর কার বিরুদ্ধে লাগাচ্ছিস, বুঝলি? এখানে, সেনেগালে তামাম দেশটাই সরকারকে মদত দিচ্ছে।

'মিথ্যে কথা বলছেন! দেশটা এখনো আসলে কলোনিয়ানদের হাতে। আপনি আর আপনার সাকরেদরা কেবল তাদের হুকুমের তাঁবেদার।'

'ব্যস, আমি আর কিছু শুনতে চাই না,' ইবরা থামিয়ে দিল।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে, চোখে আগুন জ্বলছে।

'আমি মজুরদের কাছে ফিরে যাচ্ছি,' মালেক বলল। 'তোমরা সব সাক্ষী রইলে,' বলে সে বেরিয়ে গেল।

মিনিট কয়েক বাদে ইবরা অফিস ছেড়ে চলে গেল। ওর নতুন কালো প্যোজো গাড়িটা বাইরে অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার তাকে শ্রমমন্ত্রীর অফিসে নিয়ে গেল। পরে বেল এয়ার রোডে ওর গাড়িটা দেখা গেল। ইতিমধ্যে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির চত্বরে জড় হয়েছে। ইবরা এসে ফ্যাক্টরির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বেরিয়ে এসে অপেক্ষমাণ জনতাকে কী কথা হল সে-বিষয়ে কিছু বলল না, শুধু ইউনিয়নের অফিসে পরদিন বিকেলে মিটিং ডাকল।

বাড়ি ফিরে এল সে। দামী আসবাবে সাজানো ভিলা, তিনটে তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর। বাড়ির চারধারে সবুজ ঝোপের বেড়া। নিজের বোলবোলাও অবস্থা নিয়ে নিজেই ভাবল কিছুক্ষণ, মনে মনে একবার সম্পত্তির একটা হিসাব করে নিল। তিনটে বাড়ি, ভাড়া খাটিয়ে প্রচুর উপার্জন হচ্ছে। দুটো ট্যাক্সি। রোজ প্রচুর চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় জুটছে। হিসেব নিয়ে সে ভাবল, গরিবদের সঙ্গে তার কোনোও সম্পর্ক নেই।

পরদিন বিকেল তিনটে। ট্রেড ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ের সামনের চত্বরে জনা পঞ্চাশেক লোক জড় হয়েছে। ইবরা তাদের সামনে বক্তৃতা দিল, পাশে শ্রম ও পরিকল্পনা মন্ত্রী, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার এবং কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে।

'আমি কাল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছি। বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। আমি বুঝি, পরিবারের কর্তা বেকার হলে কষ্টের শেষ থাকে না। কিন্তু বন্ধুগণ, এটা তোমাদের বুঝতে হবে যে বর্তমান অবস্থা যার সঙ্গে আমরা সবাই জড়িত, তার জন্য তোমাদের ম্যানেজার দায়ী নয়। গালি ফেডারেশনের সমস্যা আমাদের সকলের পক্ষেই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রপতি সেদিন এ-বিষয়ে কী বলেছেন তা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে। ভাই সব! শ্রমমন্ত্রী, এই যে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, উনি কথা দিচ্ছেন, অবস্থা আবার স্বাভাবিক হলেই তোমাদের আবার কাজে বহাল করা হবে। তাছাড়া, নোটিশের সঙ্গে তোমরা মাইনেও পেয়ে যাবে। ভাইসব, দেশের শত্রুদের দল ভারি কোরো না, ওদের কথা শুনো না তোমরা, একশ্রেণীর লোক যে সবসময় ভ্যান ভ্যান করছে যে দুরবস্থার জন্য বর্তমান সরকারের শৈথিল্যই দায়ী, ওদের কথা শুনো না। আমরা স্বাধীন, অন্য যেকোনো দেশের মত স্বাধীন। আমরা নতুন কলোনিয়ালিজম্, সাদার বদলে কালোর কলোনিয়াল শাসন চাই না, সেটা আরো কষ্টের আরো দুঃখের হবে। শেষ করার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। মজুরদের প্রতিনিধি হিসাবে মালেককে আমার সুবিধের বলে মনে হয় না। প্রতি মাসে আমাকে ও ইউনিয়ন কমিটিকে তার রিপোর্ট দেবার কথা। মন্ত্রীমশাই এবং আমি নিশ্চিত যে, আগে জানতে পারলে, ছাঁটাইয়ের সংখ্যা কমানো যেত। কিন্তু…'

'আমি প্রতিবাদ করছি। ঝুট বাত!' মালেক চিৎকার করে উঠল। প্রত্যেক মাসে আমি রিপোর্ট পেশ করেছি। গতকালই তো আপনাদের কাছ থেকে আমি এখানে আসি। অফিসের কর্মীরা সাক্ষী আছে।' মালেক ছুটে গেল অফিসঘরের দিকে, দরজায় তালা লাগানো।

'অফিসে কেউ ছিল না। আমি সবসময়েই একাই কাজ করে থাকি।'

'কমরেডরা, সত্যি করে বলুন! আমি কখনো কর্তব্যে অবহেলা করেছি?'

'সব কথা বলি নি তোমাদের,' ইবরা আরো বলল, 'ম্যানেজার বলেছিলেন মালেক নাকি তাঁর কাছে ব্যক্তিগত সুবিধা চেয়েছিল।'

'দেখলে তো, ভাইরা, নিজেদের হাতে নিজেদের ভার নিলে কী হয়?' ম্যানেজার বললেন, 'আমি আমার মজুরদের ভালই চাই।' বারোটার সময় ট্রাকে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া আবার দুটোর সময় তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা—এ-ব্যবস্থা তো আমিই করেছি।'

'কিন্তু…,' মালেক শুরু করল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' মন্ত্রী মালেককে থামিয়ে দিলেন (মালেক তখন কঠিন দৃষ্টিতে ইবরার দিকে তাকিয়ে)। 'মালেক, তোমাকে আমরা ভাল করে জানি। ষড়যন্ত্রের পথ জেলখানার দিকে। সরকারের কাছে তোমাদের প্রতিনিধি যা বলেছেন, তা সব সত্যি। আমাদের ইতিহাসের দীর্ঘতম রজনীতে তোমরা যেভাবে সরকারকে সমর্থন করেছ তা চিরকালীন প্রতিশ্রুতি হয়ে রইল। সরকারের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামীকাল

পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হবে । কয়েক হপ্তার মধ্যেই তোমরা আবার কাজে ফিরে আসবে । তোমরা কিছু মনে কোরো না, আমায় এবার যেতে হচ্ছে, বিস্তর কাজ পড়ে রয়েছে আমার ।'

সাঙ্গোপাঙ্গ ও ম্যানেজারসহ মন্ত্রী অদৃশ্য হলেন ।

মালেকের সঙ্গে ইবরা আর কোনো কথার মধ্যে গেল না । দুজন লোককে ডেকে ওর সঙ্গে কোথায় যেন যেতে বলে সেও চলে গেল ।

মালেক চলে যাচ্ছিল, জনা বারো লোক ওর কাছে জড় হল । তাদের একজন বলল, 'মালেক, হক কথা বলেছিস, ভাই ।' তাদের হয়ে ফ্যাক্টরির সবচেয়ে পুরনো শ্রমিকটি বলল, 'কিন্তু দেখো, মানতেই হবে তোমাদের পাশে দাঁড়াবার হিম্মত আমাদের নেই । লোকগুলো আমাদের কেউ নয়, ভাই । বাইরে চামড়াটাই কালো, ভেতরে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে কোনো ফারাক নেই ।'

মোহাম্মদ দিব

নায়েমা নিখোঁজ

উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ফরাসি শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৬২ সালে। উপন্যাসিক, গল্পলেখক ও কবি মোহাম্মদ দিব এ-দেশের মানুষ। ১৯২০ সালে মরক্কো-আলজেরিয়া সীমান্ত-শহর ত্লেমসেন শহরে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গালিচাকারক, রেলকর্মী হিসাবে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে সাংবাদিক হন। প্রথম উপন্যাস 'লা গ্রাঁদ মেজঁ' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। 'আফ্রিকান সামার' উপন্যাস তাঁকে খ্যাতিমান করে। ফ্রান্সে তিনি বহুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর লেখাতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা, যুদ্ধের ভয়াবহতা পরিস্ফুট। বর্তমান গল্পটিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা চিত্রিত।

পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেল, তবু নায়েমার কোনো খবর নেই। কেউ বলে ওকে নাকি বেদো ব্যারাকে আটক করে রেখেছে। বেদো ব্যারাক—সেখানকার বন্দিরা নাকি বদল-আটক, সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার বিষয়ে ভয়াবহ সব কথা শোনা যায়।

কিন্তু ঠিক খবর পাওয়া যায় কী করে? না, সঠিক কিছু জানবার উপায় নেই কোনো। সেখান থেকে এ-পর্যন্ত ফেরে নি কেউ। তবু ধৈর্য ধরো, দেখো ছিদ্রপথে কোনো খবর আসে কিনা, যাদু বলে হয়তো একদিন শোনা যাবে তাকে বিচারসভায় আনা হয়েছে; অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের করবার আছেই বা কী?

প্রায়ই বাচ্চাদের নিয়ে যাই পার্কে—আমরা যাকে বলি ছোট বাগিচা, সেখানে বিকেলের খানিকটা কাটিয়ে আসি। হেমন্ত ঋতু গাছের পাতায় রঙের তুলি বোলাতে শুরু করেছে, লাল হলদে পাতার কুঁড়িগুলি আকাশের ঘন নীল রঙের সঙ্গে মিলেছে। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না। অন্ধকার হবার আগেই সকলে বাগিচা খালি করে চলে যায়, ওর পরে থাকা বিপজ্জনক। তবু বাচ্চার ওখানে বেশ ভাল থাকে। আমিও একমাত্র ওখানে গিয়েই একটু হাঁফ ছাড়তে পারি। সবারই একই দশা হবে এ-যুদ্ধে।

তবু কেউ যদি বেঁচে ফিরতে পারে, অনেক কিছু শিখে ফিরবে তারা। সাত বছরের ছেলে রহিম এর মধ্যেই যুদ্ধের মধ্যে কাটিয়েছে তিনটে বছর। বোবা জিজ্ঞাসা নিয়ে থমথমে মুখে সে যখন আমার দিকে তাকায় তখন আমার বড় অস্বস্তিবোধ হয়, অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

দিনকয়েক আগে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অমন করে ও আমার দিকে তাকায় কেন।

'বাপজান, গ্রেনেড ছুড়তে গিয়ে কারো হাত কাঁপা উচিত?' ও বলেছিল।

মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। কী বলব আমি ওকে? বানিয়ে গপ্পো বলব? ও-ফাঁকিবাজি এখন আর চলে না, রহিমের সঙ্গেও নয়। 'খুন', 'আক্রমণ,' 'আত্মরক্ষা'— ওর কথায় সবসময় এসব শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আমি আর ওকে সাবধান হতে শেখাই না, ওসব কথা বুঝবে না। আমাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা দেয়াল উঠেছে।

আরেকদিন, এমনিই হাসতে হাসতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেটা, কী করা উচিত এখন বলত?'

'সব ব্যাটাকে কোতল করো, বোমা ছোড়ো দমাদ্দম!' এক লহমা সময় না নিয়ে বেদরদী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

'তুইও লোকের জান নিবি, বেটা?'

'হ্যাঁ। কেন, তুমি নেবে না?'

'না,' আমি বলেছিলাম।

ওর চোখের অবিশ্বাস এখনো আমি ভুলি নি।

এখানকার অন্য বাসিন্দারা এখন আর নায়েমার নামও করে না। আমি বাপ হয়েও বালবাচ্চাগুলির কাছে আম্মার মতও বটে। অন্য ফ্ল্যাটের বিবিরা, আম্মারা এসে ঘর ঝাড়পোঁছ করা, খানা পাকান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরের সব কাজ করে দিয়ে যান। ওঁরা নিজেরাই এসে এসব কাজের ভার নিয়েছেন। একজন মরদকে এসব কামকাজ করতে দেওয়ার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। আমি না থাকলে অনেক সময় ওরা বেনালি, জাইয়া, রহিমকে ঘর থেকে খানা এনে খাইয়ে দেন। বোরখা-পরা এক বিবি লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে নিয়মিত আমার ভাতার তনখা এনে দিয়ে যান। ওর ঘুঙট উনি কখনো তোলেন না, তাই বিবিজান যে আসলে কে তা এখনতক কেউ জানে না। তাছাড়া ঝুটমুট অদরকারি কথা পুছে করা সাহসে কুলায় না এখন।

বাড়িটা সবসময় যেন তক্কে তক্কে থাকে। আসমান ফিকে হয়েছে সবে। ঠাণ্ডা-মিঠা দিন শুরু হচ্ছে কেবল। এরই মধ্যে উঁচু গলার আওয়াজ, ডর-লাগা গলার ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে বাড়িময়। নসীব ভাল বলতে হবে, একটা ঝুটা বিপদ-সংকেত ছিল ওটা। ঘন ঘন এমন স্নায়ুযুদ্ধ চলে এখানে, বোমা ফাটলে সেটা চরমে গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরে থেকে কেউ একটা খবর নিয়ে আসে, চিল্লিয়ে সেটা সবাইকে জানায়, সবাই ছুটে নিজের চত্বরে আসে আর যার যার মন্তব্য জাহির করে। সেরকম কিছু আজ সকালে ঘটল না, তবে দিন তো সবে শুরু হল।

এইসব হৈ হল্লার মধ্যে আমি বসে নায়েমার কথা ভাবি। পাত্তা নেই তার, কী করেছে ওরা ওকে নিয়ে জানি না, বেপাত্তা বলেই মনটা যন্ত্রণায় ছটফট করে। শহরে নিত্যি এত লোক নিখোঁজ হচ্ছে, মরছে, এত লোককে গোর দেওয়া হচ্ছে

যে এসবের আজকাল আর কেউ তোয়াক্কা রাখে না । আজকের ঘটনা গতকালের ঘটনাকে মন থেকে মুছে দেয় ।

সব জায়গাতে পোস্টারে দেখা যায় যাদের জান নেওয়া হবে তাদের ছবি । রোজই আদালত থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা আসে । তদন্তে সাবাড় করার সংখ্যা বেড়ে যায়, রোজ ভোরে হাত-পা কাটা মুর্দা পড়ে থাকে । এখানে সকলেই ভাবে নায়েমা আর ফিরবে না ; সাহস করে আমাকে বলে না বটে, কিন্তু আমি ওদের চাহনি দেখেই বুঝতে পারি ।

গতকাল, দুজন অচেনা লোক রাস্তায় আমায় থামিয়ে দরজির দোকানে খোঁজ নিতে বলল । ওরা চলে যেতেই দরজি এসে সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ওরা কী যেন একটা রেখে গেছে ।'

'কী যেন একটা ?'

'হ্যাঁ, মানে···?'

বুঝলাম । আরো বুঝলাম যে বিপদের মুখে এবার রুখে দাঁড়াতে হবে ।

সেদিন বিকেলে সক এল-ঘেজেল চৌকের সড়ক পার হচ্ছিলাম । এ-রাস্তায় সবসময় ভিড়ভাট্টা লেগে থাকে । ঘটনাটা ঠিক তখনই ঘটল । প্রথমে লোকগুলি একটু বেসামাল, পেছু হটে গেল খানিকটা । কয়েকটা চিৎকারও শোনা গেল । দুটো গুলির আওয়াজ পেলাম, তারপর একটা বোমা ফাটল জান কাঁপিয়ে দিয়ে । ঠেলাঠেলিতে যারা পড়ে গিয়েছিল তারা পায়ের তলায় পিষে গেল । এক লহমার মধ্যে পুরো চত্বরটা ফাঁকা হয়ে গেল । কেবল একটা লোক দেখি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে । পুলিশের হুইসল হাওয়াকে ফালা-ফালা করে কেটে ফেলছিল । ওদের নজর এড়াবার জন্য সরে পড়লাম, পাশের একটা গলিতে একটা মুচির দোকানে ঢুকে পড়লাম ।

আমাকে অমন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে মুচিটা ভেবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কী হল, ব্যাপার কী, নতুন কিছু হল নাকি ? অ্যাঁ ?'

'সক-এল-ঘেজেলে একজন খুন হয়েছে,' কোনোমতে বলে আমি দম নেবার জন্য থামলাম ।

'অ্যাঁ !'—এই আওয়াজ ছাড়া তার গলা দিয়ে আর কিছু বেরোল না ।

ওর লম্বাটে ফ্যাকাসে রোগা মুখে হঠাৎ হাসির রোশনি ফুটল । 'বাজি ফেলতে যাচ্ছিলাম, ভাবছিলাম শান্তির খবর সঙ্গে আনছেন আপনি ।'

'শান্তি ! এ-তল্লাটে ও-কথা কেউ শুনেছে কখনো ?' ওর কথা, আর সেই মুহূর্তটা এখনো আমার মনে জ্বলজ্বল করছে । কথাটা শেষ করে ভয় ঢাকবার জন্য আমি যেই বোকার হাসি হেসেছি তখুনি আরো দুটো বোমা ফেটে রাস্তাটাকে কাঁপিয়ে তুলল । কয়েকগজ তফাত থেকে ভীষণ চিৎকার শোনা গেল, হঠাৎ পাগলের মত গোলাগুলির আওয়াজ শুরু হল, ক্রমে সেটা গুলিবৃষ্টির মত হয়ে দাঁড়ালো । আমাদের চোখের সামনে লোকগুলো দুভাঁজ হয়ে ধপ্‌ধপ্‌

করে পড়তে লাগল গলিটার বুকে।

সাব-মেশিনগানের একটানা আওয়াজ এগিয়ে এল। মুচিকে বললাম দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে। মুখটি না খুলে ও গিয়ে দরজায় কুলুপ লাগিয়ে দিল, দুজনেই মেঝের ওপর পড়ে রইলাম।

গুলির আওয়াজটা রাস্তাটাকে যেন ঝাঁট দিয়ে গেল। ভয় খেয়েছিলাম বলে মনে হয় না এখন। বরং বেশ শক্তই ছিলাম মনে হয়; শুধু এরপর কী হয়, তাই ভাবছিলাম ঘাপটি মেরে। সময় যেন আর কাটছিল না, সেকেন্ডগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজার ওপর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শোনা গেল। মনে হল ভাঙতে চেষ্টা করছে কেউ। মুচির ইচ্ছা দরজাটা খোলে; সে আমার দিকে চাইতে, ইশারায় তাকে নড়তে নিষেধ করলাম। দরজার ওপর হামলা বাড়ল আরো, মরীয়া হয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত দরজা খসে পড়ল, একজন পল্টন ঢুকল ভেতরে। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে দোকানের মালিককে ঘাড় ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। চৌকাঠের বাইরে নিয়েই বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার বুকে মারল এক গুঁতো, মুচিটা মুখ থুবড়ে সোজা পড়ল রাস্তার ওপর। ওপরে তাকিয়ে দেখি একটা কার্নিশ গেছে, ওখানে উঠে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। পল্টনরা অবশ্য আর ফিরে এল না।

গোটানো চামড়ার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখে পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কাঠের মেঝের ফাকর দিয়ে রাস্তার এক চিলতে দেখা যাচ্ছিল। দোকানে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমি তো মুর্দার মত পড়ে আছি, দেখছি কী হয়, নাকে চামড়ার বদবু লাগছে; মিনিটগুলি একের পর এক পার হয়ে যাচ্ছে।

ঠাণ্ডা হয়েছে অবস্থাটা, কেবল বহু দূরে থেকে গোলাগুলির ভোঁতা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভাঙা দরজা পেরিয়ে বাইরে যেতে মুচির মুর্দা ডিঙিয়ে যেতে হল। রাস্তায় একটা লোকও নেই। আওয়াজও নেই কিছুর।

মরতে আমরা তৈরি আছি, কিন্তু কীভাবে এই জীবনটাকে ছাড়তে হয় তা কেউ আমাদের শেখায় নি। সে-রাতে সবকিছু আওয়াজ ছুটে— আমার ভাবনা, শহর, যুদ্ধ, সবই নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে। উঠে বসে চারপাশটা নজর করতে চেষ্টা করলাম, সবকিছু হঠাৎ আজব বলে মনে হল। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে; কেন? এই শিশুদের অস্তিত্বের অর্থ কী? ওরা কী করতে রয়েছে এখানে! হঠাৎ ইচ্ছে হল উঠে সাজপোশাক পরে পুরনো ডেরার দিকে ছুটি, কারফিউর পরোয়া না করে। নিদ আসতে দেরি হল অনেক। মাথাটা যেন জোয়ারের জলে পাক খাচ্ছে মনে হল।

আসমানে আলো ফুটতেই বেরিয়ে গেলাম ঘর ছেড়ে। অফিস-কাছারিতে লোকের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে, ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে সাইকেলওয়ালারা

ভিড় সরিয়ে এগোচ্ছে।-ফেরিওয়ালা ফুটপাথে কলরব করছে। সক-এল-মেরজেলের চত্বরে শুধু সেইসব দোকানে ঝাঁপ বন্ধ যাদের মালিকরা খুন হয়েছে। দেয়ালগুলি বুলেট লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, দোকানের শার্সিগুলিতে তখনো চোখের পানি লেগে আছে। ভাঙা কাচ, ইটের টুকরো রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

মুচির দোকানে পৌঁছে গেলাম।

বন্ধ। গতকাল আমি তো খুলে রেখে গিয়েছিলাম। রাস্তার দরজায় দেখি একটা তালাও ঝুলছে। তালাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুচিটাকে কী করেছে ওরা? আশেপাশের দুয়েকটা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম খবর মেলে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু একটা কথাও বার করতে পারলাম না, শুধু বলল যে গোর দেওয়া হবে না। রাতের অন্ধকারে সব মুর্দা তুলে নিয়ে সরকার বাহাদুর মাটি-চাপা দিয়েছে, আত্মীয়স্বজনদের কোনো খবর দেয় নি।

চলে এলাম। এদিক-ওদিক ঘুরলাম কিছুক্ষণ বেফয়দা। এমন সুন্দর তরতাজা দিন, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, আমি যেন আলগা হয়ে গেছি মালুম হল। ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাই তোলা ঐ আসমান, মোলায়েম হাওয়া, আরো বহুৎ চীজের খুশবু আমাকে বাওড়া করে দিল, চিন্তা করতে পারলাম না কিছু।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলাম। হঠাৎ হুঁশ হল সব চীজের গন্ধে ও স্বাদে রক্তমাখা।

আবার রাত এল, আবার আমার নিদ টুটে গেল। কান পেতে শুনলাম। দূরে কোন সব বাড়ি থেকে হাঁকাহাঁকি ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। সোরগোল ক্রমে বেড়ে গেল। ভয়াবহ চিৎকার এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাতাসে গুলির সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল, থেকে থেকে সাবমেশিনগানের হুমকি। নিঃশ্বাস চেপে অনড় হয়ে পড়ে রইলাম। মেয়ে পুরুষের মিলিত গলা থেকে ভয়ের আর যন্ত্রণার চিৎকার শোনা গেল। তারপর সব চুপ। আমি চোখ বুজলাম। অ্যাপোক্যালিপ্সের জানোয়ারগুলো চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বহুদূরে থেকে মোটরের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে—এছাড়া আর কোনো আওয়াজ কানে আসছে না। কিছুক্ষণ বাদে তাও আর শোনা গেল না।

রাত ভোর হল। আসমানের রঙ হালকা নীল—চারদিকে রোশনি ঝলমল করছে। লোকজন পথে বেরলো, সকলেরই মনে উদ্বেগ, কী জানি কী হল, কী জানি কী হবে!

শহরের ফটকগুলির কাছে মুর্দাগুলো ফেলে রেখেছে, সবকটা অঙ্গহীন। জনা বারোর মধ্যে তিনজন জেনানা।

লড়াই চলছে; আরো কত সাল ধরে চলবে কে জানে! গোলাগুলির, বোমা-ফাটার আওয়াজ বাদ দিয়ে জীবন কী হতে পারে তা আজ আর কেউ আন্দাজ

করতেও পারে না। সবসময় ভয়ঙ্কর সব খবরের কানাকানি চলছে। রাস্তা চলতে গিয়ে বারেবারে পেছন ফিরে তাকানো অভ্যাস হয়ে গেছে। সবসময় তক্কে তক্কে থাকি কখন বা রাস্তার ওপর শুয়ে পড়তে হয়, কখন বা কোনদিকে গ্রেনেড ফাটে। কারো অঙ্গভঙ্গি সন্দেহজনক মনে হলেই সটান হয়ে যাই; সরে পড়ি, কী হতে পারে তা দেখবার জন্য তোয়াক্কা রাখি না। বাড়ি থেকে বেরোলে জিন্দা ফিরব কিনা কেউ বলতে পারে না।

কতগুলি চৌক, বাজার আর চৌমাথার মোড় আমি সবসময় এড়িয়ে চলি। বিশেষ করে যেসব জায়গায় রায়ট স্কোয়াড দিনভর রাতভর পাহারা দেয় সে-গুলো। তার-কাঁটার বেড়া দেওয়া রাস্তা বা গলির ধার মাড়াই না আমি। হাঙ্গামার সময় ওসব জায়গায় গা ঢাকা দেওয়া নিরাপদ নয়, কী জানি কখন কোন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ি।

এখানে আমরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি, এই কসাইগুলোর দয়ার ওপর নির্ভর করে, ওদিকে আসল লড়াই চলছে অন্যখানে। তাই এখানে, হররোজ এই হাঙ্গামার ভয়ের মোকাবিলা করব আইনশৃঙ্খলা ভেঙে তাই সাব্যস্ত করেছি। দুনমনা করে পিছু হটে গিয়ে আমরা অনেক লোকসান করেছি এখনতক। আসল লড়াইয়ের চেয়ে এখানকার ব্যাপার সমপার আরো খারাপ।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই রোজকার হাঙ্গামায় কোনোভাবে আমার জান যায় তো বাঁচি। হররোজ এই খুন দিয়ে গোসল করা, এই কসাইখানার বদগন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া আমাকে কাবু করে, ভয়ে সিঁটকে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই বাঁচবার জন্য এমন ভুখ লাগে, শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখার জন্য এমন ইচ্ছা যায়! তখন মনে হয় তামাম দুনিয়ার পল্টন আর পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি আমি।

এই লড়াই শেষে যারা জিন্দা থাকবে তারা জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবে কী করে? শান্তি ফিরে আসার মানে দাঁড়াবে কী? আমাদের কাছে এ-জীবনের স্বাদ না রঙ কিছু আর বাকি নেই। ওরা এ-জীবনে শয়তানের মুখোশ ছিঁড়ে মানুষের মুখ ফিরিয়ে আনতে পারবে কী?

একটু আগেই সবে তিজাউনি কাফেতে বসেছি, এমন সময় এক ঝাঁক পুলিশ হাজির। আমরা যারা বাইরে টেরেসে বসেছিলাম তাদের সবাইকে মাথার ওপরে দুই হাত তুলিয়ে কাফের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। গায়ে গায়ে লাগালাগি করে দাঁড়িয়ে আছি, কখন সার্চ করবে, আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে বলবে সেই অপেক্ষায়। অটোমেটিক হাতিয়ারের চকচকে কালো নলগুলি মনে করিয়ে দিচ্ছে একটু নড়লেই খতম। টুঁ শব্দ না করে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, কেউ ভেঙে পড়লাম না ভয়ে। আশ্চর্য একটা শান্ত আবহাওয়ার আবরণে ঢাকা মনে হল সবকিছু। 'না, কিছুতেই কাবু করতে পারবে না আমাদের ওরা'—মনে মনে বললাম।

এক ঘণ্টা ধরে খানাতল্লাশি করল। এক ঘণ্টার ধৈর্য পরীক্ষা হল প্রত্যেকের।

শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ছেড়ে দিল তখন বিপজ্জনক বিকেল নেমেছে শহরে। অপমানের বিষে আমার গলা জ্বলছে। সাড়ে চারটায় কারফিউ শুরু, রাস্তা তখন বিলকুল ফাঁকা হয়ে যাবে। কাফে থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি না গিয়ে ভাবলাম একটু ঘুরে ফিরে যাই। বাড়ির সদর দরজাগুলো প্রাণান্তক প্রত্যাশায় থমথম করছে। সাবধানী লোকজন নিঃশব্দে বাড়ি ফিরছে। শহরটা নিজের ভারে বেঁকে আছে, দুর্দিনের চেহারা তার শরীরে।

বুলেভার্দে'র শেষমাথায় আসমানের হালকা নীল পটে মনসুরা পাহাড়ের গাঢ় নীল রঙ আমার মুখে সুখ-আশার ছায়া ফেলল। সাধ হল চাবধারে একটু ঘুরি, ফটকের ভেতর দিয়ে যাই, আর···আজ যদি তা সম্ভব হত!

প্লাস দ্য লোভেল দ্য ভিল-এর খবরের কাগজের স্টলটার দিকে যাবো বলে চলেছি। দোকানদারের সঙ্গে একটু জান পহচান আছে বলে সবকটা কাগজই একটু উল্টেপাল্টে দেখতে পারি, কিনবার বাধ্যবাধকতা নেই। নতুন কোনো খবর চোখে পড়ল না। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। মিউজিয়ামের রেলিং ধরে যেই কিনারায় পৌঁছেছি তখুনি ঘটনাটা ঘটল। বিস্ফোরণের শব্দে চারপাশের দেয়াল কেঁপে উঠল, এক ঝলক গরম হাওয়া এসে আমার মুখটা ঝলসে দিল। বরফ বারিশের মত কাচের টুকরো ঝরতে লাগল, শব্দে কানে তালা লেগে যায়, চারপাশ থেকে সোরগোল উঠল। গাছের সারি দিয়ে ঘেরা চৌকে লোকগুলি এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল। কাছের গলিটাতে ঢুকে পড়লাম। সেখানেও কান্না-চিৎকার-হুমকিতে কান ফাটবে মনে হয়।

ছোট বন্দুকের গুলি গলিটাকে ঝাঁট দিয়ে গেল। ঠিক আমার সামনেই একটা লোক আছড়ে পড়ল মাটিতে, তারপর এক মহিলা গড়িয়ে পড়ল, লম্বা দো-পাট্টায় জড়িয়ে গেল তার নিষ্প্রাণ দেহ।

রাস্তাটা জমে স্থির হয়ে গেল যেন।

জোরে সাইরেন বাজিয়ে রাস্তার ওধার থেকে কয়েকটা ফৌজি ট্রাক এসে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল, দুধার থেকে সশস্ত্র প্যারাট্রুপ ঝপাঝপ করে নামল। ওদের একটা, চোখদুটো যার বরফ-নীল, ইশারায় আমাকে সরে যেতে বলল। আমি চলে আসছি এমন সময় পরের রাস্তার মোড় থেকে গোটা কয়েক আরবী টেরিটোরিয়াল ফৌজ চিৎকার করে আমাকে থামতে বলল।

আমি থামলাম। তারপর সোজা তাকালাম তাদের দিকে, ঠিক করলাম ওদের দিকে এগোবো। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি এবার ওরা আমাকে গুলি করবে। একটুও ঘাবড়াই নি, শুধু বেইমানগুলোর ওপর ঘৃণায় আমার ভেতরটা পূর্ণ। 'গুলিবিদ্ধ শিকার পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ছে, তা দেখে মজা মারবার মোকা আমি ওদের দেব না কিছুতেই'—এগিয়ে যেতে যেতে নিজের মনে বললাম। ওদের কয়েকটার মুখ চিনি আমি, দুয়েকটা আমার সঙ্গেই স্কুলে পড়ত।

'খবরদার, নড়বি না!' দলের একজন চিল্লিয়ে বলল।

আরো কয়েক পা এগোলাম, তারপর হঠাৎ ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

ঠিক এরপর কী হল তা আমার মনে নেই। ঘাড়ের ওপর রদ্দা খেয়েছিলাম, সেই অবস্থায় সম্ভবত আমাকে চৌকে টেনে নিয়ে আসা হয়। হুঁশ হলে দেখি আরো অনেক আলজেরিয় আরব দাঁড়িয়ে আছে চারধারে—তাদের গায়ে বন্দুকের নল ঠেকানো। রাস্তার ওপর মরা মানুষের শরীর ছড়িয়ে আছে, দুয়েকটার বুক তখনো ধুকধুক করছে। ঠিক আমার সামনেই সেরকম একজনের গলা থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'

কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। চত্বরে, আশেপাশের রাস্তায় মানুষ শিকার তখনো চলছে। ইউনিফর্ম পরা মানুষগুলি কুঁজো হয়ে বন্দুক বাগিয়ে অন্য মানুষগুলিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পালাবার পথে তাদের মধ্যে দু-একজন মুখ থুবড়ে পড়ছে রাস্তার ছাই রঙের পাথরের ওপর।

ঠিক তখনই শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এসে একটা লোক হাত-পা নেড়ে চেঁচাতে লাগল, 'ঐযে, ঐ লোকটা বোমাটা রেখে গিয়েছিল! আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

যাকে সনাক্ত করা হচ্ছিল সে-বেচারা হতভম্ব হয়ে তার জীর্ণ কালো কোটের ওপর একটা নোংরা ঝুড়ি আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল। জনাকতক টেরিটোরিয়াল ছুটে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে আনল। বেচারা বাধা দিল না। চৌকের মাঝখানে তাকে টেনে এনে তার পেটে বুকে কয়েকবার গুলি করল ওরা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা, হাতদুটো তখনো ময়লা ঝুড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

যে-লোকটার কথায় ওকে খতম করা হল সে বই বেচে। 'সুবিচার জিন্দাবাদ!' বলে সে চেঁচিয়ে উঠল।

বেচারা লোকটা, ছোট্টখাট্ট একটা মানুষ, ওর জন্যই যে আমরা আর সবাই বেঁচে গেলাম তাতে সন্দেহ নেই। দেখে মনে হয় রাজমিস্ত্রি গোছের হবে। মুর্দা শরীরটা কুঁকড়ে আরো ছোট হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে পড়ে আছে চত্বরের মাঝখানে, সারা দুনিয়াকে 'খুনী!' বলছে যেন ঐ ফরিয়াদী শরীর। চোখ ফেরাতে পারলাম না ঐ কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা থেকে, মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না ওর বোবা নালিশ।

একটু বাদেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। ফৌজি কর্ডন তুলে নেওয়া হল, লোকজন আবার চলতে শুরু করল; ঘণ্টা বাজিয়ে জনতার মধ্যে পথ করে সাইকেল আরোহীরা ছুটতে লাগল, খরিদ্দাররা দোকানে ঢুকল, যারা ভেতরে ছিল তারা বেরিয়ে এল। একটা ভিখিরি চেঁচিয়ে মানুষের দয়া আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল, একটা ফেরিওয়ালা তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এল। ভয়ের ভাবটা কাটল কিছুটা। শুধু রক্তের একটা হালকা গন্ধ বাতাসে লেগে রইল, হালকা হলেও মনমেজাজের ওপর তার চাপ ভারি। রাস্তা ধরে বাড়িমুখো হলাম।

সেই একই উৎকণ্ঠা, সেই একই উন্মত্ততা, একই হাঁ-করা খাদ আমাদের

জীবনকে গ্রাস করে আছে।

আজই সকালে পুলিশেরা শহরের চৌকে বিশটা মুর্দা ফেলে রেখে গেছে। আর পাঁচজনের সঙ্গে আমি ছুটে গেলাম দেখতে: জানলার শার্সির ফাঁকে জ্বল-জ্বলে চোখ নিয়ে মানুষগুলো তাকিয়ে দেখছিল বাইরে।

চৌকে ঢোকবার সবকটা পথ আটকে রেখেছিল ফৌজিরা। আর এগোনো গেল না। আমি চারপাশ থেকে ঢুঁ মারার চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ মিছিলটা এগিয়ে এল, এমন মিছিল এ-তল্লাটে কেউ দেখে নি আগে। কেবল শিশু ও আরব রমণীর মিছিল. মেয়েদের মুখে কোনো ঢাকা নেই। জোয়ারের স্রোতের মত এগিয়ে আসছে, মুখে আজাদীর গান। হিংস্রতা, ক্রোধ, যন্ত্রণা না প্রতিবাদ—কোন ভাব এদের, এই জেনানাদের, এই বাচ্চাদের (সবার পা খালি) তাড়িয়ে এনেছে বলা মুশকিল। কোন মনোবলে এরা এভাবে উদাত্ত স্লোগান-গানের দিকে ছুটে চলেছে! পুরনো কাপড় ছিঁড়ে বানানো সাদা-সবুজ নিশান উড়িয়েছে মাথার ওপর। ফৌজিরা এগিয়ে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল। মিছিলের মেয়েরা কর্ডন ভেঙে এগিয়ে গেল, তাদের ধাক্কায় অনেকের ফৌজি টুপি খসে পড়ে গেল।

তক্ষুণি অটোমেটিক হাতিয়ার থেকে ফটফট গুলির ঝরনা ছুটল। চোখের সামনে দুনিয়া দুলে উঠল। এতক্ষণ আমরা যারা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, আসমান-ফাটা আজাদী গান শুনছিলাম, আমরাও এবার ওদের সঙ্গে রক্ত ও মৃত্যুর আবর্তে মিশে গেলাম। ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলে আজাদী গান গেয়ে ওদের সঙ্গে বন্দুকের নলের মুখে বুক ঠুকে দাঁড়াবার ইচ্ছে হল আমার।

বুলেটের বৃষ্টি শুরু হল আমাদের ওপর। ছত্রভঙ্গ হল সকলে, চিৎকার ও হল্লায় এ ওকে পায়ের তলায় পিষল, হাঁটু ভেঙে লুটিয়ে পড়ল কত লোক।

রাত দুটো। বিস্ফোরণের আওয়াজ নৈঃশব্দ্যকে টুকরো টুকরো করে কাটল। দূর থেকে গোলার আওয়াজ ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ ধরেই থেকে থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

তাজা দুধের ফেনার মত ভোর হল, আসমান থেকে দরিয়ার পানির মত আলো ঝরে পড়ল জমিনে; গঙ্গাফড়িংও দিলখুশ হয়ে গীত গাইতে শুরু করে। পিলপিল করে বাচ্চারা বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

আজ একটা দুরন্ত আশা আমার বুকে ঢেউ তুলেছে। দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কি এই আশার জন্ম? বাজি রাখতে রাজি, বিশ্বাস করুন বা না করুন, কাল কালই আসবে, আসবে মুশকিল আসান, আসবে শান্তি, আসবে জয়! বিছানা থেকে টেনে তুললাম নিজেকে, গা থেকে হিম্মতের তাপ বেরোচ্ছে যেন, এবার সাহস দিতে হবে অন্যদের।

এদিকে গাঁ থেকে উজার করে উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে। পেটে ভুখ, শরীরে তাগদ নেই, গায়ে মাটির গন্ধ, নিঃশ্বাসে ভয়, চোখের চাহনিতে বোবা

আক্রোশ। শহরের বাইরে মাঠের শান্তির কথা ভাবি, সে-শান্তির ওড়নার আড়ালে আশঙ্কা লুকোনো আছে। এমনকি গাছগুলি, এখনো শান্ত যদিও; তাদের হলুদ পাতা অদেখা শিখাকে লেহন করে, মনে হয় তারাও ভাবছে—কী হবে কী হবে যেন!

কিন্তু দোরগোড়ায় বা উঠোনে মেয়েদের দেখে, তাদের কলরব শুনে, শেষে কেমন মনে হয়, কই না, কিছুই তো বদলায় নি, কখনো বদলাবেও না। এভাবেই ঠাণ্ডা মৌসুম আসবে, কুয়াশা বা বারিশ তাকে নষ্ট করবে না কখনো। কী অর্থ-হীন এই আরামী মৌসুম!

এখনো ফাটকের বাইরে আছি, বেঁচে আছি আমি। কিন্তু রোজ ভাবি কী এমন সুকীর্তি করেছি, যার জন্য এই পুরস্কার, আর এতে লাভই বা কী? গোলাগুলির বিরাম নেই, আওয়াজ শুনলেই নায়েমার কথা মনে পড়ে, পরক্ষণেই ভাবি প্রতি মুহূর্তের বিপদের কথা। রাতে আঁধারের দিকে চোখ মেলে তার কথা ভাবি, বেশি করে ভাবি সকালে, যখন বাচ্চারা জেগে ওঠে, তখনি যে নায়েমাকে বেশি দরকার হয়। রাতে শুতে যাই যে ব্যথা মনে নিয়ে, সকালে বিছানা ছাড়ার সময়েও তা সাথী, না হলে শীতের সকালের মত এই নীল উজলা সকাল আমার সঙ্গে দুনিয়ার মিতালি করিয়ে দিত।

জীবনটা যেন একটা অসাড়-করা খোয়াবের মত। তবে এই ভাবীকালের আশায় বসে-থাকা নসীবে যা আছে তাকে খোদার দান বলে, যা ঘটবার তা ঘটবে বলে মেনে নিতে সাহায্য করে। আজকাল ভাবতে শুরু করেছি, নায়েমার সঙ্গে এ-জীবনে দেখা হবে না আর। সে আর ফিরবে না। তবুও দিন কাটে, টিঁকে থাকি, দেয়ালের দিকে কান খাড়া করে রাখি, পড়শির কথায় আড়ি পাতি।

দিনকতক তুফানি হাওয়া দিয়েছে খুব। হেমন্তের বাদশাহি রঙ মুছে গেছে, ছাই রঙের কাল শুরু হল। গাছগুলি একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, তাদের শুকনো পাতাঝড়া ডালগুলির মাথায় কালো মেঘের ভিড়। আমার এই বেখেয়াল বেখুশি দিনেও আমি প্রকৃতির এই বদলে স্বস্তি পেলাম। হেমন্তের শেষকটা দিন, উজ্জ্বল আলোর দিন, নির্মল দিন, আমার অসহাবোধ হত।

বরসাত শুরু হল। মুক্তি পেলাম। বহুদিন ধরে চলল একটানা বৃষ্টি। শুকনো জমির ওপর গড়িয়ে চলল অবিরাম জলধারা। রাস্তায় হাঙ্গামা আপাতত বন্ধ।

রোজনামচার পাতা খুলেছি, এখনো বারিশ হচ্ছে। এর মধ্যে রোজ দোরে দোরে ঘা মেরেছি, জিজ্ঞেস করেছি আমার বিবির কোনো হদিস আছে কিনা, সময় নষ্ট হয়েছে শুধু। গতকালের কথা, মনে হচ্ছে ঘটেছে আজই। সবই পণ্ড-শ্রম হল। এখনো ময়লা আসমান থেকে জল ঝরছে নেড়াগাছে আর ময়লা

ওকামের মাথায়। হাতের নাগালে নেমেছে আকাশ, চেয়ে আছি সে-দিকে। ধোঁয়াটে রাস্তাঘাট, ধোঁয়াটে অশরীরী আত্মা চোখের সামনে ভাসে। মনের আনাচে কানাচে তখনো একরকম আশা আছে যেন, কিন্তু এমনি কোটরে সে-আশার বাস যে তাকে আশা বলতে বাধে। খাদে একখণ্ড পাথর ফেলেছে কেউ, তারই পড়ার শব্দ শুনি কানে। আমি নিজেই সেই পাথর, কোনোদিনও তল পাব না, বুকে লটকে আছে সেই আশা।

বৃষ্টিটা মাঝে মাঝে যেই ধরে, তখনই বেরোই, রাস্তায় ঘুরিফিরি। অন্যের জীবনে, অপরের সুখদুঃখে মন লাগাবার চেষ্টা করেছি, নিজের জীবনে মন লাগাবার কিছু নেই বলে। এই করে নিজেকে নিয়ে ভাবনা ছেড়েছি। তারপর একদিন ভোরের দিকে একজন এসে আমার খোঁজ করল।

সামান্য চিনি লোকটাকে। আমাকে নিরালায় টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় সে কথা কইতে শুরু করল। ও বলল যে মুচিটা খুন হবার পর ওরা একটু মুশকিলে পড়েছে। ওর দোকানটা খুব যুতসই জায়গায় ছিল, সেটা ওদের ডেরা ছিল, তবে পুলিশ তা এখনো টের পায় নি। আবার যদি ওটা ওদের গুপ্ত সমিতির আড্ডা করতে পারে তো খুব ভাল হয়।

'আপনি তো ওর দোস্ত ছিলেন, তাই না! ও খুন হবার পরদিনই তো আপনি ওর পাড়ায় খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। সেদিনের পর থেকেই আমরা একজন লোক খুঁজছি যাকে ওর জায়গায় বসিয়ে দিয়ে ঘরটা আবার কাজে লাগাতে পারি, কাছেপিঠেই থাকে এমন লোক। ঘরটা আমাদের ভীষণ দরকার। আপনি যদি···, না না তাড়া নেই কিছু! বরং ভেবে দেখুন একটু, এখুনি হাঁ না কিছু বলতে হবে না।'

লোকটাকে শেষ পর্যন্ত বলতে দিলাম, ওর কথার সারবস্তু বোঝবার জন্য। কথা শেষ হবার পর বললাম, 'চাবি আছে সঙ্গে?'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা রিংয়ে লটকানো দুটো চাবি বার করল সে। আমি ওটা নিতেই সে চলে গেল।

রোজনামচা এখানেই শেষ করছি। আমার মনে তখন আমার বিবির কথা, সেই মুচিটার কথা, আরো অনেকের কথা ভেসে উঠল। কেন জান দিল ওরা তা ওরা ভাল করেই জানত!

আমা আটা আইডু

খবর

ঘানার মহিলা সাহিত্যিক। ১৯৬০ সালে ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা 'ব্ল্যাক অরফিউস'-এ প্রকাশিত ছোটগল্প মারফত সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। ঘানার সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা 'ওকিয়াম'-এ তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আফ্রিকান স্টাডিজ' বিভাগে গবেষণা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন ও নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঘানার কেপ কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বস্তুবিদ্যা-নির্ভর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভিঘাত তাঁর একাধিক গল্পের বিষয়বস্তু। এ-গল্পে তাঁর দেশীয় বাগ্‌ধারায় লেখার ধরনটি লক্ষণীয়।

'ওরে বোন, শোন, শোন! বলব কি বোন, ওরা নাকি মেয়েটার পেট চিইরেছে।'

'বলিস কি! পেট চিইরেছে!'

'তবে আর বলি কেন?'

'আর বাচ্চাটাকে? বের কইরেছে কি?'

'হ্যাঁ, তাই তো সবাই কয়।'

'হেই, মা!'

'ওরে, শুইনিছিস নি তোরা?'

'কী?'

'ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!'

'ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্?'

'মাঁউও!'

'তা মেয়েটা আছে কেমন?'

'দেখ কাণ্ড, আমি কী করে কই! আমি তো তখন থেকেই তোর সাথে রয়েছি হেথা। কেপ কোস্টে যাবার বড় সড়ক কি আমি চিনি?'

'উম্‌ম্।'

'তাছাড়া বাঁচার কথা তো নয় । না-কাটা পেটে বাচ্চা বিয়োতেই পরাণ যায় । কাটা পেটে তো যমযন্তোনা ।'

'আহা রে মেয়েটা !'

'সত্যি !'

—ও, আমারে এট্টু একা থাকতে দে না রে ! ভেবিছিলমে এট্টু শান্তি পাব, এট্টুখানি ।

'আরে, ছোট পুটলিটা বাঁধলাম এই মাত্তর, গেল কোথা সে-আপদ ? এই, আয় আমার পাছু পাছু । আমি কেপ কোস্ট যাব, তুই সাথে যাবি ।'

কেপ কোস্ট ! সেই কবে গেছিলাম সেথা । সারা জেবন ধরে তুই আমার পাছু লেগে আছিস । আমি কী করিছি রে যে এই বুড়ো বয়সেও আমারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাবি ? তিন তিনটে বিয়েতে বসলাম, তাতেই বা আমি কী পেনু বল ? আমার বাচ্চাগুলানের এট্টাও যদি কাছে থাকত রে ! ওরা ওদের বাড়তে দিবে তো ? ক'টা ছিল রে মোর ? তাও তো ছাই মনে নাই । দশটার কম হবে না নিচ্চয় । একে একে ওদের শহরে নিয়ে গেল ওরা । মোর চারধারে ঘুরঘুর করত তারা ঘুড়ির মত । আজ মোরে যেতে হবে কেপ কোস্ট শহরে । তিরিশ বচ্ছর আমি মুখ দেখি নাই সে-শহরের । কিন্তু যেতে মোরে হবেই ! আমার বাছার পেট ফালা-ফালা করেছে যে সেথা । না যেয়ে কি পারি ? নাতনী আমার ছুরির ঘা খেইয়েছে ! না, না, মনে লব না আর সে-বিত্তান্ত । আচ্ছা, নাইয়ের উপরেও তারে চিরে নাই তো ? মনে আছে মোর, জন্মের কালে নাই-কাটার ঘা ওর সহজে শুকায় নাই । তার দাগ রইয়েছে এখনো । কত বেদনা পেইয়েছে মেয়ে । বাছারে আমার !

—বাছার দেহটা মোরে দিবে নিচ্চয় ।

'চলরে পুটলি, চল ! কেপ কোস্ট যেতে হবে মোদের ।' সঙ্গে বাছার একখান কাপড় নিইচি । মন কয় যদি লাগে ? ঐ সমুদ্দুর ধারের মানুষ কি জানে কী করনের কথা ? বাছার শরীরে আমি আনাড়ীরে হাত লাগাতে দিবই না । মন তো কয় মোরে দিবে ওর দেহখান । কী সব নিঘাম্নির কম্মো না কি করে ওরা মানুষের দেহ নিয়া । ফালা ফালা কইরে নাকি অন্যেরে কী সব শিখায় ! আরে ধনীর বরাতেও তো এর চেয়ে ভাল গোরস্থান জোটে !

মেনসিমা আসে দেখি···নুকামাও দেখি আসে···আরে, আডুয়া মীনুও তো··· এখন দেখি আসে সবাই । 'হেই বেচারা !' ডাইন, ডাইন সব ! ওদের ঘরে ব্যাঙের ছাতার মত নাতি নাতকুর গজায়, আমারে নিয়া মজা মারতে চায় বুঝি !

'এসি রে, বোন, তোর অদেষ্টে এই ছিল···'

'আহারে, মায়ের পেটটা ফালা-ফালা কইরল ওরা !'

'পেটের বাচ্চাটারে নাকি তুইলে নিইচে ।'

'মোর মেয়ের জন্য দুঃখ তোদের ? বেশ ধন্য কই।'
'বে'ইচে আচে নি কন্যা ?'
'কেমন কইরে কই ?'
'এঁস, ওরে ঘরে আন, যাই হয় হোক।'
'ভাল কইচিস, বোন। গরমেন্টের লোকে যদি দেয়, আনব তারে ঘরে।'
'তৈরি ?'
'হ্যাঁ...না...রও এটটু।'

—মোর মাথায় আর কিছু নাই, কী যেন কুরকুর করে সেথা। আর মোর পুতুলপারা মানিক! কোয়ামে হোফোর ঘরে আচে কাফন। বারো টুকরো রেশমি ক'াথা রেখিচি তাতে। এদের বরাত! হায়, ছাতু যে পইড়েছে বালির ওপর। কী আর হবে ওতে ? বেথা সময় নষ্ট কইরে কী হবে...যাই।

'হ্যাঁ, কেপ কোস্ট যাব। না, সেথা আমি কাউরেও চিনি না, কিন্তু বড় হাসপাতাল কোথা বললে লোকে কি মোরে পথ দেখায়ে দিবে না ? উম:... শ্যাষে এই দশা মোর। মনে করিচি সবই রইয়েছে বেশ। তোদের ধন্য কই। যাবার আগে মোর দোরটা দিয়ে দিস গো। কতখন আর বাইরে দাঁড়ায়ে থাকবি ? যা সব, ঘর যা। ওরে আনলে ডাকব 'খন।'

'মামি অটুয়া, যাও কোথা ?'
'কেপ কোস্ট যাইরে, মেয়ে।'
'অমন দৌড়াও ক্যান গো, বেপদ ঘইটেছে কিছু ?'
'হ্যাঁগো মেয়ে, বেপদ বড় ভারি।'
'যাও গো মা, ভগমান যাক সাথে সাথে।'
'ভাল কতা কইয়েছ গো, মেয়ে।'

'এই অসময়ে ? ঘইটেছে কী ?'
'কেপ কোস্ট যেইতে হবে।'

ক্যান গো মিত্তেনী ? সেই বিশ বচ্ছর আগে নতুন ওয়েসলিয়ান চেয়ারম্যানকে দেইখতে গেছিলাম একসাথে। ওগুরায়ার বদল হইয়েছে কিনা দেইখবারে চাও ?'
'কেপ কোস্টের সড়কে হাঁটার হাঁটুর জোর কি আর আছে, বোন ?'
'ক্যান কও ও-কথা ? বেপদ হইয়েছে কিছু ?'
'ভারি বেপদ গো, বোন। হাসপাতালে ওরা মোর নাতনীর পেট চিইরে পুতিরে বের কইরেছে।'
'এনো ভুয়ে ভুয়ে ! যাও গো, বোন ভগমান যান সাথে সাথে।'
'সুবচন কইয়েছ, বোন।'

'কী ব্যাপার ?'

ওর নাতনী—একমাত্র ছেলের একমাত্র মেয়ে। কোজো আমিসাকে মনে আছে? ঐ যে সোজায় গেছিল যে, যুদ্ধে মরল কোন বিদেশে?'

'হ্যাঁ, ওই মেয়ে।'

'আহা বেচারা!'

'কোবিনা, যা ছুটে যা রাস্তায়, ড্রাবা আনানকে বল, নানা ওটুয়ার জন্য অপেক্ষা করতে।'

'ড্রাবা আনান! ড্রাবা! মা বলল তোমাকে নানা ওটুয়ার জন্য দাঁড়াতে।'

'কোথায় সে-বুড়ি?'

'ঐ তো আসছে।'

'দেখ, দেখ, কেমন পাখির মত লাফাতে লাফাতে আসছে। বুড়ি ভেবেছে কী? ওর জন্য দিনভর আমরা বসে থাকব এখানে?'

'তোরা ডেরাইভাররা না? কাউকে মান্যি করে কথা বলিস না!'

'কেন, ডেরাইভাররা আবার কী করল?'

'এ-ভাবে কথা বলিস, অপমান হয় না তাতে? বেচারার বড় বিপদ, তাছাড়া ও তোর মায়ের বয়েসী।'

'আরে বাবা, আমি বলেছি টা কী? এর মধ্যে আবার অপমানের কী হল? কেপ কোস্ট পয়সাওয়ালাদের শহর। ওখানে যাওয়া উচিত শুধু কমবয়েসীদের। আমি শুধু তাই বলেছি।'

'তোমার কি ধারণা ও শহরে যাচ্ছে মজা মারতে? বুড়ির একমাত্র নাতনীর পেট কেটে বাচ্চা বের করেছে শহরে।'

হায় ভগবান! আহারে···বেচারা···

'বেচারা, এইসব হাল ফ্যাশানের বিবির ব্যাপার! বলি নি আমাদের মা-ঠাকুমাদের তুলনায় এরা একেবারে অপদাথ।

'উঃ! তোরা ডেরাইভাররা না?'

'কেন? হাল ফ্যাশানের বিবিরা আবার কী দোষ করল?'

'আরে, ওদের সম্পর্কে আমি যা বলি ঠিকই বলি। যাও না, যে-কোনো বড় শহরে গিয়ে দেখো। চিমড়ে, ঝাঁটার শলার মত পটপটে—এক ফুঁয়ে তেনারা উড়ে যান। বৌটিদের গায়ে মাংস বলে কিছু আছে? কাঠের চেয়ারের মত মড়-মড় করে যদি ওদের ওপর···'

'আঃ! তোরা ডেরাইভাররা না?'

'না, না, সব ডেরাইভাররাই কি···'

'আরে, আমি বেটা ড্রাবান করেছিটা কী শুনি? এই যে মশায়, এই যে পুরুষ সওয়ারীরা, বলুন, ঠিক বলি নি আমি? এইসব মডার্ন' বিবিরা, এই তো চোখের কাছেই তো নমুনা আছে, এক বৌটিও শালা ভদ্দরভাবে বাচ্চা বিয়োতে পারে না। ছ্যাঃ!'

'কী।'

'এই তো সেই বুড়ি।'

'ওরই নাতনী?'

'হ্যাঁ।'

'কি গো নানী, মোদের সাথে কেপ কোস্ট যাবা, শুনি?'

'হ্যাঁ গো, কত্তা।'

'আরে আমরা তো তোমারে ফেইলে যাচ্ছিলাম। তয় শুনি তুমি নাকি যাবা। বড় কষ্টের যাত্রা গো, বুড়িমা।'

'হ্যাঁ গো, কত্তা।'

'চেপে বইসো, চেপে বইসো গো মেয়েরা। কিনো যায়গা দেবা না বুড়িরে? আরে অমন কইরে তাকাও কেন মোর পানে, আমি কি গাছের গুঁড়ি? না, যায়গা নাই কইয়ো না। পাঁচ পাঁচ জ্বালার নানী মাগী ঐ সিটে বসবার পারে? আর বুড়ি ঠাকমা মোদের তো তেমন বহরের না। নানী, ওরা যদি যায়গা না দেয় তো আসো সামনের সিটে, মোর সাথে বসবা।'

'এই পড়ুয়া ছেইলে, যাও, পিছনে বসো।'

'দেখো, রাগ দেখিও না আমাকে। দেখেই বুঝেছি তোমরা বেকার নিষ্কর্মার ধাড়ি। ঐ যে খুব স্যুটবুটের দেমাক দেখাচ্চ। ওতো ধার করা।'

'আঃ, তোরা ডেরাইভাররা না!'

তোরা ডেরাইভাররা না।

পড়ুয়া ছেলেটা টেলিগেরাম পইড়ে কইল, ও-কাগজ নাকি তেরাত্রি আগে লিখা। তিনদিন…তিনরাত…হাই মোর ভগমান, ওয়ারে গোর দিয়া ফেইলেছে না কি? কোথায় দিছে? নাকি ঐ যে ওরাকয়…কাটাছিঁড়া কইরেছে? ওঃ না না, মনে লব না সে-বেত্তান্ত…মনে লইলে যদি কিছু অঘটন হয়! এগারটা, নাকি বারো … এফুয়া পানিইন, ওকুমা, কোয়ামে গিয়াসি…আর, আর কে? হেই মা, সে কোন আদ্যিকালের বেত্তান্ত গো। আঙুলে গুইনবার পারি না। কিন্তুক ওরা মোর কাছে রেইখে গেল না কেন রে ছানাপোনাগুলি!

আহ, উলটি আসে কেন রে? বিলাতি মোটর তেলের কী গন্ধ গো! এখনে মোর মনে পড়ে, যুবতি বয়সে আমি মামালরির চরবার পারি নাই গন্ধে। কেবলি বমি কইরেছি। আ মরণ, এখনে আমি যমের অরুচি, এখন নিচ্চয় হবে না তেমন দুগ্গতি। এই ছোঁড়াগুলি তইলে কবে বুড়ি আর পারে না, হাইসবে খানিক খুব। আহারে, পুতুলের পারা পুতি মোর জিত্তা আছে এখনো, এইটুকু যদি জানতাম, তাইলেই তো হইত ভাল! কত ছোট ছোট দ্রবি্য মোরে পাঠায়েছে মোর নাতনী, মাঝে মাঝে ঐ মেনসিমা আর নকানসারা এমন করে না! আমি যেন এক নিস্ফলা মাগী! আরে মোর একটা তো পুত ছিল, সেই কোনখানের মরণ তারে টেইনে নিয়ে গেল…

আমার কানের দুল, বালা আর হার, অডুওমোফো আটা মোরে গড়ায়ে দিছিল,

তা আমি ওরে দিব না। কী বাহারের, কী দামের গয়না, আমার শেষ সম্বল গো। মইরবো আর বাদে কাল, তাতে দুখ নাই কোনো। তখর ওরা, ওদের ছেইলে-মেয়ে কাড়াকাড়ি করে করুক তা নিয়া। আমার সন্তানগুলিরে গিলে খেইয়েছে কেন উয়ারা! আজ আর আসে যায় কিসে? আমি যদি অন্য মানুষের মত হতাম তো মরণের আগে দিয়া দিতাম সব। কী আর আসে যায়। শাপতাপে ভাগ বসাক এখন ওয়ারা। শেকড় সাথ সব শুকোয়ে যায় আমার···ঐ যে চেরকালের মরণ, শয়তানী করবা করে, সেপাই-ইন্দুরের পারা দাঁত বসায় আমার পেটের মাঁঝখানে। সব শেষ হইয়েছে আজ। শুষে নিইয়েছে সব। বাড়তি রস, শুখো আখের ছিঁবড়া, শুখো কাঠি খাটি দিয়া ফেইলেছে আগুনে, চুল পোড়ে···কী পোড়া গন্ধ বার হয় গো।

'নানা, চোখুখের জল ফেইলো না গো।'

'আরে, বুড়ি কান্দে নাকি?'

'তোমার একমাত্তর ছাওয়ালের একমাত্তর মেয়ে মরলে তুমি কাঁদবা না?'

'আরে আমারে কও ক্যান ও-কথা। আমি কি জানি, তোমার নাতনী মরে?'

'জানো না? এতক্ষণ ছিলা কোন ঠাঁই। এই লরিতেই তো আছ, শোনো নাই কী নিয়া কথা কই?'

'অন্যের কথায় আমি কান দেই না।'

'তাতে হইয়েছেটা কী?'

'আরে মর, আল্লাইরা কথা কয়।'

'এই এই। আমার লরিতে ঝগড়া করা চইলবে না।'

'দেখ না জ্বাবা, এইখেনে বইসে আছি চুপ কইরে, এই ধুমসি মাগীর বড় বাড় হইয়েছে, আমারে ও···'

'দেখো, শরীল আস্ত থাইকবে না কিন্তুক!'

'বটে, মারো দেখি মোরে, দেখি সাহস কত!'

'এই এই, সভ্যতা শিখ নাই তোমরা?'

'চুপ যা দুইজনে, নামায়ে দিব কিন্তু নইলে।'

'ও নানা, কাইন্দো না। ওপরে ভগমান আছেন।'

'সুবচন কইয়েছ, কত্তা।'

'আরে কেপ কোস্ট তো এইসে গেছে দেখি!'

—মিউয়ো! ভগমান গো, শক্ত কইরে ধরো গো মোরে, নইলে কী হবে জানে কোন মানুষ?'

'কত্তা, নামব গো হেথা।'

'নানা, তুমি তো হাসপাতালে যাবা কইয়েছ। আমরা অন্দরে আসি নাই এখনো।'

'এইখানে নেইমে যদি লোকেরে জিগাই তো···?'

'নানা, তুমি শহরের মানুষেরে চেন না। বড় দেমাকী গো তারা. বসো তুমি, আমি তোমারে সেথা নিয়া যাবো 'খন।'

'তুমিও কি সেথা যাবা, কত্তা ?'

'না গো, তবু নিয়া যাবো তোমারে।'

বুড়িমার আশিস লও. কত্তা। আমার মরণের খবর পাইলে চক্ষের জল ফেইলো না।

বুড়িমারে ধন্য কইরেছ তুমি. কত্তা।

—আমি জানি মড়াগো ওরা কোথা যেন রাখে, যতখন বাড়ির লোক না আসে। আর যদি ওরা গোর দিয়া থাকে তো ওর মরদেহ খুঁইজব আমি। এসি আমফোয়া, কেন এইসেছিলাম জগতে গো। সবগুলান বেটাবেটিকে মাটি চাপা দিয়েছি আমি, এখন দিতে হবে মোর নাতনীরে!

'নানা, এসে গেছি মোরা!'

'এই বুঝি হাসপাতাল ?'

'হ্যাঁ গো নানা, তোমার নাতনীর নাম কী ?'

'এসি আমফোয়া, আমার নামে ওর নাম রেইখেছিল ওর বাপ।'

'ওর ইংলিশ নাম জান না তুমি ?'

'না গো, কত্তা।'

'ওর কবে কী…?'

'এই যে গো মা, আমরা একজনেরে খুঁজতে এইসেছি।'

খুঁজতে এসেছ ? তা পড়তে জানো ? জানো না ? তবে কাউকে জিজ্ঞেস করে হাসপাতালের নিয়মকানুন জেনে নাও। তিনটের আগে তো রুগীর সঙ্গে দেখা হবে না। ভিজিটিং আওয়ার্স…'

'দয়া করো গো জননী। আমার নাতনীরে…'

'ওসব নাতনীটাতনী জানি না বাপু…'

'নানা গো, ধৈর্য ধরো। কেঁইদো না।'

'বুড়ি. কাঁদছ কেন এখানে ? কান্না বারণ, এখানে কাউকে শব্দ করতে দেওয়া হয় না, বুঝেছ ?'

'অপরাধ হইয়েছে গো জননী। ও যে আমার সোনামণি ছিল গো।

'কার কথা বলছ ? ও, তুমিই সেই ? ত. কার যেন খোঁজ করছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে ?'

'আমার নাতনী—আমার ছেলের একমাত্র মেয়ে।'

'ও। তা তার নাম কী ?'

'এসি আমফোয়া।'

'এসি আমফোয়া! মাপ করো বুড়ি, ও-নামে কেউ এখানে নেই।'

'কী কও তুমি !'

'না না, তোমারে তো বলছি, এখানে উনারা শুধু ইংলিশ নাম জানে ।'

'কন্তা, তবে কীর কী কও ?'

'কী অসুখ হয়েছিল ওর, তোমার নাতনীর ?'

'বাচ্চা বিয়োতে এইসেছিল গো । তারপরে নাকি সবাই কয় ওর পেট চিরে বাচ্চা বার কইরেছে ।'

'ও, বুঝেছি ।'

ভগবান গো, শক্ত কইরে ধরো আমারে । কিছু যান না হয় মোর ।

'বুঝেছি, ঐ সিজারিয়ান কেসটা ।'

'এই যে নার্স, জানো নাকি ঐ সিজারিয়ান ·'

যদি ওরে নিয়া যাই তো আনোনা এবং ইয়ায়ো বইলবে আমার পরিবারের জইন্য সবুর করল না বুড়ি, একাই নিয়া গেল ।

'হ্যাঁ, তুমি কি ওর ভাই ?'

'না, আমি ড্রাইভার, বুড়িকে সঙ্গে নিয়েসছি ।'

'ওর আত্মগোষ্ঠির কাউকে আনে নি ?'

'না, ও একাই এসছে ।'

আশ্চর্য, গাঁয়ের লোকে তো তা করে না কখনো !

ওরে এখনো কাটাছেঁড়া করে নাই তো ?

'বুড়ি ভবে কলা, কাসাভা আর কেংকে এনেছে তো ?'

'না, শুধু একটা পুটলি এনেছে সঙ্গে ।'

'আমার সঙ্গে এসো । গোলমাল কোরো না কিন্তু । এখন তো ঠিক দেখার সময় নয় ।'

'কত্তা, ওরা মোর নাতনীরে চেনে তো ?'

'হ্যাঁ ।'

শুইনেছি যে-ঘরে ওরা দেহ রাখে সে নাকি হিম ঠাণ্ডা ।

বাচ্চাদের খাবার সময় বুড়ো এসে আমফোয়া নাতনী এসিকে দেখল, নাতনী শুয়ে আছে, ছিমছাম সাদা চাদরে শরীর ঢাকা । চাদরের তলায় নিপুণ সেলাই বুড়ি দেখতে পেল না । 'মেয়েটার লোহার শরীর,' যমজ সন্তান বের করবার সময় ডাঃ পিযামফি বলেছিলেন ।

মেরি কুমসন ওয়ার্ড থেকে এসে আমফোয়ার মুখ দেখল বুড়ি ।

বুড়ি ভিখারির মতন খেয়ে ঘরে ঢুকে নাতনীর বিছানার পাশে পড়ে গোঙাতে লাগল, চেঁচালো না গাঁয়ের মানুষের মত । আহা, কাঁদবে না, শেষ ভাণ্ডটা যে ভেঙে গেল শুধু ।

হঃ ! এইখানে হাসপাতালে সবাইকে কাটাছেঁড়া করে না পড়ুয়া পড়াবার জন্য ? ঈশ্বর জেগে গেলেন । ছোট এসি আমফোয়া কথা কইছে ! এবার বুড়ি ডাক

ছেড়ে কেঁদে উঠল ।

ক্লেসি গ্রিসন, কেপ কোস্টের দ্বিতীয় প্রজন্মের আলোকপ্রাপ্তা ছাত্রী-নার্সটি বলল, 'এই গেঁয়ো ভূতগুলো…,' হাসির দমকে তার দেহলতা দুলে উঠল ।

জুনো আনান চোখ দিয়ে ক্লেসি গ্রিসনকে যাচাই করল: ইউনিফর্ম, এপ্রন, ক্যাপ— সব হঠাৎ নস্যাৎ করে মনে মনে বলল, 'কাসাভার কাঠির মত চেহারা, ছ্যাঃ !'

বিছানার পাশে নড়ে ওঠে দাঁড়াবার জন্য প্রাণপনে লড়ছিল । তার শেষ ডান্ডাটি ভাঙেনি ঘা খেয়েও !

লিউইস ন্কোসি

পটগিটার্স কাস্‌ল

১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে জন্ম। জোহান্সবার্গ থেকে প্রকাশিত 'ড্রাম' ও 'গোল্ডেন সিটি পোস্ট' পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করেন কিছুকাল। ১৯৬১ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান সাংবাদিকতা সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে। সেখান থেকে লন্ডন যান এবং এখনো সেখানেই সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সমালোচনা পেশা নিয়ে আছেন। ব্রিটিশদের ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেলিভিশনের পক্ষে বহু আফ্রিকান সাহিত্যিককে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে তাঁর 'দা রিদম্ অফ ভায়োলেন্স' নামক বর্ণবিদ্বেষ-ভিত্তিক নাটক প্রকাশিত হয়। 'হোম অ্যান্ড এক্সাইল' নামক এক সমালোচনা-গ্রন্থও প্রকাশিত হয় সে-বছরেই। শুধুমাত্র রাজনীতিক সাহিত্যচর্চাকে তিনি সঙ্গত মনে করেন না। তাঁর সমালোচনায় দক্ষিণ আফ্রিকা অপেক্ষা পশ্চিম আফ্রিকার সাহিত্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান গল্পটি বর্ণবৈষম্যনীতি নিয়ে লেখা।

গরমকালের কাঠফাটা রোদে বেলাজ বেপরোয়া আফ্রিকানদের নিয়ে একটা ট্রাক বোঝাই হয়ে যাচ্ছে ওরা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে। কোথায় যাচ্ছে, ভাগ্যে কী আছে, ওরা জানে না, শুধু তাকিয়ে দেখে পেছনে দ্রুতবেগে মাটি সরে যাচ্ছে। হাতে কেরি এবং আসেগাই নিয়ে খাকি সার্ট-প্যান্ট পরা একটা ভয়দর্শন কালো লোক তাদের পাহারা দিচ্ছে। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা, কুৎসিত থ্যাবড়া ফোসকা-পড়া পা-দুটো সামনে বেরিয়ে আছে। চোখ লাল, বিচ্ছিরি বিষণ্ণ, বহু হত্যা-কাণ্ডের সাক্ষী নির্মম মানুষের চোখ সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। উন্মত্ত যুদ্ধ-নৃত্যের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে যেমন শয়তান, লোকটার আকৃতিটা সেই রকম দেখতে। থেকে থেকে কেরি দিয়ে লোকগুলো বা ছেলেগুলোকে গুঁতিয়ে তার সঙ্গে বিড়বিড় করে অবোধ্য কী সব বলে তারপর আবার ট্রাকের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকা — এই ছিল তার কাজ।

পাশে অফিসের অন্য পাহারাদারটি ট্রাকের সামনে মোটাসোটা খামার-মালিকের সঙ্গে বসে আছে। সারাদিন ধরে ট্রাকটা চলেছে, শুধু পেট্রোল স্টেশনে আর রাস্তার পাশের খাবারের দোকানে অল্পক্ষণের জন্য থামা ছাড়া। খাবারের দোকানের সামনে ট্রাক থামতেই খামার-মালিকটি নেমে পেছনে এসে বন্দিদের

শারীরিক অবস্থা দায়সারা ভাবে লক্ষ্য করেছে। প্রতিবারই গাড়ির ওপরের পাহারাদার জুমাকে কী যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে দোকানে ঢুকে মিনিট কয়েক পরে প্যাকেট-ভর্তি খাবার নিয়ে এসেছে পাহারাদার দুটোর জন্য। তারপর নিজে গিয়ে সেখানে ঢুকেছে, আধঘণ্টাটাক পর পেটপুরে খেয়ে বেরিয়ে এসেছে। খানাপিনার ফলে মুখ লাল টুকটুকে হয়েছে। বন্দিদের চোখের সামনে পাহারাদার দুটো গোগ্রাসে গিলেছে খাবার; অভুক্ত বন্দিগুলো খিদের জ্বালায় তখন আস্ত তিমি মাছ গিলে খেতে পারত। খেয়েদেয়ে কদর্য লোকদুটো প্যান্টের সামনের বোতাম খুলে রাস্তার ওপরই পেচ্ছাপ করেছে।

ট্রাক বোঝাই বন্দি মানুষগুলোকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় নি। সমস্ত পথ ধরে পুরো একটা দিন ওদের ট্রাকের পিছন দিকে একটা লোহার খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। দেহের প্রাকৃতিক কাজে বাইরে যেতে চাইলে গার্ডদুটো কেরির গুঁতো মেরে বলেছে, 'ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে মুততে পারিস না, শালারা! বেটা সব নবাবপুত্তুর!' একের পর এক শিকের ভেতর দিয়ে ঐভাবে কাজ সেরেছে। লালমুখো নীলচোখো খামার-মালিক লোমশ হাতে স্টিয়ারিং ধরে এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছে পেছনে ধুলোর মেঘ তুলে। ঝাঁকুনির চোটে রাস্তায় জল আর তেল ছলকে পড়েছে। আর সব ছেলের মত সিপোও জানে না তারা কোনদিকে যাচ্ছে, বাড়ি থেকে কতদূরে এসেছে তারা। বয়স্করাও এ-ব্যাপারে কিছু জানে বলে মনে হল না। মন থেকে ভয় তাদের চলে গেছে, একটা জড় হতাশা তাদের সবাইকে আচ্ছন্ন করেছে। কেমন সে-ভুঁই যেখানে ওদের নিয়ে যাচ্ছে ওরা, কেমনধারা মানুষ থাকে সেখানে তাদের নিয়ে ওরা কী করবে, এসব ভেবে কূলকিনারা পেল না ওরা।

ট্রাকের এক কোণে বসে একটি মানুষ কী ভাবে তাকে পাকড়াও করা হয় তার কথা বলছিল। 'ভাইরে, সে কী পেল্লায় কাণ্ড, আমি ভাল করে বুঝোয়ে বলতে পারব না। সে-বে ব্যাপার, চারদিকে মনিষ্যিরা ছুটতে লেগেছে, মেয়েগুলো চেল্লাচ্ছে, বাচ্চাগুলো কাঁদছে, সমস্ত সোফিয়া টাউনে এক তুমুল ব্যাপার। কালা মারিয়াদের নিয়ে পুলিশ হামলা করল, আমাদের শ'দুয়েককে ধরে গারদে পুরলো। "শালা যত বছরই লাগুক, এ-হরতাল আমরা খতম করবই"—বলে চিৎকার করতে লাগল। থানায় নিয়ে আমাদের লোফার বলে দাগী করল। জোর করে ঐ খামার-মালিকটার সঙ্গে চুক্তি সই করালো; আমরা ওর বন্দি গোলাম বনে গেলাম।' প্রত্যেকেরই ইতিহাস ঐ একই রকম। জুমা এতক্ষণ ট্রাকের পেছনে বসে সব শুনছিল, হঠাৎ বিরক্ত হয়ে গলা ফাটিয়ে বলল, 'চুপ কর শালা বেজন্মার দল! কানে তালা লাগিয়ে দিল!'

একটি রোগামতন লোক তিক্ত বিষাক্ত গলায় বলল, 'এইসব দালালের দল সাদাদের পা-চাটা কুত্তা। দিন যখন আসবে তখন এদেরই গর্দান যাবে পয়লা দফায়।

জুমা উঠে দাঁড়িয়ে কেরিটাকে নাচাতে নাচাতে বলল, 'কে? কোন হারামজাদার

মুখ থেকে একথা বেরলো ? কে সে বল ? শালার খোয়াব দেখা টের পাওয়াচ্ছি আমি । গর্দান যাওয়াচ্ছি ! কে ? কোন বাঁদর-পোর মুখের গলা থেকে বেরলো কথাটা ?' কেউ জবাব দিল না ; কিন্তু হাঁপিতম্বি সত্ত্বেও বোঝা গেল জমাদার ভয় পেতে শুরু করেছে । হাতে কোঁৎকাটা যেন ভারি মনে হল, আস্তে আস্তে নামিয়ে নিল ও । তখনো খুঁজে দেখছে মুখ দেখে যদি বোঝা যায় কার এমন দুঃসাহস । কিন্তু ওদের মুখে কোনো হদিস পেল না তার; পাথরের তৈরি বোবা মুখ সব।

এত গাদিয়েছে ট্রাকটাকে, অনাত ক্লান্ত শরীরগুলি থেকে ঘামের গন্ধ নাকে এসে ঢুকছিল । সমস্ত বাতাস সেই বিরক্তিকর গন্ধে ভরে উঠেছিল । বয়স্কদের মধ্যে যারা আগে জেল খেটেছে, ভাবছিল এবার বোধহয় যন্ত্রণার একশেষ করে ছাড়বে । ঘৃণায় কুঞ্চিত ঠোঁট তাদের; ঠাণ্ডা কঠিন চোখে তারা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে । কাউকে কিছু বলতে হলে চাপা গলায় মরীয়া হয়ে নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করছে, পাহারাদারকে টেক্কা দিয়ে ।

'চোপ শালা রেজিস্টার দল,' দলের মধ্যে একজন, মুখে অসংখ্য আঘাতের দাগ, চোখ কুঁচকে পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীব সঙ্গে চাপা বিষাক্ত স্বরে কথা বলেই চলল। কাড়ি বছর ধরে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা আর দল থেকে পালাবার চেষ্টা তাকে ঐ রকম বিষাক্ত করে তুলেছে । কোঁৎকা গুঁতো মেরেও ওদের থামানো যাচ্ছিল না । চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মরীয়া হয়ে পাহারাদারের মুখে থুতু ছিটিয়ে তারা জবাব দিল । পাহারাদারটি যেন এই চাইছিল । অদ্ভুত এক হাসি-মাখা মুখে সে ওদের দিকে চাইল, তারপর ওর কালো চোখের গর্ত থেকে ঘেন্নার আগুন জ্বলে উঠল । 'শুয়োরের বাচ্চা, কালা আদমী ! আজ তোদের এমন শিক্ষা দেব যে জিন্দা থাকতে তা ভুলতে পারবি না !' চোখের হলকায় লোকদুটোকে ছ্যাঁকা দিতে লাগল সে, কিন্তু টলল না । ওখান থেকেই বলল, 'থামা তো দল শালারা, দেখি তখন মুখে কেমন চিড়িয়ার বুলি ফোটে, দেখিয়ে দেব শালা কোথায় যাচ্ছিস ! একটা ছেলেকে ষাঁড়ের তলায় পেষানো হয়েছিল বুঝলি, কুত্তা ! দোস্তদের জন্য চমৎকার নিরিবিলি যায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, দেখবি !' লোকদুটো এ-শাসানিতে ভ্রূক্ষেপও করল না, ওদের সাথীরা অবশ্য ভয়ে আতঙ্কে কাঁপছিল । বুঝতে পারছিল কী দশা হবে তাদের শেষে । আঃ, লোকদুটো থামে না কেন, কী লাভ গার্ডটাকে খুঁচিয়ে ! সবাই একই কথা ভাবছিল ।

বাকি পথটা সবাই চুপচাপ, শুধু ইঞ্জিনের একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দ আর রোদে তেতে-ওঠা রাস্তার ওপর টায়ারের ফ্যাসফ্যাসানি শোনা যাচ্ছিল । মাইল পঞ্চাশেক যাবার পর সিপো সমেত প্রায় সব বন্দিই খানিকটা থিতিয়ে এসেছিল । না, ভয় ঘুচেছে বলে নয়, নিছক ক্লান্তি, অনাহার আর একভাবে বসে থাকার জন্য । সমস্ত যন্ত্রণা, ভয়, হতাশা একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকস্থলীর ভেতরে চাপ দিচ্ছিল, মাংসপেশিতে একটা নিরাকার ব্যথাকে ভারি করে তুলছিল । হাঁটুতে মুখ গুঁজে যতক্ষণ বসেছিল ততক্ষণ তারা একধরনের আরাম বোধ করছিল,

পেশির টানটান ভাবটার কিছুটা লাঘব হচ্ছিল। কিন্তু সিপো জানত কখন আবার ভয় ফিরে আসবে; যেই তাদের দাঁড়াতে বলা হত তখনই ওরা জানত ওদের পা আর দুর্বল হাঁটু ওদের শরীরের ভার বইতে পারবে না, কাঁপতে থাকবে তাদের শরীর, হাতের তালু ঘেমে উঠবে উদ্বেগে। তবু কিছুক্ষণ বাকি আছে সেই সময় আসার। মৃত্যুহীন মহিমময় শূন্যে আকাশ চাঁদোয়া মেলে ধরেছে, মাথা উঁচিয়ে সেইদিকে ওরা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

গাড়িটা একটা নদী পার হচ্ছে, কাদাগোলা জল, স্রোত বলে কিছু নেই। নদীটাকে পেছনে ফেলে ট্রাকটা ভয়ংকর ভাবে চড়াই পার হয়ে বিপজ্জনক রাস্তা ধরে উঠে চলল। দু'পাশে হাঁ-করা নালীখাত নদীর কিনারা অবধি নেমে গেছে। ওপরে উঠে আবার সেই একঘেয়ে শুকনো তৃণভূমির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলা। মাঝে মাঝে রাস্তায় ছোট ছোট খেতখামার। আবার ভুট্টার বিরাট খামারও চোখে পড়ছিল। সেসব খামারে যুবাবৃদ্ধের দল হলুদ রোদে খাটছিল। তাদের দেহ প্রায় উলঙ্গ। বস্তার ভেতরে মাথার জন্য একটা বড় আর হাতদুটোর জন্য দুটো ছোট ছোট ফুটো করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে গায়ে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে শ্বেতাঙ্গ খেতমালিকদের দাঁড়িয়ে থাকতে, খেতমজুরদের ক্রমাগত চেঁচিয়ে কী যেন বলে যাচ্ছে, গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজে তা বোঝা যাচ্ছে না। কখনো কখনো কৃষ্ণাঙ্গ সর্দারদেরও দেখা যাচ্ছে কোনো না চাবুক হাতে, লোকগুলোকে পশুর পালের মত খেদিয়ে নিয়ে যেতে। ভয় নয়, একটা অবোধ্য কোনো অনুভূতি; অদ্ভুত এক নরকের গভীর গহ্বর থেকে উঠে-আসা এক বান-মাতানো বীভৎস একটা চিৎকার? দুঃস্বপ্ন যেন সেসব খামারের চারপাশ ঘিরে মজুর আর গলা-ফাটানো মালিকদের ঘিরে রয়েছে। শুষ্ক নির্বোধ এক হিংসা আর হতাশা —একটা আকৃতিবিহীন ক্রোধ, একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা পারিপার্শ্বিক আর মানুষী নিষ্ঠুরতায় গড়া এই পরিমণ্ডলকে ছেয়ে আছে এখানকার মাটিতে, এ-মাটিতে জন্ম নিয়েছে সকল শাসনকর্তা, আর শূন্য ভয়ংকর মানুষী দুর্দিন। গ্রীষ্মের তাপও যেন এখানে ততটা প্রখর নয়, শুধু তা আরো জমাট, আরো শরীরী এবং অশেষ; নিদ্রাহীন, সর্বৈব রূপ গ্রীষ্মকালে এক মনোবিকার দিয়ে সেই শরীরী তাপ জায়গাটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই বিকারের আদিম শক্তি মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সৃষ্টি করছে এক বীভৎস প্রজন্ম, মানুষকে দাস বানিয়ে ওরা চাবুক হাতে তাড়া করে মাটির ওপর পায়চারি করছে।

নদী পার হতেই ট্রাকের ভেতরে সকলেই পরিবেশে একটা পরিবর্তন অনুভব করল। মুহূর্তে তারা বুঝতে পারল তারা ভুট্টা-ত্রিভুজ অঞ্চলে আর রৌদ্রস্নাত কবরখানাতে প্রবেশ করেছে। এ-সবকিছু কিসের ইঙ্গিত বহন করছে জানা সত্ত্বেও লোকগুলো ভয়ে আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেল। দূরেই তারা একটা মোড়ে এসে পৌঁছল, গাড়িটা হঠাৎ ডানদিকে সরু রাস্তাটা ধরে একটা বিরাট লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। কালো পাহারাদারটা লাফিয়ে নেমে লোহার গেটটাকে সশব্দে খুলে দিল। সিপো গেটের ওপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা

'স্বত্বাধিকারী—পি. জে. পটগিটার' নামটা পড়তে পারল। গাড়িটা গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই ও বোধ করল যেটুকু মানবিক অধিকার ওর ছিল তা আজ সে নিঃশেষে হারালো। ও এখন মিঃ পি. জে. পটগিটারের সম্পত্তিমাত্র। অন্যরাও নিশ্চয় এমনি বোধ করছিল, তাদের মুখ দেখেই তা টের পাওয়া যাচ্ছিল, অদূর ভবিষ্যতের অজানা আতঙ্কবাধা সর্বনাশের কাছে ভীত আত্মসমর্পণের ভাব তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল। গাড়িটা শেষপর্যন্ত থামল সারি সারি কয়েকটা খামারঘরের সামনে। বাতাস খড়কুটো, গরু, গোবর, শস্য, কাঠ ও মাটির গন্ধে ভরপুর।

চিৎকার চেঁচামেচি হুলুস্থুল কাণ্ড করে গার্ডদুটো ট্রাকের পেছনটা খুলে দিল। টেনে টেনে লোকগুলোকে নামানো হল। কেউ কেউ ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেল। আকাশ তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। সারি সারি ওদের দাঁড় করানো হল গণনার জন্য। সামনের উপত্যকা থেকে অন্ধকার ঢালের গা বেয়ে ধীরে উঠে আসছে মনে হল তাদের। আঠাশটি প্রাণী দাঁড়িয়ে রইল, সন্ধ্যাবেলা প্যাচপ্যাচে গরমে [illegible] প্রাণীর, ভুট্টা আর আলুখেত থেকে উঠে-আসা বাষ্পীয় উত্তাপে বাতাস আরো ভারী হয়ে উঠেছিল। অপচয়িত যৌবনের মূর্তি, অর্ধমৃত মানুষের দল কসাইখানার ভেড়ার পালের মত অপেক্ষা করতে লাগল এবার তাদের কী করতে হবে (অর্থাৎ তাদের নিয়ে কী করা হবে) জানবার জন্য। সাদা খেত-মালিকটির সামনে তারা দাঁড়িয়ে আছে, গুণতি করবে সে। দু'পাশে হাতদুটো ঝুলে পড়েছে, পা-দুটো চাপা, পাকস্থলী যেন নাভিকুণ্ডলের কাছে উলটে আছে। একসারি কদর্য-দর্শন প্রেতাত্মা সামিল মানুষ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে-থাকা রুগ্ন তাদের চোখ; নাক মুখ দিয়ে সমানে নিশ্বাস নিচ্ছে তারা। কেউ কেউ মরীয়া হয়ে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, অভুক্ত ক্লান্ত একপাল মানুষ। কী করতে হবে তাদের জানে না তারা, কেউ তা বলেও দিচ্ছে না। প্রহার ছাড়া পাহারাদার দুটোর অন্য কোনো ভাষা জানা আছে বলে মনে হয় না, থেকে থেকে কারণে অকারণে কোঁদার গুঁতো, বুটের লাথি চলছিল, এসবই ওদের একমাত্র প্রাপ্য, শয়তানদুটো সে-বিষয়ে পরম নিশ্চিত ছিল। মানুষের সমাজে তাদের এই খবরদারি যেন বিধিনির্দিষ্ট। শ্বেত প্রভুকে তাঁর সদ্য-পাওয়া মাল গুণতির ব্যাপারে সাহায্য করতে করতে তারা ফাঁকে ফাঁকে তাদের তর্জন করছিল।

খামার-মালিকটি হাতে একটা নামের তালিকা নিয়ে কেঠো গলায় সমস্ত উপত্যকা আর তৃণভূমি কাঁপিয়ে চিৎকার করে নাম ডাকছিল :

'জালিমান !'

'হাজির।'

'কোসানা !'

'হাজির।'

'জেমস ! সোলোমোন ! ডেভিড ! শালা কাফির কুত্তা, বাইবেল থেকে নাম

রাখিস তোরা, অ্যাঁ! সোলোমোন! সাহস কত! নরকের কীট, জংলী ভূত কোথাকার!' পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক হ্যায়, নে এবার এদের খেদিয়ে নিয়ে যা!'

গরুর পালের মত কেরি দিয়ে পেটাতে পেটাতে যমদূতে দুটো বিরাট লোহার দরজা খুলে একটা প্রকাণ্ড গুদামঘরে ওদের নিয়ে এল। ঘুলঘুলির মত গোটা কয়েক জানালা তাও জেলখানার মত শিক দিয়ে গাঁথা। ময়দার বস্তার মত ওদের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল ওরা, চারপাশটাকে ভাল করে বুঝে ওঠবার আগেই। সারারাত পড়ে থাকবে। রাগে দুঃখে আত্মাভিমানে তারা জ্বলতে লাগল, দেওদুটোর চোখে মানুষী অনুভূতির কোনো চিহ্ন আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু আধো অন্ধকারে ওদের গরিলার মত কালো ষণ্ডা শরীর আর হাতে কেরির নড়ন ছাড়া কিছুই ঠাওর করতে পারল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা পাহারাদারের বিরাট শরীর সন্ধ্যার ফ্যাকাসে আলোতে সিলুয়েট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘ্যা ঘেরে চামাড়ে গলাতে সে হাঁকল, 'শোন, ছুঁচো-খেকো কুত্তার বাচ্চারা, যা বলছি খেয়াল করে শোন!'

ও জানতে পারল না ওর গলার স্বর আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে — অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা তাতে, এমন কি ওর হাত-পাগুলোও যেন শিথিল হয়ে গেছে। হাত থেকে কেরিটা মাটিতে পড়ে গেছে, সেটাকে তুলে নিয়ে থেকে থেকে মেঝেতে ঠুকতে লাগল হুকুম দেবার সময়। 'এখন থেকে তোরা পটগিটারের সম্পত্তি, বুঝেছিস?' গলাটা নরম হলেও ভেতরের পশুত্ব তাতে চাপা পড়ছিল না। পটগিটারের খামার ছুটিতে বেড়াবার যায়গা নয় যতদূর জানি। তোদের এখানে কেউ কেক বিস্কুট খেতে দেবে না, খাটতে খাটতে জিব বেরোবে দেখবি। ভোর চারটেতে একটা ঘণ্টা বাজবে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াবি কিন্তু। বেশ লার্ক পাখির মত শিস দিতে দিতে আসবি, বুঝলি,' লোকটা এখানে একটু থেমে আবার বিষাক্ত রুক্ষ গলায় বলল, 'তারপর লাইন করে দাঁড়াবি বস্তা নেবার জন্য। লোক এসে নিয়ে যাবে ভুট্টাখেতে, সেখানে ভুট্টা তুলবি।'

লোকটা এখানে আবার একটু থেমে খ্যাঁক খ্যাঁক করে শয়তানি হাসি হেসে বলল, 'দেখাবি তোরা, শালা আর মেশোয়েশোয়ের বীর সন্তান, এই তো সুযোগ! সূর্য্যি হীরের মত ঝকমক করবে, সামনে পিতিপুরুষদের আমলের সেপাইয়ের মত দেখাবে ভুট্টাগাছগুলো। হাতে কাস্তে নিয়ে শালার লড়াকুদের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বি। দেখে নিস, কত বড় সুযোগ,' বলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল, কেউ তার রসিকতার জবাব দিল না অবশ্য। তাই পেটে গুঁতো খাওয়া লোকের মত ক্যাক করে হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে দিল।

'কি রে হাসলি না যে? অবিশ্যি হাসির কিছু নেই এতে, মজাদার কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, এটা নরক, জাহান্নাম। শালা রোদে পুড়ে শরীর তামার মত তাতবে, বাতাস যেন ঠায় দাঁড়িয়ে। হ্যা…হ্যা… তোদের কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না, এক দণ্ডের জনাও নয়। তোদের নড়তেই হবে।

কেন জানিস? জানবি কী করে! আমি বলছি কেন। আমি আর জ্যাক, মানে ঐ ওটা—দুজনে তোদের পিছনে দাঁড়িয়ে কোরি আর লোহার কাঁটা দেওয়া চাবুক দিয়ে তোদের মনত দেব, বুঝলি! শ্যামচাঁদ, বুঝলি একেই বলে শ্যামচাঁদ' হঠাৎ লোকটা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে সবাইকে চমকে দিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরেই আবার সেই গভীর ভয়।

'শ্যামচাঁদের কথা আগে বলি নি, তাই দেখবি এবার। গরুর লেজ নুনজলে ডুবিয়ে রাখা হয়, এক ঘায়ে তা চামড়া তুলে আনে। যাকগে, বলে লাভ কী আগে থেকে। কি আমার বক্তিমে শুনে কান পচে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? না, দেখ আগেভাগে পষ্টাপষ্টি বলে রাখাই ভাল. এতে সম্পর্কটা ভাল থাকে, বেশ খোলসা হয়ে যায় সব, তাই না? [illegible], রোজ তিন পাউন্ড করে মজুরি পাবি, আর বিনে পয়সায় প্রচুর টাটকা হাওয়া।'

চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও কেউ টের পায় নি যে ও আর নেই, একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। [illegible] থেকে বাঁধন খুলে দেওয়া হল, তবু ওদের মনে হল এখুনি আবার সেই লোকটা এসে দাঁড়িয়ে [illegible] করতে থাকবে। হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ওদের মধ্যে একজন ছিল খৃস্টান, সে হঠাৎ প্রার্থনা শুরু করল। [illegible] মানুষগুলো [illegible] কোথাও কষ্টের আছে কিনা বুঝতে পারল না। জানত না ওরা এ-ব্যাপারে, অন্য ব্যাপারেও, আরো কী বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্য!

সিপ্রিয়ান একওয়েন্সি

নর্তকী

কথাসাহিত্যিক একওয়েন্সিকে নাইজেরিয়ার ডিকেন্স বলা হয়েছে। উত্তর নাইজেরিয়াতে ১৯২১ সালে তাঁর জন্ম। শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন নাইজেরিয়ার ইবাদান, ঘানার আকিমোটা শহর ও নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোস এবং পরিশেষে লণ্ডনে। নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের অফিসার হিসাবে কাজ করেন কিছুকাল। গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৬৭-৭১) তিনি বিদ্রোহী পূর্ব নাইজেরিয়ার (বিয়াফ্রা) বেতার বিভাগে নিযুক্ত হন। বর্তমানে ঔষধের ব্যবসায় রত, সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টি চলছে। উপন্যাসের মধ্যে 'জাগুয়া নানা', 'পিপল অফ দা সিটি', 'সারভাইভ দা পীস' এবং গল্পসংগ্রহের মধ্যে 'লোকোটাউন' বিখ্যাত।

বাজারের একটা স্টলে টেবিলের ওপর মোমবাতি, পাউডার, দেশলাই, টিন-ফুডের সারি। পেছনে দোকানদার মেয়েটি মাথা তোলে, একটা ছায়া টেবিলটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে পড়েছে। গাড়ির পার্কিং-প্লেসের ওপারে এক ছিমছাম যুবক দ্রুত হেঁটে চলে। ওর নাম চিবো। গাড়ির ড্রাইভারদের সঙ্গে অভ্যাসমত আলাপ-চারি আজ ও করে না। মর্দাবিকেতাকে অভিবাদন জানাতে বা এবরোটির বিক্রিওয়ালির দিকে চোখ টেপার জন্যও থামে না সে। কিসের যেন তাড়া আছে ওর। সোজা মেয়েটির স্টলের দিকে সে এগিয়ে যায়।

এ-তল্লাটেরই ছেলে চিবো। সুদর্শন চিবোর দিকে যখনই মেয়েটি তাকায়, তার মনে অপরাধবোধ আর দুঃখ জাগে যুগপৎ। হলদে গেঞ্জি আর লাল লাপাটে (প্যান্ট) আবৃত পৌরুষ, ওর সাধুতা যে কোনো মেয়ের কামনার ধন। তার বাপ-মা তার জন্য সত্যিই যোগ্য বর বেছেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যেন তার মনে হয় আজ বছর পনের পর কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এখন আর তার বিয়েকে অবধারিত মনে হয় না।

আজ ওর মুখে হাসি নেই। টেবিল থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে লাপাটাকে টান মেরে একটু উঠিয়ে নিল চিবো। 'ইয়ে, আকুনমা, সর্দার বললেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আ চিবো! মুখে হাসি নেই কেন? কিছু হয়েছে নাকি? নাকি শুধু…'

'না, হবে আবার কী? দেখা করতে বললেন, তাই দেখা করতে এলাম, বাস!'

চিবোর চোখে কঠোরতা।

'ও!' আকুনমা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কেন, সর্দার চায়টা কী আমার কাছে?'

'সে আমি কী জানি,' চিবো বলে, 'পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ডেকে বললেন: বাজারে গিয়ে আইভারি নাচিয়েকে আমার কাছে আসতে বলো। তাই এসেছি। তুমিই তো আইভারি নাচিয়ে; নানকুয়ো গ্রামের সেরা নর্তকী?'

লাজুক স্বরে আকুনমা বলে, 'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে। কিন্তু… নাচ? আমি যে আরেক জায়গায় নাচব বলে কথা দিয়েছি।'

'কাকে কথা দিয়েছ, পিটার্সকে?' চিবো শুকনো হাসি হাসে। 'কিন্তু ও তো নেই এখানে।'

ফিরে এসে জানতে পারবে আমি অন্য জায়গায় নেচেছি। জানো তো নানকুয়োর মেয়েরা 'পটার্স' বলতে পাগল! ওকে পাবার জন্য ওরা সব করতে পারে।'

'বেশ তো,' চিবো বলে, 'তাদের আর অপরাধ কী? গ্র্যাজুয়েট ছেলে গলায় আবার কাপড়ের টুকরো (টাই) বাঁধে, ভাঙা বোতলের কাচ (চশমা) লাগায় চোখে। ওর বাপ নাকি ওকে বিলেত পাঠাবে। সব মেয়েতো দৌড়বেই ওর পিছু। হোক না তুমি আমার কিয়াসে, তুমিই বা বাদ যাও কেন?'

'চিবো!' আহত গলায় আকুনমা বলে। কিন্তু শিরোবসন ঠিক করতে গিয়ে তার হাত কাঁপে, ধরা পড়ে গেছে ভয়ে। 'হিংসে হচ্ছে তোমার, আর কিছু নয়। দোকানটা একটু দেখো।… কী হল, এখনো বেজার?' চিবোর হাতে মৃদু চিমটি কেটে সে বলে, 'যাব আর আসব।'

'আমার খেতের কাজ পড়ে রয়েছে, মনে থাকে যেন। আমি তো কলেজ-বয় নই, আমাকে খেটে খেতে হয়, চশমা আর টাই পরে বাবুগিরি করার অবসর আমার নেই!

সর্দার অনেকক্ষণ আকুনমাকে দাঁড় করিয়ে রাখেন, সে কাঁড়কাঠ গোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বয়স্কদের এই সভাকক্ষের দেয়াল বিচিত্র জন্তুর শিঙ ও চর্মে সজ্জিত। পুরনো ঘড়িও আছে গোটা কয়েক, তার মধ্যে আবার কয়েকটা অচল। আকুনমা সবচেয়ে পুরনো ঘড়িটার শ্লথগতি পেণ্ডুলামের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

দরজায় ক্রেস-আঁটা ঢোলা পোশাকে সজ্জিত এক বিশাল পুরুষ। তার ঈষৎ মাদকতাময় দৃষ্টি আকুনমার দিকে নিবদ্ধ। 'দীর্ঘজীবী হোন, হে সর্দার,' হাঁটু ভাঁজ করে সম্মান প্রদর্শন করে সে বলে।

'মেয়ে আমার, উঠে দাঁড়া তুই,' গম্ভীর স্বরে বলেন সর্দার। 'সোজা হয়ে দাঁড়া রে তুই কন্যা, আজ রাতে নাচবি তুই, তাই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি, মেয়ে।'

'কিন্তু প্রভু…'

'কী ব্যাপার? আদেশ আমার মুখের নয়? সহবৎ ভুলে গেলি?'

'ক্ষমা করবেন, প্রভু।'

যেন কিছু হয় নি এইভাবে তিনি কথা বলে যান, তবু সে টের পায় বাধা পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। সর্দার নানকুর মুখের ওপর কথা বলা ঠিক হয় নি।

'দুজন গণ্যমান্য লোক আজ অতিথি হবেন আমার গ্রামের,' তিনি বলে চলেন। সেনেটে আমাদের প্রতিনিধি স্যার আজুমোবি আসবেন গ্রাম পরিদর্শনে। বহুকাল থেকে গাঁয়ে জল সরবরাহের কথা সরকারপক্ষকে বলেছি, তারা কর্ণপাত করেন নি। আজ কথাটা আমাদেরই বাপধন আজুমোবির কাছে পাড়ব, সেই যে পনের বছর আগে পিটাওয়াকা গিয়ে সে গোমড়াচোমরা হল, তারপর সে আর এ দিক মাড়ায় নি। তোর নাচ দেখিয়ে ওকে খুশি করে দেব, তাহলে ও মন্ত্রীসন্ত্রী ধরে গাঁয়ের জন্য জলের বন্দোবস্ত করে দেবে। এ-তল্লাটে তোর সঙ্গে পাল্লা দেবে এমন নাচিয়ে নেই, ও নিশ্চয় কাজটা করে দেবে। তাছাড়া আজুমোবি সঙ্গে একজন বন্ধুকেও আনবে, এক আমেরিকান সাহেব। সে কেমন লোক জানি না, এলে আজুমোবির কাছে জানতে পারব। ভাগ্য ভাল, সেরা নাচিয়ে রয়েছে আমাদেরই গাঁয়ে। কিরে মেয়ে, শুনতে পাচ্ছিস না? যা দলবল নিয়ে আয় গে।'

আকুমা তখনো হাঁটু গেড়ে বসে আছে। 'সর্দার, কাল সন্ধ্যায় হলে হয় না?'

'বড়দের মুখের ওপর জবাব দেবার অভ্যেস ছাড় মেয়ে, যা বলছি কর!'

'প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি যে আমার···আমার হবু স্বামীর কাছে কথা দিয়েছি, বাইরের লোকের সামনে আর নাচব না!'

'কে তোর হবু স্বামী? চিবো?' সর্দার হাঁকেন।

'না, সে নয়! আমি···আমি পিটার্সের কথা বলছি, ঐ যে কলেজের··· আপনি তাকে তো চেনেন, সর্দার!'

'ঐ যে সবসময়ে গলায় টাই বেঁধে রাখে? বটে, তাকে দেখতে হবে তো!'

'ইয়ে···ও এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে, সর্দার!'

'ওসব আমি বুঝি না! গাঁয়ের কেউ বুঝবে না! শুধু তোরা, এই মেয়েরা এতে মজিস! যা এখন দলের অন্যদের ডেকে নিয়ে আয়, আমার জোর খাটাতে বাধ্য করিস নে।'

'মোড়লমশাই, পিটার্স এখানে এসে রেল-স্টিমারের চাকরি নিয়েছিল একটা, ঐ যে-সব লঞ্চগুলো কয়লা-শহর থেকে কয়লা আনে নাইজের নদীর স্টিমারগুলোর জন্য তারই একটাতে। এটা ও কত কাজের মানুষ তা দেখাবার জন্য করে। এখন সেই কয়লা-শহরে গেছে সে, ওর বাড়ির লোকেরা থাকে সেখানে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইবার জন্য গেছে সে। আজ রাতেই ওরা ফিরে আসবে আমার মায়ের অনুমতি চাইতে। সর্দার মশাই, আজ আমি নাচি কী করে বলুন।'

'বেটি, তুই কি পাগল হলি? এই নানকুয়ো, এখানে ওকে কে চেনে? চিবোর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাকাপাকি। এখন ওকে এ গাঁয়ে ঠেলবি তুই? বয়স্কদের

জানাতে হবে, তাছাড়া ··· । যা, যা, সময় নষ্ট করিস নে । বিয়ের ব্যাপার তোর মা আর আমার হাতে ছেড়ে দে । নে যা ! সাঁঝ হতে আর বাকি নেই বেশি । অতিথিরা এসে পড়বেন এখুনি ।'

'পারব না গো মোড়ল মশাই, আজ নাচতে পারব না !' এবার সে কেঁদে ফেলে । তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোড়ল একবার তার দিকে চান, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যান । আড়াল থেকে আকুনমা শোনে সর্দার বউদের রেগে কী সব বলছেন । ভয় হল তার । সর্দার বড় নিষ্ঠুর, সবাই তা জানে । কী অপরাধ করেছে সে ? কী করে সে এখন ? কিছুক্ষণ কেটে গেল । সমস্ত চুপচাপ, তবু ভেতরে ভেতরে এক অদ্ভুত চাপা অশান্তি বোধ করল আকুনমা ।

পাশের দরজাটা খুলে যায় । মুখোস-পরা দুটি লোক এগিয়ে আসে । কবজি শক্ত করে ধরে ওরা ওকে যতটা সম্ভব শান্তভাবেই বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে যায় । মধ্যখানে উঠোন, তার পাশে একসারি ঘর, প্রতি ঘরের দোরে একটি করে মেয়ে কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখছে তাকে । এটাই মোড়ল মশায়ের জেনানামহল ।

একটা ঘরে তাকে ঠেলে দিয়ে লোকদুটো চলে গেল । মন্দ নয় ঘরটা, আলো বাতাস বয় ভালই, একপাশে একটা মোটামুটি দামী চারপেয়ে খাট, আর বইভর্তি একটা টেবিল । দেয়ালের হুক থেকে ঝোলানো ফ্রকগুলির কাটছাঁট ভালই । 'কার ঘর হতে পারে এটা' — আকুনমা ভাবে । দরজা খুলে একটি সুবেশা তরুণী ঘরে এল । সর্দারের সবচেয়ে ছোট বউ, মুখে তার হাসি ।

'ও, তুমিই সেই মেয়ে ? কর্তা আমায় পাঠিয়েছেন তোমার মত বদলাবার জন্য । দেখো, পিটার্সে'র পিছনে ঘুরে লাভ নেই, কোনো কম্মের নয় ছেলেটা । ও তো তোমায় ঠকাচ্ছে ! আজ বাদে কাল ও দেশের নেতা হবে, তখন তোমায় নিয়ে ও করবে কী বলো ?'

আকুনমা বলে, 'জানি জানি, তোমার মত মেয়ের সঙ্গেই ওকে মানায় । তুমি হল গিয়ে সেন্ট অ্যান কনভেন্ট থেকে পাশ-করা মেয়ে, তাই না ? মোড়ল মশাই তো ভাল করে লিখতে পড়তে জানেন না, তবু তিনি তোমায় বিয়ে করেছেন ।'

'আমার কাজ ওঁকে সাহায্য করা, নইলে এখানে আছি কী করতে ?' সে বলে, 'জানি আমার সতীনরা আমাকে পছন্দ করে না, তা ওতে আমার কিছু আসে যায় না ।'

'তুমি স্বার্থপর, কুমতলবী, তাই তোমাদের মেলে ভাল । কিন্তু আমি তো জানি তুমি সর্দার মশাইকে ঠকাচ্ছ । টাকা জমাচ্ছ, বেশকিছু জমিয়ে একদিন ওর সব জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেবে !'

'বাজে কথা ! আমার সঙ্গে অমন কথা কইবি নে বলছি !'

'কী করতে এসেছ এখানে ?'

ছোটবউ বিছানায় উঠে বসল । 'এটা আমার ঘর,' সে বলল, 'আমি তোকে বলতে এসেছি যদি না নাচিস তো তোর মায়ের খেত জমি সর্দার কেড়ে নেবেন । জানিস তো তোর মা কত গরীব ! খেত গেলে সে খাবে কী ? অবশ্য [illegible]

ঐ ইরোকো গাছগুলো রেখে গেছে। তবে তাই নিয়ে এখনো তো তক্কাতক্কি চলছে। এতেও সর্দার তোদের বাদ সাধতে পারেন। অবশ্য তোর এতে কী আসে যায়! তোর তো 'পিটার্স' আছে। তোরা কেটে পড়বি, বেচারা মা না খেয়ে মরবে।'

আকুনমা মুখ নিচু করে বলে, 'শয়তান, তোরা দুটোই শয়তান!'

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। আকুনমা ঘরের এককোণে অসহায় নিশ্চুপ বাঁদরের মত বসে আছে। হাতে ফুলের মালা নিয়ে একটি একটি করে মেয়েরা আসতে শুরু করেছে। আকুনমার দলে ছিল পাঁচ থেকে তের বছরের একুশটি ছোট মেয়ে। সবকটিই সুন্দর, চমৎকার। নাচের প্রতিটি জটিল তাল ওরা আয়ত্ত করেছে, নাচ তাদের অশেষ আনন্দের উৎস। পায়ে ঘুঙুরের শব্দ তুলে সারা গায়ে কেমউড গাছের রঙ মেখে ওদের একটিকে আসতে দেখে আকুনমা বুঝল, অতিথিদের নাচ না দেখিয়ে সর্দার ছাড়বেন না। বজ্জাতের ধাড়ি! নাচের মাঝখানেই পরিদর্শকের কানে মধুবর্ষণ করে গাঁয়ে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি আদায় করবে, আর আকুনমা হারাবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

সন্ধ্যা নামতেই সর্দার ভেতরে তাকিয়ে বলেন, 'মহড়া শুরু করবি কখন? দল তৈরি তো? কোন নাচটা নাচবি আগে? হস্তিনৃত্য কর, ওটা করেই তো তোর 'গজদন্তনটী' বলে সুখ্যাতি হল। সব দেশে সেই নাচ। হাতির দাঁতের বালাগুলো পালিশ করেছিস তো?'

'ওতো সারাক্ষণ কোণায় জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে!' ছোট বউ বলে।

আকুনমা জ্বলে উঠে বলে, 'চলে যাও সব! ও! সব আমার এভাবে বিফলে যাবে কেন? গাঁয়ে সবাই আমায় বলে আমি নাকি বেশি চালাক, কেউ আমায় বিয়ে করতে চায় না। এমনকি চিবোগুও ঘৃণা করে আমাকে। আর আজ যখন একটা ভদ্র ছেলে এসেছে…'

'চুপ কর, যথেষ্ট হয়েছে।' সর্দার তাকে ধমকে থামিয়ে দেন। 'এত অবাধ্য যখন তখন আর কী করা যায়, না চাইলেও তোকে জোর করতে হবে! সেনেটর এলে তাঁকে আমি বলে দেব তোর 'পিটার্স' কয়লা-শহরে যাবার রাস্তার ওপর একটা লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছে। এছাড়া আর উপায় কী?'

'পিটার্স খুন করেছে?' আকুনমা তোতলাতে থাকে।

ততক্ষণে সর্দার বাইরে চলে গেছেন।

'ও, তুই শুনিস নি বুঝি?' ছোট বউ বলে। 'অবশ্য চাপা দেওয়া হয়েছে খবরটা। তোর পিটার্স গাড়ি চালাচ্ছিল, ওকে বাঁচাতে লরিওয়ালা নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে ফাইন দিয়ে দিয়েছে। ভাল লোক বলতে হবে। তোর পিটার্সের তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, সেটা পুলিশকে জানাতে চায় নি।'

'সত্যি…, পিটার্সই দায়ী? ও-লোকটা নয়? চাপা দেবার কথাটা আমিও শুনেছি। সেতো সেই দুমাস আগে। পিটার্স আসবার কয়েকদিন পরেই!'

'তুই ভুল শুনেছিস।'

'হায় ভগবান! শোনো ভাই ছোট বউ, বলো না তোমার স্বামীকে, ওকথা আর না তুলতে! সর্দার তো তোমার প্রেমে ডগমগ। বড় সতীনদের ওপরে তোমায় ঠাঁই দিয়েছেন। বলো না ভাই, পুরনো কথা আর না তুলতে।'

'আমি কী করতে পারি বলো?' বউ বলে, 'তবে নাচতে রাজি হও তো আলাদা কথা।'

'না! অসম্ভব! তার চেয়ে মরণ ভাল!'

সূর্য গাছের আড়ালে ডুব দিয়েছে। একটা পন্টিয়াক গাড়ি গ্রামে এসে ঢুকল, পেছন পেছন বাচ্চারা চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে। স্যার আক্রুমোবির পরনে একটা গাঢ় ছাই রঙের স্যুট; মুখে চুরুট চেপে আগুন ধরাতে ধরাতে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। গ্যাবার্ডিনের স্যুট-পরা আমেরিকান সাহেবটি নামলেন তাঁর পর।

'স্যাম বিলিংস ফিল্মের প্রোডিউসার,' বলে আক্রুমোবি তাঁর বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে মোড়লের পরিচয় করিয়ে দিলেন; আক্রুমোবির প্রসারিত বাহু কলাবাগান শুদ্ধ কুঁড়েঘরগুলিকে যেন কবলিত করল। 'উনি আফ্রিকা নিয়ে একটা ছবি করছেন, ছবিতে উনি একটা নাচের দৃশ্য জুড়তে চান। মোড়লমশাই, এ-ব্যাপারে নিশ্চয় আপনি সাহায্য করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, তা পারি।' আমতা আমতা গলায় সর্দার বললেন, 'ইয়ে…রেস্ট হাউস তৈরি, স্যার। ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই তো!… পোশাকও বদলাবেন নিশ্চয়। কাল সকালে চলে যাবেন বলছেন, তা বেশ, আজ রাত্রেই নাচের ব্যবস্থা করব। তবে রাত ন'টার আগে হবে না স্যার, ওদের তৈরি হতে সময় লাগবে।'

গাড়ি রেস্ট হাউসের দিকে যেতেই সর্দার উঠোনে গিয়ে আকনমাকে সাধতে গেলেন। কিন্তু 'পিটার্সের সঙ্গে কথার খেলাপ করতে পারব না' ছাড়া তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরলো না।

'আটটার মধ্যে পিটার্স না ফিরে এলে তোকে নাচতেই হবে কিন্তু। এখন সাতটা বাজে!'

আধঘন্টা বাদে দিবো দোকানঘরের চাবি নিয়ে এসে হাজির। কুড়ি শিলিংয়ে সে একটা কাপড় বিক্রি করেছে। কাজের ছেলে দিবো।

'আকনমা,' ও ব্যগ্রস্বরে বলল, 'সারা মানকুয়োতে রটে গেছে তুমি বলেছ তুমি নাচবে না। এ আবার কী বোকামি!'

'কিছু না।'

'কথা শোনো, আকনমা। ভেবেচিন্তে কাজ কোরো। মোড়লমশায়কে তো চেন!'

জঙ্গলের মাঝখানে একটা খোলা যায়গায় পাতা ঝাড় দিয়ে নাচের যায়গা

পরিষ্কার করা হল। মেয়েরা চেয়ার সাজালো, ধুলো ঝেড়ে বাতিগুলো পরিষ্কার করল। সর্দারের বড় বউয়ের ঘরে সুগন্ধি মেখে রঙে চর্চিত হয়ে অপেক্ষা করছিল কুড়িটি মেয়ে, বড় বউ তাদের ঘুঙুর বা বালা পরিয়ে দিলেন। সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে, শুধু আকুনমার গায়ে উত্তেজনার আঁচ লাগছে না। বাদ্যি বাজতে শুরু করেছে।

মোড়ল-গিন্নিরা সবাই দোরে এসে দাঁড়ালো। উদ্বিগ্ন হয়ে তারা পরস্পরে কী সব বলাবলি করছে। এখনো পিটার্স ফেরে নি! সময় বয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গিন্নিরা কলরব করতে করতে নাচের আঙ্গিনার দিকে চলে গেল।

কানে কোনো একটা শব্দ গেলেই আকুনমা ছুটে যাচ্ছে দোরের কাছে। আর নিজেকে সংযত রাখা যায় না যে। উদ্বেগ শেষে ভয়ে পরিণত হল। মোড়ল মশাইকে অপ্রস্তুত করলে শেষে তার দশা কী হবে কে জানে। বাইরে পথে গুরুজনেরা হাঁকেন, 'আকুনমা, কোথায় তুই?'

বৃদ্ধেরা চলে গেলেন, পরক্ষণেই এক যুবক ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বেশ আলুথালু, সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন। পিটার্স!

'একী!' আকুনমা বলে, 'কী হয়েছে, তোমার স্বজনেরা কোথায়?'

'অঘটন ঘটেছে! আকুনমা, তোমায় নাচতেই হবে! মোড়লের মতলব ভাল নয়। তুমি···তুমি নাচ; শুনতে পাচ্ছ? আমি রাজি, যাও তুমি নাচ, আমাকে বাঁচাও!'

'কিন্তু, আমার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা···'

'সে হবে খন, তারা তো নাচের আসরেই আসবেন। পরো, তোমার হাতির দাঁতের বালাগুলো পরো। যাও নাচো! দেরি কোরো না।'

ছুটে বেরিয়ে গেল পিটার্স। আকুনমার সারা দেহ কাঁপছে। এ-অবস্থায় ভাল করে নাচতে পারবে সে? হাতির দাঁতের বালা হাতে বেজায় ভারি বোধ হল, দুর্বল কাঁধে পরপারের আত্মার কনে-মুখোস যেন আর ধরে না। কিন্তু নাচের গোলাকৃতি অঙ্গনে প্রবেশ করতেই তার চোখে হাজার বাতি জ্বলে উঠল। পা থেকে ভার নেমে গেল চকিতে, জটিল তালের নকশা তৈরি করল মাটিতে। সহস্র উৎসুক দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। হ্যাজাকের আলোতে গণ্যমান্য সমাবেশের অস্তিত্ব বোধ করল সে। সর্দার বসে আছেন মাঝখানে, একদিকে স্যাম বিলিংস সিগারেট টানছেন, অন্যদিকে আগুনের শিখা হাওয়া থেকে আড়াল করবার জন্য ঝুঁকে পড়ে বসে আছেন আজুমোবি।

পরদিন সকালেও তার গায়ের ব্যথা মরে নি। মন তখনো কাঁপছে ভয়ে; কানে তখনো ঘুঙুরের শব্দ বাজছে। দর্শকের হর্ষধ্বনি ছাপিয়ে বিলিংসের 'এনকোর' ধ্বনি সকালেও তার তন্দ্রা ভেঙে দিচ্ছিল থেকে থেকে, আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল আকুনমা।

বাড়ির সামনে কোথায় যেন চিবোর গলা শোনা গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে

দাঁড়াল আকুনমা। নিজের খেত থেকে চিবো আকুনমার জন্য এক ঝুড়ি তাজা কমলালেবু আর কলা নিয়ে এসেছে। নাচের প্রশংসায় চিবো উচ্ছ্বসিত, পিটার্সের অদর্শনের প্রাথমিক হতাশাকে আকুনমা তাই গোপন করে। পাছে চিবো মনে ব্যথা পায়, এই আশঙ্কায় সে পিটার্স সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করল না।

সেনেটর দীর্ঘদিনের জলের পাম্পের দাবি মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, চিবো তা সবিস্তারে বলতে লাগল, তবে সবাই এজন্য খাজনা দিতে রাজি হবে বলে তার মনে হল না। আমেরিকান সাহেব তার আফ্রিকা-বিষয়ক ফিল্মে 'গজদন্ত-নর্তকী'তে তাকে নেবেন সে-কথাও চিবো শুনেছে বলল।

এসবই তো গত রাতে আকুনমার অমন উজ্জ্বল করা নাচের দৌলতে হল!

'কিন্তু কিছু লোকে কী করে যে ভান করে বুঝি না,' চিবো বলে; ঐযে ঐ পিটার্স ছোকরার কথা বলছি।'

আকুনমা দম বন্ধ করে। মুখের হাসি মুছে গেছে। 'পিটার্স!' নামটা তার গলায় প্রতিধ্বনির মত শোনায়। হিমশীতল নীরবতায় তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনাই যায় না যেন।

'হ্যা, পিটার্স। অনর্থক সময় নষ্ট করেছ তুমি। গতরাতে যখন ঐ ছোকরার প্রাণ বাঁচাতে নাচছ তুমি, মোড়লের বড় বউকে নিয়ে সে কেটে পড়েছে। না, চোখের জল নষ্ট কোরো না। ওদের যুগ্যি কাজ করেছে ওরা। আরে, এর ভাল দিকটা দেখবে তো নাকি?'

'একটু একা থাকতে দাও আমাকে,' নর্তকী বলে। বিছানায় ফিরে গেল সে। চোখের জল মোছা বা ফোঁপানি বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই করে না নর্তকী।

আবিওসে ডি নিকোল

ওলাহুন ব্রিজের সেই ভূত

আবিওসে নিকোলের জন্ম সিয়েরা লিয়নে। বাল্যজীবন কাটে নাইজেরিয়াতে। সিয়েরা লিয়নের ফুরাবে কলেজে শিক্ষাসমাপ্তে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান। ১৯৫২ সালে তিনি মার্গারেট রঙ পুরস্কার ও আফ্রিকান সাহিত্য-রচনা পদক লাভ করেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

স্যান্ডারসন একহাতের আঙুলগুলো দিয়ে একটা কলম ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে যাচ্ছিল, আর অন্য হাত দিয়ে তার সামনের ডেস্কের ওপর তবলা বাজাচ্ছিল। তার চোখদুটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনেক দূরে কিসিল্যান্ডের সবুজ পর্বতমালার ওপর। ঐ পর্বতমালাই তার নিজের জেলাটির সঙ্গে ঠিক তার পরের জেলার ভেদরেখা টেনেছে। সে আবার তার সামনে ডেস্কের ওপর রাখা ফর্মটার দিকে তাকায়, ক্রাউন এজেন্টসের কাগজের ছাপানো ফর্মটা, আপন মনে সে এই নিয়ে দশবার পড়ে যায়। 'ডিস্ট্রিক্ট অফিসারস এ্যানুয়াল রিপোর্ট—ওয়েস্ট আফ্রিকান কলোনিয়াল সার্ভিস (কনফিডেনশিয়াল)'। এর পরে ফাঁকা অংশটুকু আগের সববারের তুলনায় আরো বড় লেখায়। তার অধীনস্থ সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ম্যাকফারসন ছুটিতে বাড়ি যাওয়ায় ফর্মটা লেখার কাজ সে আপাতত স্থগিত রেখেছিল। দিনকয়েক আগেই হেড কোয়ার্টার্স সেক্রেটারিয়েট থেকে সে একটা মৃদু তাগাদা পেয়েছে। পেয়ে মনে হয়েছে সত্যিই আজ বিকেলের মধ্যে এটা লিখে ফেলা উচিত তার।

'মোমো!' সে চেঁচিয়ে ওঠে। পাশের অফিস থেকে অল্পবয়সী ওয়েস্ট আফ্রিকান কেরানিটি বেরিয়ে আসে।

'তোমার হাতের সব এ্যানুয়াল রিপোর্ট এখুনি নিয়ে এসো।'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে, স্যার,' সামান্য কাঁপাগলায় মোমো বলে। 'তবে আপনি যদি বলেন তো সবগুলোই আনতে পারি,' তাড়াতাড়ি সে যোগ করে কথাটা।

'তাহলে, গত দশবছরের গুলো আনো।'

রিপোর্টগুলো আসার পর সেগুলো চোখ বুলিয়ে দেখে তার বিশ্বাসই হল না যে এগুলো কেউ ধৈর্য নিয়ে পড়তে পারে। অবাক হয় খানিকটা। ধরা যাক ১৯৩৬ সালের রিপোর্টটায় যদি সে সাব-চীফের নামটা আর গ্রামের নামটা বদলে

দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে কী হবে; অথবা, যদি ঐ সাদা ফর্মটাকেই বদলে দেয়, যেখানে এরকম একটা অদ্ভুত ধরনের মন্তব্য লেখা আছে—'গোপনে বলা ভাল (অনুরোধ ক্রমে) যে গত এক বছরে আফ্রিকানরা বড় একটা বদলায় নি, কিন্তু আমার প্রতিবেশী ইয়োরোপীয়রা সেখানে অবিশ্বাস্যভাবে বদলে গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে, অনেক ক্ষেত্রেই নীরক্ত দ্বিধাযুক্ত অনভিজ্ঞতা ধীরে কিন্তু স্থির ভাবে জন্ম দিয়েছে এক অভাবিত রৌদ্রোজ্জ্বল সামর্থ্যের।'

না, বড় বড় জায়গায় রসিকতাটা কোনো কাজের কথা নয়। ইতিহাসের একটু ছোঁওয়া দিয়ে কি সে আরম্ভ করতে পারত? কিংবা নৃতত্ত্ব? সে ঠিক উলটো সিদ্ধান্তটা নিল। বরং সে পরিচিত কতকগুলো জরুরী বিষয়কেই আঁকড়ে থাকল—নতুন নতুন রাস্তা, বাণিজ্যের প্রসার এবং গ্রাম থেকে শহরগুলোয় যুবকদের স্থানান্তরকরণ। সুতরাং আরম্ভ করতেই হয় এখন।

'মাপ করবেন, স্যার, আমি এখনো এ-সপ্তাহে আপনার কর্মসূচীটা পড়ে উঠতে পারি নি।' দরজা দিয়ে মোমো হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং তার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্যান্ডারসন প্রচণ্ড বিরক্তিতে একটা চিৎকার দিতে গিয়েও সামলে নেয়, কেননা তার মনে পড়ে যায় প্রতি সোমবার সকালে ঐ সপ্তাহের পুরো কর্মসূচীটা তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিটা সে নিজেই তার ঐ কেরানীটির মগজে ঢুকিয়েছে। সে নিজেই এটা অনায়াসে করে নিতে পারে। কিন্তু সে আসলে মোমোকে সেক্রেটারির কাজে চূড়ান্তভাবে পটু করে তুলতে চেয়েছে এবং তাছাড়া, সে যে একজন বিরাট পরিচালক, তার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম থাকে সপ্তাহভোর—এরকম একটা ভান তাকে একটা গোপন সুখও দেয়। মোমো নিজেও পুরো ব্যাপারটা খুব গভীরভাবে উপভোগ করে। চেহারায় সে কিছুটা বেঁটে, গাট্টা-গোট্টা এক যুবক, মুখে সর্বদা এক সন্ত্রস্ত ভাব আর ছেলেমানুষী উৎসাহ। তার বুকপকেটে সবসময় ভরতি থাকে সুন্দরভাবে কাটা বেশ কয়েকটা পেন্সিল আর নানারকম রঙের কালিওয়ালা একগুচ্ছ কলমে।

'ঠিক আছে, শ্রীমান মোমো, পড়ে যাও।'

মোমো গলা ঝেড়ে নেয় এবং খানিকটা সুরেলা ভঙ্গিতে পড়ে যায়। প্রথমে আছে স্থানীয় একটা মাধ্যমিক স্কুলে বাৎসরিক পরিদর্শনের ব্যাপার। স্কুলটা চালান একজন ভীতু গোবেচারা ধরনের আইরিশ যাজক এবং সরকারি অনুদান পাওয়ার আগে প্রতি বছরই স্কুলটাতে এই পরিদর্শনের কাজ সারতে হয়। ব্যাপারটা নিছকই একটা ফর্মালিটি; কারণ স্কুলের মান বজায় থাকছে কিনা তা দেখার জন্য বছরে বেশ কয়েকবার এডুকেশন অফিসারেরা এখানে ঘুরে যান। তারপর তার পরের রাত্রিতেই একটা সেমি-অফিসিয়াল কাজ আছে—স্থানীয় আফ্রিকান ক্লাবে একটা বক্তৃতা দেওয়া।

'তুমি কি ওখানে যাবে, মোমো?' স্যান্ডারসন তাকে জিজ্ঞেস করে এবং মুহূর্তের মধ্যেই এই জিজ্ঞেস করাটা ভুল হয়েছে বুঝতে পারে, কেননা

কেরানিটি এটাকে হয়ত অফিসসংক্রান্ত একটি আদেশ বলে মনে করতে পারে।

'ও হ্যাঁ, আমি তো যাচ্ছিই, স্যার,' মোমো আন্তরিক ভাবেই উত্তর দেয়। তারপর বলে, এই ধরনের ব্যাপারগুলো মানুষের মন প্রশস্ত করে।'

'অবশ্য আমার মনে হয় না এটা সেরকম কিছু,' স্যান্ডারসন শুকনো গলায় বলে। 'যাই হোক, বলে যাও।' বৃহস্পতিবার পি-ডব্লিউ-ডি হেডকোয়ার্টারের একজন ইঞ্জিনিয়ারের আসার কথা। মোমো তার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুকিটাকি কাজকর্ম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে—রেস্টহাউস ঠিক করে রাখা, সরকারি বাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ফাইলপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখে নতুন সমস্ত জিনিসপত্রের অর্ডার দেওয়া ইত্যাদি; সরকারি একটা লরি ঠিক করে রাখা, যাতে কিসির পথে ঐ ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলেও অসুবিধা না হয়। স্যান্ডারসন তালিকাটা দেখে নেয়, সই করে অনুমোদন করে সেটার এবং মোমোকে ঐ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করে।

'মিস্টার ও. ই. হিউজেস, স্যার,' ঠোঁটে মৃদুহাসি খেলিয়ে মোমো উত্তর দেয়। হাসিটা স্যান্ডারসনকে সেই মুহূর্তে খানিকটা বিভ্রান্ত করে বটে, কিন্তু সেটাকে সে স্মরণে রেখে দেয়। আমাদের কেল্টিক ভ্রাতৃকুলের একজন হিসেবেই তাকে নিজের মনে ভেবে নেয় স্যান্ডারসন। প্রকাশ্যে 'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ তোমায়' বলে সে তার কেরানিকে বিদায় করে।

'এখন তাহলে হিউজেস,' বিড়বিড় করে সে বলে নিজেকেই।

কিছুতেই তাকে চিনতে পারে না, নামটাও পরিচিত মনে হয় না। নিশ্চয়ই নতুন কেউ হবে, সে ভাবল এবং ঠিক করল একেবারে সাম্প্রতিক সিনিয়র স্টাফদের তালিকায় তাকে পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। সিনিয়র পি-ডব্লিউ-ডি স্টাফদের তালিকায় একের পর এক আঙুল বুলিয়ে নামতে নামতে সে এইচ-এস বর্ণক্রমে এসে পেঁছিল। আহা, এই তো পাওয়া গিয়েছে, হিউজেস, ওলুয়েমি এগবার্ট। ও আচ্ছা, তাই বলো, লোকটা আফ্রিকান! ঐ জন্যেই নামটা আগে কখনো শোনে নি। নিজের খেয়ালে নরম করে শিস দিয়ে ফেলে স্যান্ডারসন। জোভের দিব্যি, নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল আছে এর মধ্যে। সাধারণত সিনিয়র স্টাফদের ভিজিটিং মেম্বারদের আসার পথে কিসিতে রাত্রিবাসের জন্য ইয়োরোপিয়ান ক্লাবেই নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ মেম্বারদের মধ্যে পরিচিত কয়েকজনকে একের পর এক মনে করতে আরম্ভ করল, এই রকম একজন আফ্রিকান অতিথির প্রতি তাদের কী প্রতিক্রিয়াটা হবে সেটাই একটু আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। তারপর সে কিছু সময়ের জন্য অবাক হয়ে এবং খানিকটা লজ্জার সঙ্গে ভাবতে লাগল কোনোকিছু ঘটবার আগেই ঐ ঘটনার জন্য ছুতো খুঁজতে আরম্ভ সে-ই করেছে কিনা। কিন্তু না, সে ভেবে নেয় যে এখানে কোনো গোলমাল আছে কিনা সে-সম্পর্কে আগে থাকতে সুনিশ্চিত হওয়া তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে, কেননা যদি গোলমাল থেকেই থাকে তাহলে তাকে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবেই এবং হেডকোয়ার্টার থেকে একটা অলিখিত দোষের বোঝা সম্ভবত

তাকেই বইতে হবে। হিউজেসকে অভ্যর্থনা করার ব্যাপারে সিনিয়র আফ্রিকান ক্লার্ক মিঃ টমাসকে কিছু জিজ্ঞেস করাটা কাজের হবে কিনা তা ভাবে স্যান্ডারসন। সবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নেয় সে— অর্থাৎ সে জানে যে সে কী করবে। হিউজেস-কে সে তার নিজের বাংলোয় ডিনারে ডাকবে। তৃতীয়জন হিসেবে একটা বেশ বড় মাপের ফার্মের এজেন্ট হানস্লোকেও নিমন্ত্রণ করবে। হানস্লো নিজে ইংরেজ, কিন্তু জন্মেছিল আফ্রিকায়, তার বাবা কেনিয়াতে বসতি করেছিলেন। এই ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে সে দেখাতে চায় যে তার কোনো কুসংস্কার নেই। সমস্যাটার এরকম একটা সমাধান করে বেশ হালকা হয়ে অংচ একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তির রেশ নিয়ে সে আবার নিজের কাজে মন দেয়।

দুপুরের খাবারের ঠিক পরেই হিউজেস এসে উপস্থিত হয়। দীর্ঘদেহী, বয়স তিরিশের কোঠায়, মিলিটারি গোঁফ, ঘন থাক থাক চুল, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো এবং তার মধ্যে ঝকঝকে সাদা দাঁত, কিন্তু ভীষণরকম গম্ভীর এবং আদ্যন্ত বিনয়ী। স্যান্ডারসনের সঙ্গে করমর্দন করে সে চেয়ারে বসে। সিগারেট প্রত্যাখ্যান করে এবং সময় ব্যয় না করেই কাজে লেগে যায়। স্যান্ডারসনের কথা সে মনোযোগ সহকারে শোনে, নোট নেয় এবং দুটি-একটি প্রশ্নও করে। স্যান্ডারসন মোমোকে ডাকে ফাইলগুলো নিয়ে আসার জন্য। মোমো সেগুলো এনে টেবিলে রাখে এবং ফিরে যাওয়ার আগেই স্যান্ডারসন হঠাৎ তাকে বাধা দেয়, স্যান্ডারসনের মনে পড়ে যায় মোমোর সেই আত্মসন্তোষের হাসি, হিউজেসের সঙ্গে মোমোর আলাপ করিয়ে দেয়, হিউজেস ছোট্ট একটি মৃদু হাসি হাসে, কর-মর্দন করে এবং ফাইলগুলো দেখতে শুরু করে দেয়। স্যান্ডারসন প্রথমে হিউজেসের এই বিনয় এবং কর্মদক্ষতায় একটু অস্বস্তি অনুভব করে, সেজন্যে মাঝে মাঝে দু-একটি রসিকতা করে পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝাই, হয় হিউজেস সেগুলো বুঝতে পারে না আর নয়তো না-বোঝার ভান করতে থাকে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ কাজই শেষ হয়ে যায়, স্যান্ডারসন তাকে জিজ্ঞেস করে যে রাত্তিরে সে কী করবে। তারপরই, আফ্রিকান ইঞ্জিনিয়রটি এই ব্যবহারকে তার ব্যক্তিজগতে অনধিকার প্রবেশ বলে ভাবতে পারে চিন্তা করে সে তাড়াতাড়ি বলে, 'কেননা আজকে ডিনারে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে চাই।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ, সে তো খুব ভাল প্রস্তাব,' হিউজেস উত্তর দেয়। তার নোট গুছোতে গুছোতে সে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। হিউজেস আরেকটু বেশি উৎসাহ কেন দেখাচ্ছে না এই চিন্তায় স্যান্ডারসন একটু অসন্তুষ্ট হয়। বাদ দেওয়া যাক এসব, সে ভাবে, আমি যা করলাম তা খুব বেশি ইয়োরোপীয়ান করবে বলে মনে হয় না, হয়তো লোকটা একটু বেশি রাজনীতি-সচেতন এবং সেজন্যেই বোধহয় একটা নিছক কর্তব্যবোধ থেকেই নিমন্ত্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করছে। তাছাড়া, লোকটা বোধহয় অনুমান করার চেষ্টা করছে যে কেন আমি তাকে আমার বাংলোয় ডাকছি। এইরকম ভাবতে ভাবতে হিউজেসকে সে বলে, 'আপনি ভাল-

ভাবেই জানেন যে আপনি আসতে পারবেন ।'

'নিশ্চয়, ধন্যবাদ, খুব ভাল ব্যাপার,' হিউজেস পুনরাবৃত্তি করে । 'আমি এখন অফিসের অন্যান্য বাড়িগুলো দেখতে বেরোব, বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে । তাহলে, এখনকার মত চলি,' সে যোগ করে ।

স্যান্ডারসন দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয় এবং দুজনে আবার করমর্দন করে, মোমো ব্যাপারটা সংযমের সঙ্গে লক্ষ্য করে ।

হানস্লো ঠিক আটটায় স্যান্ডারসনের বাংলোয় এসে হাজির হয় এবং নিজেই পানীয় তৈরি করে নেয় । শোবার ঘরে স্যান্ডারসন তখন পোশাক পরিবর্তন করছে, দরজা দিয়ে হানস্লো তার সাথে চেঁচিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে ।

'আর কেউ আসছে নাকি আজ রাতে ?'

'হিউজেস, এখানকার নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র,' স্যান্ডারসন চেঁচিয়ে উত্তর দেয় ।

'লোকটা কেমন ? সোয়ানসী থেকে আসছে নাকি, শুনতে পাচ্ছো ?'

'না, ও আফ্রিকান—মিঃ ওলুয়োমি এগবার্ট হিউজেস ।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ ।

'ওখানে আছো তো, হানস্লো ?' স্যান্ডারসন খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করে ।

'হ্যাঁ, আছি,' দরজা থেকেই হানস্লো উত্তর দেয় । 'আগে আমাকে এটা বলো নি কেন ?'

'বলি নি, কারণ সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আসবে কি আসবে না সেটা নিশ্চিত ছিলাম না ।'

'তুমি কি একা একা একজন শিক্ষিত আফ্রিকানের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছিলে, স্যান্ডারসন ?'

'না না, তা নয়, তবে বৎস, আমি ভেবেছিলাম তোমার একটা বেশ ভাল অভিজ্ঞতা হবে । তোমার চাকর-ঠ্যাঙানো ধ্যানধারণার কিছুটা তুমি শুধরে নিতে পারবে ।'

'আমার তো ভয় হচ্ছে দুজনে বলার মত কথা সেও খুঁজে পাবে না, আমিও না,' হানস্লো উত্তর দেয় । 'নেহাত আজ রাতে ক্লাবটা বন্ধ আছে, নাহলে লোকটা আসার আগেই আমি ওখানে কেটে পড়তাম ।'

স্যান্ডারসন দরজা খুলে লাউঞ্জ-কাম-ডাইনিং রুমে আসে । ক্লাব কি বন্ধ ?'

'হ্যাঁ,' হানস্লো বলে, একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । বাজেভাবে চালানোর ফলে সমস্ত মদ ফুরিয়ে গেছে ক্লাবের,' সে যোগ করে । 'কেন, তোমার মিঃ হিউজেসকে কি তুমি ওখানেই নিয়ে যেতে ?'

'সেরকমই ভেবেছিলাম,' স্যান্ডারসন বলে ফেলে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে, যদিও নিজেকে কিছুটা অপরাধীও মনে হয় তার ।

'এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তোমাদের মত হোমরাচোমরাদের এই এক হল দোষ,

তোমরা তোমাদের কেতাদুরস্ত উদার মানসিকতা দেখাতে কত কী যে করতে পারো তার কোনো ইয়ত্তা নেই ।'

হানস্লো একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ ফুর্তি নিয়েই চেয়ারের গদিতে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় । 'ভাবছি, আমার ঐ কালো বউটাকেও এখানে নিয়ে এলে পারতাম,' ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে সে বলে । 'বেশ সুন্দর মেয়েটা, বুঝলে,' উৎসাহের সঙ্গে সে যোগ করে । 'জানি না ওকে ছাড়া আমি কী করব ।'

'না, তুমি তাকে কখনোই এখানে আনতে পারো না, মিঃ হিউজেসকে দেখলেই তোমার মনে হবে বেশ সম্মানীয় লোক । এবং তোমারও উচিত তার সঙ্গে যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করা ।'

'ঠিক আছে, মাস্টারমশায় । লোকটা কি একটু রাজনীতি ঘেঁষা ?'

'তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই,' স্যান্ডারসন উত্তর দেয় ।' 'ওরা সকলেই তাই, বুঝলে, যদিও চাকরির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওদের গোপন রাখতেই হয় ।'

'আমি তো কিছুমাত্র অবাক হব না যদি জানি যে লোকটা জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোতে নিয়মিত লেখা পাঠায় । যাই হোক, আমাদের তো সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে,' হানস্লো কিছুটা অবসাদ ভরে বলে । 'আজ মনে হয় লোকটা বেশ মাতাল হবে এবং বোতল ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করবে ।' তার গলায় যেন আশার সুর শোনা যায় ।

বাস্তবিকই । সেদিনকার সন্ধ্যায় ওরা সকলেই কিছুটা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল । ওলু হিউজেসকে হালকা রঙের লেশী স্যুট আর তার সঙ্গে কালো বো-টাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল ।

'ওহো, আমি আপনাকে সাজগোজ না করে আসতে বলতে ভুলেই গিয়েছি,' স্যান্ডারসন বলে ।

'ঠিক আছে, ওটা কিছু নয়,' হিউজেস উত্তর দেয় ।

হানস্লো আর হিউজেসের পরিচয়পর্ব শেষ হয় । আফ্রিকানটি বলে, 'কেমন লাগছে ?'

হানস্লো মাথা নাড়ায় । করমর্দন করে না । স্যান্ডারসন তাদের পানীয় তৈরি করে দেয় এবং তার বাগান নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করে ।

ঐ ঘরেরই অন্যদিকে তারা উঠে যায় এবং মাংস ভাগ করতে বসে । স্যান্ডারসন নিজে শুরু করার আগে হিউজেসের জন্যে অপেক্ষা করে । হিউজেসও আবার স্যান্ডারসনের শুরু করার জন্য অপেক্ষা করে, কেননা স্যান্ডারসন চাকরিতে তার থেকে সিনিয়র, এবং তার ওপর ছুরিকাটা ইত্যাদিও খুবই গোলমেলে ভাবে সাজানো ছিল । হানস্লো তার সামনে চাটনি দেওয়া মাত্র খেতে শুরু করে দেয় । তখন স্যান্ডারসন ছুরি আর কাটা তার প্লেটের ওপর নেয় এবং হিউজেসকে নুনের পাত্রটা এগিয়ে দেয় । হিউজেস সেটা নেয় এবং খেতে শুরু করে । হানস্লো খাবারের প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে এবং গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে খেতে থাকে, মাঝে মাঝে স্যান্ডারসনকে উদ্দেশ করে কিছু বলে । এটা

লেখে হিউজেসও স্যান্ডারসনের দিকে খানিকটা ঘুরে বসে কেবলমাত্র তাকেই তার নিজের বিকেলের কাজের ফিরিস্তি শোনায়। আহারপর্বের শেষদিকে বাজারের দাম বাড়ার প্রসঙ্গে বলতে বলতে হিউজেসের দিকে ঘুরে হানস্লো বলে, 'আচ্ছা মিঃ হিউজেস, আপনারা কিভাবে চালাচ্ছেন এই এত দরদাম বাড়ার পরেও ? আমার মনে হয়, ইউরোপীয় খাবারদাবার আর জামাকাপড়ের খরচ চালানো যতটা সহজ বলে ভেবেছিল ওরা ততটা সহজে পারছে না, তাই না ?'

হিউজেস কয়েকমিনিট ধরে নীরবে খাবার চিবিয়ে যায়। নীরবতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। হানস্লো তার প্রশ্ন আবার করতে যাচ্ছিল, কেননা সে ভেবেছিল তার কথাটার পাত্তা দেওয়া হয় নি, তার ভুরুও কুঁচকে উঠেছিল। স্যান্ডারসনও আফ্রিকানটি বিরক্ত হয়েছে ভেবে চালাকি করে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। হিউজেস খানিকটা জল খেয়ে নেয়, তারপর হানস্লোর দিকে ফিরে বলে, 'হ্যাঁ, ইউরোপীয় খাবারদাবার আর জামাকাপড় চালিয়ে যাওয়াটা ওদের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তারপর সে খেয়ে যেতে থাকে। হানস্লো ঠিক নিশ্চিত হতে পারে না যে পরিহাসটা ঠিক জায়গায় লেগেছে কিনা এবং আফ্রিকানটির মুখমণ্ডলে তার কোনোরকম আভাস খোঁজ করেও অসফল হয়। স্যান্ডারসন কিছু কথা বলে, 'সংসার চালানোর অস্বাভাবিক খরচ বৃদ্ধির ব্যাপারটা উঁচুনিচু সমস্ত শ্রেণীকেই নাজেহাল করেছে, একমাত্র ভীষণ ধনীদের ছাড়া। যাদের মধ্যে আমার তো মনে হয় না আমাদের কেউ পড়ে। চলুন উঠে ভেতরে যাওয়া যাক, তারপর আরেকটু আরামদায়ক চেয়ারে বসে কফি খাওয়া যাক।'

হানস্লো বিশ্রাম নেবারই সিদ্ধান্ত নেয়, কেননা সে অভদ্র হতে চাইছিল না। তাছাড়া, আফ্রিকানরা সত্যি সত্যিই কী ভাবে—এটা জানতে সে খুবই উৎসুক; কেননা এইরকম একটা সামাজিক পরিস্থিতিতে কোনো আফ্রিকানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সে একেবারেই পায় নি। বারবারই সে হিউজেসকে প্রশ্ন করে যায় অমুক ব্যাপারে বা তমুক বিষয়ে আফ্রিকানরা কী ভাবে। অন্যদিকে হিউজেসও শান্তভাবে উত্তর দিয়ে যায়, সম্প্রতি সে এতটাই কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিল যে তার নিজেদের লোকেদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছে। এই উত্তরে হানস্লো তীক্ষ্ণ চোখে আবার দেখার চেষ্টা করে এই কথায় আপত্তিজনক কিছু আছে কিনা। নিজের মনে সে বলে, সমস্যাটা হল এইসব শিক্ষিত কালা আদমিরা কখন কোন কথায় দুর্বিনীত হয়ে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। এদের সবায়ের মুখেই ঐরকম একটা বিনয়ের মুখোশ লাগানো থাকে; সত্যি কথাকে মেনে নেবার মত সাহসই নেই এদের। কিন্তু যত রাত্রি বাড়তে লাগল এবং আরেকটি হুইস্কির বোতল যখন খোলা হল, পরিবেশটাও খানিকটা হালকা হয়ে এল। স্যান্ডারসন হঠাৎ হিউজেসের দিকে ঘুরে বলল, 'আপনি তো নিজের দেশেই পড়াশুনো করেছেন, তাই না ? অর্থাৎ বৃটেনে। কোথায় ছিলেন আপনি ? লন্ডনে ?'

'হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময়টাই আমি ছিলাম লন্ডনে, অক্সফোর্ড সার্কাসের

কাছেই একটা বেশ বড় পলিটেকনিকে। ক্লিফ্‌লউডের খনি অঞ্চলে থাকতাম, সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে বাসে করে কলেজে আসতাম।'

'আপনাদের ওখানে কি বেশ বড় বড় খনি ছিল?' স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করে।

অক্সফোর্ডের পুরনো বাসিন্দারা এখন অতীতের স্মৃতিচারণায় একেবারে জমে গিয়েছে, হ্যানস্লো খানিকটা বিরক্তি নিয়েই ভাবে, এবং সোফায় শরীরটাকে টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে আরাম খায়। সে হয়তো এখনই প্রশ্ন করে বসবে: 'তোমাদের কলেজের প্রথম পনেরোজন কেমন ছিল?' এবং কালো মানুষটা হয়ত উত্তরে বলবে: 'আসলে পুরনো ছাত্ররা মন্দ ছিল না, পাশ করার ক্ষেত্রে একটু কাঁচা ছিল বটে, কিন্তু খারাপ বলা যাবে না ওদের; আমরা একবার রুসলিন পার্কের ছবি এঁকেছিলাম।' হ্যানস্লো একধরনের কাঠিন্য নিয়ে নিজেই বোতল থেকে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে নেয়।

'অনেকগুলো ঘরের দরজা আমার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই আমি একটা ঘর পেয়ে যাই,' হিউজেস উত্তর দেয়। 'বেশ আরামদায়ক ছিল ঘরটা, আর বাড়িউলীও ছিল বেশ ভদ্র সভ্য।'

স্যান্ডারসন মৃদু হাসে। 'কী আশ্চর্য ঘটনার গতি,' সে বলে। 'কিন্তু আসল কথা হল এই থাকার সমস্যা ছাড়া ইংল্যান্ডে সময়টা ভাল কেটেছে আপনার?'

'হুম, প্রথম দিকে ততটা ভাল কাটে নি,' হিউজেস স্বীকার করে, 'তবে পরের দিকে ঠিক বলতে পারব না। ইংল্যান্ডের লোকের অভ্যর্থনা কেমন হবে সেই সংক্রান্ত একটা অনিশ্চিতি আমাদের খুব ধাঁধায় ফেলে দিত। কখনো হয়ত কোনো ভদ্র অমায়িক লোক দু-হাত বাড়িয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু অন্য-দিকে আবার হঠাৎ হঠাৎই হোঁচট খাবেন তাদের ব্যবহারে। সবথেকে খারাপ ব্যাপার হল, লোকে এমনভাবে আপনাকে এড়িয়ে যাবে যে যেন কোনো সাংঘাতিক ধরনের ছোঁয়াচে রোগ আছে আপনার। এমনই তারা নির্বিকার আর দূরের লোক।'

স্যান্ডারসন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তার গেলাস ভর্তি করে নেয়। 'আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন,' গেলাসে চুমুক দিয়ে সে বলে এবং আলোর সামনে গেলাসটাকে তুলে ধরে। 'লন্ডনে আমিও কয়েকমাস কাজ করেছি, লোক-গুলোকে আমার মনে হয়েছে যেন বড় বেশি গম্ভীর আর দূরের। আমি তো এক একসময়ে ভাবতাম যে আমারই কোনো দোষ আছে নাকি। শহরের লোকেদের ব্যবহার বড় অদ্ভুত, বুঝলেন হিউজেস। তাদের দেখলে মনে হয় তাদের চারপাশের খোলা জগতের মোকাবিলা করার জন্যই যেন তারা গম্ভীর আর লাজুক সেজে থাকে। আর ধরাবাঁধা ছকের একটু বাইরে কোনো জিনিস হলে, এই ভাবটা যেন আরো বেড়ে যায়, যেমন ধরুন কোনো কালো রঙের লোক হলে তো কথাই নেই।'

হানস্লো মুখ টিপে হাসে। 'বাই জোভ, তুমি তো দেখছি খাঁটি অক্সফোর্ডের মানুষ, স্যান্ডারসন,' সে বলে। 'নিজে রাস্তা তৈরি করে স্বর্গে যাবেও, আবার সেখানে গিয়েও তাকে নরক বলে গালাগালি করবে।' নিজের কথায় সে নিজেই হাসে, এবং তারপরেই ক্রোধে তার মুখ হঠাৎ যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়। 'নালিশ করার মত আপনার কিছু নেই,' হিউজেসকে সে বলে। তারপর স্যান্ডারসনের দিকে ঘুরে বলে, 'তোমারো নেই। ইংল্যান্ডে যদি কেউ বিরক্ত হয়ে থাকে তো সে আমিই। কেনিয়াতে আমি বড় হয়েছি, তা হলেও ইংল্যান্ডকেই সবসময়ে নিজের দেশ বলেই ভেবে এসেছি, এবং আমাদের দেশের একজন বৃদ্ধের কাছে সেখানকার গ্রামগুলো সম্পর্কে আর আমাদের বংশ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু আমি যখন স্কুলে পড়তে সেখানে যাই তখন কেউই কিন্তু আমাদের ঐসব ভাললাগার জিনিসগুলোকে পাত্তাই দেয় নি।' চেয়ারে সে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। সে বলে, 'স্কুলটা আমার মতে তেমন অবশ্য ভাল ছিল না। কিন্তু পাবলিক স্কুল তো ছিল বটে। হেডমাস্টারের কনফারেন্স হ্যানত্যান সব হত। কলোনির মধ্যে এটা বেশ বড় স্কুল ছিল। এবং যেসব ছেলেদের বাবামায়েরা বিদেশে থাকত তাদের ছুটিতে বাবামায়ের কাছে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কম দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। আমার বাবা ছিলেন একেবারে নিজে তৈরি মানুষ, স্কুল খুব অল্প বয়সেই ছেড়েছিলেন, তিনি যখন এই স্কুলটার কথা শোনেন তখন ভেবেছিলেন নিজের যে লেখাপড়াটা হয় নি সেটা আমাদের দিয়েই করাবেন।'

'স্কুল ছাড়ার পর কি তুমি পূর্ব আফ্রিকায় ফিরে গিয়েছিলে?' স্যান্ডারসন প্রশ্ন করে।

'না, আমি একটু বেশিদিনই ওখানে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারস্যাপার কখনই ঐ একরকম ছিল না। একটা সময়ে আমি একটা রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলাম, কিন্তু ভাল লাগে নি সেটা। ওরা ভেবেছিল আমি একেবারেই আনাড়ি। বাবাদের সময়ের থেকে এখনকার লোকেরা এতটাই বদলে গিয়েছে। বাবাদের ধ্যানধারণা ছিল অনেকটা আমাদের মত কলোনিয়ালদের ধ্যানধারণার মত। অর্থাৎ, অবশ্যই সাদা কলোনিয়ালদের মত,' সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে।

'আর, আপনি যা আশা করেছিলেন তার থেকে কেমনভাবে এটা বদলে গেল?' হিউজেস কথোপকথনের জন্যেই কথা বলে।

'সবরকম ভাবেই,' কিছুক্ষণ থেমে থেকে হানস্লো উত্তর দেয়, আর ঐ থেমে থাকার মধ্যেই নিজের মনে ভেবে নেয় এই কথাবার্তার মধ্যে হিউজেসকে অনুপ্রবেশের স্বাধীনতা দেবে কি না, এবং ভাবার পর এই সিদ্ধান্তে আসে যে স্বাধীন ও সহজ সামাজিক সম্পর্কের খাতিরে এই আফ্রিকানটি একটি সন্ধ্যার জন্যও অন্তত একজন সম্মানীয় সাদা মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। 'সবরকমভাবেই,' চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে কথাটা সে আবার বলে আর মাথা নাড়ে। তারপরে স্যান্ডারসনের হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে, 'তুমি কি জানো, এক সন্ধ্যায়

একটা শো-এর শেষে যখন জাতীয় সংগীত হচ্ছিল তখন একটা লোক আমায় কনুইয়ের ধাক্কায় বের করে দিয়েছিল ? আমি একটা রো-এর একেবারে শেষে দাঁড়িয়েছিলাম, লোকটাই আমার কথা বলল । সে বলল তাকে নাকি বাস ধরতে হবে, সেজন্য আমাকে তার রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে । আমিও নড়ব না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে । লোকটা ঝুঁকে আমার কানে মুখ এনে বলল, 'কোম্পানি অ্যাট ইজ' ! একেবারে চালু ভাষায় । আমি একতিলও নড়লাম না, তখন সে আর তার দলবল সিটের ওপর দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে ভিড় জমাল । ওরা নিশ্চয়ই কম্যুনিস্ট হবে । জাতীয় সংগীতের শেষ শব্দ "রাজা" কথাটা শেষ হতে না হতেই আমি হলের বাইরে ছুটে গেলাম লোকটাকে ধরে ধোলাই দেব বলে । কিন্তু ততক্ষণে ওরা চলে গেছে । এরকম একটা ব্যাপারে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম,' পিছনদিকে হেলে হানস্লো বলে । 'না, পুরনো দেশটা কিন্তু ওরকম নেই আর । বড্ড বেশি স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্রের কথা বলে, চাল মারে, কাজের বেলায় ভোঁ ভাঁ ।'

'আমার মনে হয় না ওরা অতটা খারাপ,' স্যান্ডারসন খোঁচা মারে, তার মনে হয় ব্যাপারটা তারই কবজায় এসে গেছে । 'বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাপারগুলো বদলে গেছে দেখতে পাবে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, খোদ লন্ডন আর গ্রামের দিকটা কিন্তু একই রকম রয়ে গেছে ।' তারপর হিউজেসের দিকে ঘুরে বলে, 'আপনার কী মনে হয়েছিল লন্ডন সম্পর্কে ?'

'হ্যাঁ, ওখানে আমার কাছে অনেককিছুই আশ্চর্যজনক লেগেছিল । সবকিছুর সংগঠনে আর ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করার ক্ষমতা আমায় মুগ্ধ করেছিল । আপনারা ইংরেজরা খুব দক্ষ । ভোরের দিকে আমি হাঁটতে বেরোতাম আর দেখতাম ট্রাফিক লাইটগুলো সারারাত ধরে হলুদ থেকে লাল, লাল থেকে সবুজ আবার হলুদ হয়ে যাচ্ছে । পরীক্ষার জন্য যখন ভীষণ পড়াশুনো করতাম তখন শুতে যাবার আগে ভোর দুটো কি তিনটে নাগাদ মাথাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্য বাইরে বেরোতাম । একদিন আমি দেখি একটা বিশাল লরি রাস্তার মোড়ে সামনের দিকে লাল আলো জ্বলতে দেখে থেমে গেল । রাস্তায় কেউই ছিল না তখন, কোনো পুলিশকেও ধারেকাছে দেখা যাচ্ছিল না, আর আমি ছিলাম ছায়ার নিচে । লরিটা কিন্তু থেমেছিল উলটোদিকে আলো জ্বলতে দেখেই । এটাকেই আমি বলি সংগঠনীবোধ অথবা শৃঙ্খলাবোধ, এবং ভাল জিনিস সম্পর্কে সচেতনতা । আমি কোনোদিনই সেই মুহূর্তটা ভুলতে পারব না । আরেকটা আছে ঐরকম মুহূর্ত যেটা আমার কাছে লন্ডন আর সেখানকার ইংরেজদের পরিচয় এক ঝলকেই মেলে ধরেছিল ।' কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করে ঘরটিতে, অন্য দুজনকে দেখে স্পষ্টতই মনে হয় তারা মুগ্ধ এই গল্পে । হিউজেস তার চোখের পাতা সামান্য বোজে এবং আবার ভেবে নেয় সেই ক্রিকল-উড রডওয়ের কথা যাকে সে ভালবেসেছে বেশিরভাগ সময়ে, কিন্তু কখনো কখনো ঘৃণাও করেছে ধূসর শীতের সময় বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে, ভেবে

কাতর হতে হতে। 'লন্ডনের প্রতি,' সে হঠাৎ তার গেলাস উঁচুতে তুলে ধরে বলে।

'লন্ডনের প্রতি,' অন্য দুজনও বিড়বিড় করে বলে, 'ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন!'

'কিন্তু মনে রাখবেন, দেশে ফিরে এসে আমি আনন্দিতই হয়েছিলাম,' হিউজেস কিছুক্ষণ পরেই বলে, তার ভয় হয় যে ওরা তাকে একজন 'কালো ইংরেজ' বলে ভাবতে পারে, আর সেটাতেই ওর সবচেয়ে বেশি ভয়। 'এমন কিছু ব্যাপার আছে যেটা এই দেশে বসে করা যায়, কিন্তু ইংল্যান্ডে বসে করা করা যায় না।'

'যেমন?' কিছুটা উৎসাহ নিয়েই হানস্লো জিজ্ঞেস করে।

'ধরুন, এখানে কোনো জিনিস আপনি একলার হাতে শুরু করতে পারেন এবং নিজের চোখের সামনেই সেটাকে শেষ করতে পারেন, কিন্তু ইংল্যান্ডে সেটা করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একজন প্রতিভাবান হতে হবে।'

'আমি এখানে শুরু করা আর শেষ করার ব্যাপারে কিছুই জানি না,' স্যান্ডারসন আরম্ভ করে।

হিউজেস বাধা দিয়ে বলে, 'আমি একটা সেতু বানিয়েছি এখানে। গত বছর এই জেলা দিয়েই আমি এখান থেকে প্রায় চারমাইল দূরে ওলাহ্নন রোডে এসেছিলাম, ওখানে একটা মরা নদী আছে, শুখনা সময়ে লোকে তার ওপর দিয়ে একটা বড় বাজারে যেতে শর্টকাট করে, কিন্তু বর্ষার সময়ে সেটা হেঁটে পার হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত, তখন আরো কিছুটা ঘুরপথে একটা দড়ির সেতু দিয়ে পার হতে হত, তাতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় বেশি লেগে যেত। আসলে, এই কারণেই পুরুষের পর পুরুষ ধরে বর্ষার সময়ে এই জেলাতে ছোটখাট দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত, কেননা অধিকাংশ লোকে ঐসময় তাদের শস্য বিক্রি করে খাবার কিনে আনার জন্য বড় শহরের দিকে যেতেই চাইত না অথবা যেতে পারত না। আমি বুঝি না যে এখানে একটা সেতু তৈরি করার কথা কেন কেউই একবার চিন্তা করে নি আগে কখনো।'

'বোধহয় বর্ষার সময়ে হয়তো ভাবত, কিন্তু শুখনোয় আবার ভুলে যেত। এদেশে ওটা প্রায়শই ঘটে থাকে। অথবা লোকে বোধহয় এই অবস্থাটা মেনেই নিয়েছিল।'

'তাহলে আপনিই সেতুটা তৈরি করেছিলেন! আমি প্রায়ই ভাবতাম এটা নিয়ে,' স্যান্ডারসন বলে। 'আমি ভেবেছিলাম সেনাবিভাগ বানিয়েছে বুঝি, ওটা কিন্তু ঐসব লোকদের পক্ষে বড়ই বেশি মজবুত।'

'আমার মনে হয় এটার জন্য এখানকার অনেক উন্নতি হয়েছে, তাই না?' হিউজেস খানিকটা বিজয়ীর ভঙ্গিতেই প্রশ্নটা রাখে।

স্যান্ডারসন ভেবে নেয় সত্যিকথাটা এখানে না বলাটাই শ্রেয় হবে কিনা, কারণ গ্রামের লোকেরা আসলে সেতুটাকে খুব কমই ব্যবহার করে, কেবল মোটরগাড়িই

যাতায়াত করে ওটা দিয়ে, ঠিক ঐ জায়গাটাতেই কয়েকবছর আগে একটা লোক নদীতে ডুবে মারা যায়, এবং তার থেকেই একটা কিংবদন্তি চালু হয়ে যায় যে বর্ষার সময়ে ওখানে কোনো জলদেবী-টেবী গোছের কেউ থাকে।

প্রকাশ্যে সে বলে, 'হ্যাঁ, কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে বটে।'

'আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক তাড়াতাড়ির মধ্যেই এটা হয়েছে,' হিউজেস বলে। 'আপনারা কি জানেন কয়েক বছর আগে ওখানে কেউ একজন ডুবে গিয়েছিল? আর তখন থেকে লোকেদের ধারণা হয়েছে যে ওখানে আশে-পাশেই কোনো উপদেবতা এসে ডেরা বেঁধেছে। আসলে, শ্রমিকরা ওখানে কাজ শুরু করার আগে ঐ জায়গায় একটা মুর্গি বলি দিতে আর মাটিতে একটু রাম ছড়িয়ে দিতে ডাকসাইটে একজন ওঝাকে ভাড়া করতে হয়েছিল আমায়।'

হানস্লো এই সময়ে বিনয়-মেশানো একটু পরিহাসের ছলে বলে, 'আপনি তো জানেন যে শ্যাম্পেনই আমরা বেশি পছন্দ করি। জাহাজ জেটি থেকে ছেড়ে গভীর জলে নামার সময়ে ঐ শ্যাম্পেনের বোতলটি জাহাজের সামনের ছুঁচোলো অংশটায় ভেঙে ঢালি আমরা, নিছক ঐ প্রাচীন ভগবানদের তুষ্ট করার জন্য। আপনাদেরই মত হে সেকেলে, মহাশয়: একেবারেই আপনাদের মত।'

'অবশ্যই, সেই সন্ধ্যায় আমি ঐ মুর্গিটা আর রামের বাকি অংশটা পেয়েছিলাম,' হিউজেস বলে, সে এটা দেখানোর চেষ্টা করে যে তার অধীনস্থ শ্রমিকদের নিয়ে রসিকতা করার উদ্দেশ্যে নিছক খেয়ালী একটা ঘটনা হিসেবে সে এটাকে নিয়েছে, মুহূর্তের জন্যেও সে এটাকে গভীর কোনো বিষয় হিসেবে দেখে নি। একই সঙ্গে সে এটাও ভেবে নেয় যে হানস্লো অনেকটাই যেন বিনয়ী হয়ে উঠেছে, ইংরেজ রীতিনীতির সঙ্গে এটাকে তুলনা করার চেষ্টা করে। সে নিজেই একটা নতুন জাহাজকে জাহাজঘাটায় ভিড়তে দেখেছে, এবং আশ্চর্যও হয়ে গেছে ওটা দেখে। অবশ্য এই উৎসবের সঙ্গে সহজ সরল বিপথগামী দেশী লোকেদের একটি সাদা মুর্গির রক্ত আর রাম ঢালার ঘটনার তুলনাটা এক্ষেত্রে আসে না।

'আমি আপনাদের বেশ ঈর্ষা করি, এই আপনাদের মত ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, কৃষিবিশেষজ্ঞদের এবং এ-ধরনের লোকেদের,' স্যান্ডারসন বলে। 'আপনারা কোনো একটা জিনিস শুরু করেন, শেষ করেন, আবার তার ফলশ্রুতিও দেখতে পান। আমরা তা কখনই পারি না। এমনকি আরম্ভ করেছি কিনা তা আদৌ জানতে পারি না। শেষ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাই। আমরা সত্যি সত্যিই জানিও না যে আমরা নিছকই বাহুল্য কিনা।'

হিউজেসের মনে লাগে। 'আহা, তা নয়,' সে বলে ওঠে। 'আপনারা হলেন পরিচালক, সে সাদাই হোন আর কালোই হোন। পরিকল্পনা তৈরি করা আর কুলিমজুরদের সামলানোর জন্যে আপনাদের প্রয়োজন হবেই। আমরা যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসব, ইঞ্জিনিয়র হিসেবে সেদিন আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে। তখনই একমাত্র আমরা আপনাদের কাজটা শিখতে শুরু করব, কী করে পরি-

চালনা করতে হবে। কিন্তু আমাকে এবার উঠতে হবে,' সে প্রায় লাফিয়েই উঠে পড়ে। 'কাল খুব ভোরে আমায় তৈরি হতে হবে, আমি জানি আপনারা আমায় মার্জনা করবেন।' দুজনের সঙ্গেই সে করমর্দন করে, এবং সে-রাত্রিতে তাকে থাকতে দিতে পারে—স্যান্ডারসনের এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সে ঝটিতি অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদিকে হানস্লোও আরেকজনের হুইস্কি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রাস্তার জন্য ওটুকু পান করতে অনুরোধ জানিয়েছিল।

আফ্রিকানটি চলে যাওয়ার পর হানস্লো ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করতে থাকে, ছোটখাটো হোঁচটও দু-একটা খায়। তারপর সে হঠাৎই স্যান্ডারসনের সামনে এসে থেমে যায়, স্যান্ডারসন তখন খুব ধীরে ধীরে একটা পাইপ টানছে। 'তুমি কি জানো,' কথাটা হানস্লো এমন এক অবসাদগ্রস্ত গলায় বলে যে অন্যজন খানিকটা চমকে তার দিকে তাকায়। 'মিনিট কয়েক আগে যে-কথাটা তুমি বলেছ তার সারার্থটা কী তুমি জান, এই হতভাগা দেশটায় নিজেকে একজন অতিরিক্ত বলেই ভাবতে আরম্ভ করেছি আমি!' সে বসে পড়ে এবং টেবিলের কানায় তার মাথাটা রাখে, শরীরটা তার চেয়ারে যেন হালকা হয়ে ঝুলে থাকে।

'কিন্তু তুমি তো আর পরিচালক নও,' স্যান্ডারসন বলে। 'একটা বেশ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় ফার্মে তুমি একজন সিনিয়র এজেন্ট।'

'না, আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবছি অন্য একটা দিক থেকে, আজকের সন্ধ্যায় আমাদের এই বন্ধুটির মত শিক্ষিত এদেশী লোকেদের সঙ্গে বিশেষ করে যখন আমার দেখা হয় তখনই। ওরা আমাদের শিশুদের মত শিখিয়ে গেছে যে আফ্রিকা সাদা মানুষদের দেশ ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধীরে সুস্থে অথচ নিশ্চিতভাবে ঐসব কালো মানুষদের আমরাই সাহায্য করেছি এবং শিক্ষিত করে তুলেছি। শত শত বছর ধরে নাকি আমাদের এই লাভটুকুই হয়েছে। কিন্তু এখানে আমার জীবৎকালেই দেখলাম এই লোকগুলোকে এমনভাবে শেখানো হয়েছে যে তারা সবকিছুই করতে পারে, এবং মজাটা হল যে তারা এখন নিজেরাও ওদের বেশ ভাল শিক্ষা দিচ্ছে। মনে রাখবে, আমি বলছি না যে তারা আমাদের মতই ভাল পারছে। তারা তা হতেও পারবে না।'

'হ্যাঁ,' খুব তাড়াতাড়ি স্যান্ডারসন বলে যায়, 'যেমন আমরা চেষ্টা করলেও ওদের মত হতে পারব না। আমরা আর ওরা—দুপক্ষই একেবারে ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই যে যার মত করে ভাল।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে হয় তোমার মত পদাসীন লোকের পক্ষে তুমি ঠিক এই কথাই বলতে পার,' হানস্লো উত্তর দেয়। 'কিন্তু তুমি যাই বলো না কেন আমার তো মনে হয় না যে মাত্র এক পুরুষেই ওরা এটা করে উঠতে পারে, বুঝলে হে বন্ধু; ব্যাপার গুরুতর দেখলেই ওরা সব ভেঙে নয়ছয় করে দেবে। ঐ যে হিউজেস লোকটা, ওকেই দেখো না। জলের জুজুর ভয়েই তো ও-বেচারা কম্পমান। ওর মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।' সে তার নিজের গেলাস ভরতি করে নেয় এবং সবটুকু গলায় ঢেলে দেয়। 'যাই হোক না কেন, ওরা আমাদের ফালতু বলে

ভাবতে বাধ্য করছে, একেবারে ফালতু। তোমরা হোয়াইট হলের লোকেরা বুঝতেই পারছ না যে তোমরা আমাদের, যারা তোমাদেরই সব আত্মীয়পরিজন, তাদেরই বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে এই চাকরিটা পেতে আমার কী দুর্ভোগই না পোয়াতে হয়েছিল। আর এখন কিনা হেডকোয়ার্টার্স আফ্রিকান এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছে। আমি যেন বুঝি না ওরা কী বলতে চায়! তোমরা কেন সব সময়ে ভাল সাজবার চেষ্টা করো বলো তো। সব সময়ই আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ!' সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্যান্ডারসন প্রথমে যেন লক্ষ্যই করে নি এমন ভাব দেখায়; তারপর ভান ছেড়ে দিয়ে উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, এবং তার কাঁধে হাত রাখে। 'তোমার কি মনে হয় না যে একজন চিউজেস বা একজন তুমি বা আমির থেকে এই দেশটা অনেক বড়? চিউজেসকে এখানে আসতেই হবে কেননা এটা ওর দেশ। তুমি এখানে এসেছ কেননা কোনো মানুষই তার নিজের দেশে সব-কিছু করে উঠতে পারে না। আমার মনে হয় একটা মানুষ একটা নির্দিষ্ট দেশের—এই ধারণাটা একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকে এবং আমরা সবাই এই সময়টার মধ্যে দিয়েই পেরিয়ে এসেছি। আমরা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই সময়টা কাটিয়ে এসেছি। যে কোনো মানুষেরই ক্ষেত্রে কেবল তার দেশের গাঁ-গঞ্জ আর কিছু ফালতু জায়গা তার নিজের বলে থাকে চিরদিন। মাটির রস হল তারই যে সেটাকে ঠিকমত নিতে পারবে এবং যে-ই কোনো দেশের মাটির রস নিতে চেষ্টা করবে সেই দেশটা তখন তারই। বংশগতিকে পাওয়া লোকের থেকেও তারই অধিকার বেশি। সবথেকে ক্ষমতাবান বিদেশী মানুষদের চিরকালীন ক্ষমতালাভের এই সত্য ঘটনার জোরেই বড় বড় সব জাতি বা সুবিধাভোগী শ্রেণী-গুলি চিরকাল বেঁচে থাকে। এবং হানম্লো, তুমি এখানে সবসময়েই থাকতে পারবে যদি তুমি প্রকৃত অর্থেই ভাল হতে পার, অন্য কোনো কারণেই নয়।'

অন্যজন এই কথাগুলি খুব মনোযোগ সহকারে শুনে যায়। 'এখন ভাবি তোমার মত করে লেখাপড়া শিখলেই বোধ হয় ভাল হত, স্যান্ডারসন। তাহলে হয়তো জানতে পারতাম কোন কথার কী অর্থ হয় এবং সেইমত ব্যবহারও করতে পারতাম। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় এটা একেবারেই সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট-এর ব্যাপার। একটা দুরন্ত অবাধ্য হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং বেরিয়ে যায়, জানালাগুলোয় খটাখট্ শব্দ হয়।

'তাহলে তোমার কি মনে হয় এখানে আমাদের সকলের জায়গা হবার নয়?' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সে বলে। 'আমার তো সন্দেহ হয়; তুমি তাহলে এখানকার একটা খবরের কাগজ পড়ে নিও। কিন্তু যতই যা বলো আর করো না কেন এ-দেশটা তো খারাপ নয়। মানুষ এখানে কোনো না কোনো সময়ে কাজের ফল পায়।'

'আফ্রিকার সম্মানে,' স্যান্ডারসন গম্ভীরভাবে গেলাস থেকে হুইস্কি ঢালে যথোচিত ভঙ্গিসহকারে।

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক, আফ্রিকার সম্মানে; যে-আফ্রিকা সাদা মানুষের দেশ আর কালো মানুষদেরও।' হানস্লো মাথা নাড়তে নাড়তে গেলাসে চুমুক দেয়। 'যাবার আগে শেষ আরেকটা পেগ, রাস্তার জন্যই বলতে গেলে, সে যোগ করে, যেন সে পরম পরিতৃপ্ত এইভাবে অনবরত মাথা নাড়িয়ে যায়, তবু যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত লাগে তাকে। স্যান্ডারসন বোতলটা তুলে নেয়, কিন্তু দেখে সেটি সম্পূর্ণ খালি।

'কিছু ভাববার নেই,' হানস্লো ঘর্নবিজড়িত গলায় বলে, 'আমরা সোডা দিয়ে খাব এটা।' তার যেন নিজেকে খানিকটা পরিশ্রান্ত, বিষন্ন অথচ সুখী লাগছিল।

স্যান্ডারসন দুটো গেলাসই ভরতি করে ফেলল। মুক্তোর মত ছোট ছোট বুদ্বুদ গেলাসের কানায় কানায় ভরে গিয়ে উপচে পড়ার উপক্রম হয়। চুমুক দিতে গিয়ে হানস্লোর নাসারন্ধ্রে বুদ্বুদগুলো মিলিয়ে গেল, এবং সে পরম সুখানুভূতিতে মুখবিকৃতি করল।

'এই পেগটা এবারে কার সম্মানে?' স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করে।

'এটা তোমার, তোমার সম্মানে, ওহে বন্ধু ভাম,' হানস্লো আদুরে গলায় বলে। 'হে বন্ধু, ওটি তোমার এবং আমার সম্মানে,' সে বিড়বিড় করে বলে।

'এবং ওনু হিউজেসেরও?' স্যান্ডারসন তার সঙ্গে যোগ করে।

'হ্যাঁ, তারও সম্মানে,' হানস্লো এ-প্রস্তাবে রাজি হয়। 'আসলে সব জায়গার সমস্ত ভালমানুষদের সম্মানেই। আমরাই সেই প্রাণময় ভালমানুষ,' গাড়ির চাবি খুঁজতে খুঁজতে সে মন্ত্রোচ্চারণের মত বলে যায়।

স্যান্ডারসন তার বাংলোর ছোট্ট আঙিনা দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে। 'তুমি ঠিক জানো যে তুমি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে?' সে জিজ্ঞেস করে হানস্লোকে।

'নিশ্চয়ই, চোখ বুজেও আমি চালিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি এটাকে। তুমি বরং আমাদের একটা ধাক্কা দাও, এই গাড়ি ভদ্রলোক তো নেহাত মন্দ নয়!'

স্যান্ডারসন বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ গাড়িটাকে ঠেলা দিতেই সেটা প্রাণ পেয়ে যায় এবং ছুটতে শুরু করে দেয়। শহরের দিকে যাওয়ার রাস্তার ঠিক উলটোদিকে গাড়িটা ছুটে যায়, এবং স্যান্ডারসন চেঁচিয়ে হানস্লোকে থেমে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিতে বলে। কিন্তু ততক্ষণে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, কেবল দূরে থেকে তার আওয়াজটা ভেসে আসে। অন্যমনস্কভাবে স্যান্ডারসন বাংলোর ভিতরে আসে এবং বিছানা করতে আরম্ভ করে।

হানস্লো গিয়র বদলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে নেয় এবং আওয়াজ করতে করতে গাড়িশুদ্ধ একটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ইঞ্জিনের ধুকপুকানি যেন তাকে এক অনাস্বাদিত ক্ষমতার ইন্ধন যোগায়, ঠিক ঝলকে ঝলকে দমকা হাওয়ার মত করে। সে জানে সে কোথায় যাচ্ছে, মাথা অদ্ভুত পরিষ্কার ঝরঝরে লাগে তার। মিনিট পনের পরে গাড়িটাকে সে আস্তে আস্তে থামায়। স্টিয়ারিঙের ওপর সে ঝুঁকে পড়ে এবং ঝিঁঝির তীক্ষ্ন আওয়াজ আর ব্যাঙের গভীর খাদে-বাঁধা কর্কশ

শব্দ শোনে। সেই শব্দও হঠাৎ মাঝে মাঝে থেমে যায় আর ভারি বাতাস সে-সময়ে যেন এক অলৌকিক নৈঃশব্দ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখেই সে-আলোর রেশ ধরে সামনের সেতুটাকে পরীক্ষা করতে ধীরে ধীরে সেই দিকে এগিয়ে যায়। খুবই সাধারণ একটা সেতু, কিন্তু বেশ মজবুত, প্যাকাপোক্ত এবং দেখতে সেটাকে খুব সহজ সরল অথচ একটু কঠিন ধরনের। সেতুর ঠিক মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায় এবং লাফাতে থাকে প্রচণ্ডভাবে, যেন তার ক্ষীণ ধারণা সেতুটা হয়তো এই লাফানোর ফলে ভেঙে পড়তে পারে। একদিকে একটু ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে পায় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জলরাশি। একটা গাছের ডাল একদিকে ফেলে দিয়ে ছুটে অন্যদিকে চলে যায় স্রোতে কীভাবে সেটা ভেসে চলে যাচ্ছে তা দেখতে, এইসব করার সময়ে সে আনন্দে হাসতে থাকে। তারপর সে ধীরে ধীরে তার গাড়ির কাছে ফিরে আসে। আর ও দিকে ওল্ড হিউজেস এক ছায়াঘন অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল হানস্লোর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া মাত্র, সে অবাক হয়ে যায় এই দেখে যে হানস্লো তার উপস্থিতি টেরই পায় নি, তার হৃৎস্পন্দন সাংঘাতিক দ্রুতলয়ে বেড়ে গিয়েছিল। সে পায়ে হেঁটেই শহর থেকে এতদূরে চলে এসেছে তার ভালবাসা আর যত্ন দিয়ে গড়া সেতুটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে। রাত্রির অন্ধকারে সে এসেছে, অন্ধকারকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে শুধু নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করাতে যে জলের জুজুর ভয়ে সে ভীত নয়। হানস্লো যখন ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেল তখন সাদা মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে হিউজেস এক অদ্ভুত ধরনের খুশি অনুভব করে এবং খানিকটা হতভম্বও হয়ে যায়।

রাস্তার ঠিক মাঝবরাবর যেন ওটা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়, কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে, কী যেন ভাবে, গাড়ির হেডলাইটে গুটিয়ে যায়। ওটাকে নজর করার জন্য হানস্লো ক্ষিপ্রগতিতে চালকের আসনে বসে পড়ে। হিউজেস কোনোরকমে এক বুকফাটা আর্তনাদ সামলে নেয় এবং মুগ্ধদৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে। অদ্ভুত জন্তু ওটা একটা। হরিণজাতীয় জন্তুর মত আকৃতি, কিন্তু পিঠের দিকের রঙটা লালচে-বাদামী গোছের, আর পেটের দিকটা সাদা। দুটো রঙের সীমান্তরেখাটা খুবই স্পষ্টভাবে যেন দাগানো, দেখে মনে হয় জন্তুটা যেন এতক্ষণ সাঁতরাচ্ছিল জলে, ফলে পেটের দিকের রঙটা উঠে গেছে। কমনীয় ঘাড়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে-থাকা উদ্ধত মাথাটিতে সরু বাঁকানো দুটি শিঙ। দুই নিতম্বের নিচের অংশটুকুতে কালো লম্বমান রেখা আঁকা এবং তা জন্তুটির লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ওটা দাঁড়িয়ে থাকে। হানস্লো খুব জোরে তার হর্ন বাজাতেই জন্তুটি শূন্যে একবার লাফিয়ে উঠেই সামনে ধেয়ে যায়, এবং যেমন হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনি হঠাৎই সেটি অদৃশ্যও হয়ে যায়, যেন গোপন কোনো স্মৃতির মতই।

'ও, এটাতো নেহাতই একটা লাল হরিণ,' হানস্লো বেশ চিৎকার করেই বলে নিজের মনে চিন্তা করতে করতেই। গাড়িটা স্টার্ট দেয়, রাস্তার ধার দিয়ে গাড়ির

মুখ সন্তর্পণে উলটোদিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং বেশ ঋজু ভঙ্গিতেই শহরের দিকে এগিয়ে যায়।

হিউজেস সেতুটার ওপর উঠতে উঠতে ভাবে একটা নেহাত লাল-হরিণ বা ইম্পালা তাদের ভয় খাইয়ে ছেড়েছিল। নিজের সঙ্গে সর্বদাই বয়ে-বেড়ানো স্পিরিট-লেভেল মাপার যন্ত্রটিকে সে সেতুটির একধারের রেলিংয়ের ওপর বসায় এবং তার ওপর টর্চের আলো ফেলে। যন্ত্রটার ভিতরে হাওয়ার বুদ্বুদটি খানিক-ক্ষণ এধার-ওধার নড়াচড়া করে ঠিক মধ্যভাগে স্থির হওয়াতে সে খুশি হয় এবং মাথা নাড়ে। তারপরই কিছুটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই সে রেস্ট-হাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করে দেয়। হঠাৎ সে থেমে যায়, একটা হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য বাড়িয়ে রাখে, এবং তারপরেই বেশ জোরেই ছুটতে আরম্ভ করে। কেননা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে, বৃষ্টির ধারাটা যেন গর্বিত কোনো মহিলার ধীর শান্ত কান্নার মত, গর্বিত তার একমাত্র পুত্রের চিত্তবিক্ষেপের জন্য, তবুও কিছুটা যেন দুর্বোধ্যভাবেই ভীত সন্ত্রস্ত।

ই ভি স্টোন

বিষয় ॥ রূপকথা

আফ্রিকার সমস্ত উপজাতি লোকগাথায় সমৃদ্ধ। আধুনিক আফ্রিকানরা অনেকে লোক-সংস্কৃতির আঙ্গিককে আধুনিক সাহিত্যের বাহন করবার পরীক্ষায় রত। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতিভিত্তিক শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যালঘু-শাসনের প্রতিবাদ, বলা বাহুল্য, সমাজসচেতন সাহিত্যিকদের শিল্পরচনার মূল সুর। সেই অমানবিক নীতির প্রতি তির্যক আক্রমণ নিচের লেখাটিতে লভ্য।

বনের গভীরে থাকত এক হায়না। বড় বুদ্ধি তার, ধূর্তও কম নয় সে।

একদিন বনে বেড়াতে বেড়াতে পথে একটা সিংহের বাচ্চাকে পেয়ে গেল সে। প্রথমে ভাবল, খাই এটাকে। কিন্তু বুদ্ধি খেলল তার মাথায়, বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে নিজের ডেরাতে ফিরে গেল। ঠিক করল, সিংহটাকে তালিম দিয়ে বেশ হুকুমের চাকর বানাবে, চালাক হায়না তো! আবার খুব দয়ালুও বটে, ভাবল এমন প্রভুকে সেবা করবার সুযোগকে সিংহ পরম পুণ্য বলে মানবে।

বেড়ে উঠল সিংহ, দেখা গেল সব ঠিকমত চলছে; সিংহ প্রাণী মারে, তার সিংহভাগটা হায়নাই খেয়ে নেয়, এতে করে হায়না সিংহকে বদহজম থেকে বাঁচায়। যখনই সিংহ ভাবে আসলে কে কী, তখনই হায়না তার লেজ ঝাঁকিয়ে দিয়ে মনে করিয়ে দেয়—এই যে সিংহের এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর বদহজম থেকে রেহাই পাওয়া—এ তো হায়নার আত্মত্যাগেরই ফল। সিংহটা ঘাবড়ে যায়, এসব ব্যাপার বুঝতে তার বহুৎ সময় লাগে, তার তো অত মাথা নেই হায়নার মত; শেষমেষ মেনে নেয় ও যা বলছে তাই ঠিক।

একদিন হায়না ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে সিংহের মাথায় দুর্বুদ্ধি জাগল। গিন্নি বলছেন সিংহের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত। 'সত্যি বাপু,' তিনি বললেন কর্তাকে, 'ঐ নদীর ধারে কাদার মধ্যে ওকে তুমি শেকলে আটকে রাখো, ওতে কি ওর ভাল ঘুম হয়? তাছাড়া এই যে ওকে কলা খেতে দিতে শুরু করেছ, এতে কিন্তু ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলছি!' 'বাজে কথা রাখ,' হায়না বলল, 'সিংহটাকে তুমি কি আমার চেয়ে বেশি জানো? বসতে পেলে শুতে চাইবে। ওর পক্ষে কড়া শাসনই ভাল।' হায়নাগিন্নি তবু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। ওর মতে সিংহটাকে পেট পুরে মাংস খেতে দিলে, একটু

ভাল বিছানায় শুতে দিলে সেটা হায়নাকুলের পক্ষে মঙ্গলই হবে। অবশ্যই সিংহটাকে স্বাধীনতা দেবার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা শ্রীমতি হায়না ভাল করেই জানেন সেটা সিংহের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ভাল করে বিবেচনা করে দেখলেন সেটা হায়নাদের পক্ষেও মঙ্গলকর হবে না। দুজনের কেউই এ-ব্যাপারে সিংহ কী ভাবে তা জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন বলে মনে করলেন না, কেননা সিংহদের মাথায় কোনো ভাবনা নেই, যদি কোনো ভাবনা থাকে তা শুধু দুষ্টুবুদ্ধি।

সিংহ ভাবতে শুরু করল, হায়নারা বড় বজ্জাত। কিন্তু সে ভুল করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝল কত ভাল ওরা—কলার মত খাদ্যের চেয়ে অনেক ভাল।

(২)

একদা এথনোরিয়া নামক একটা রাজ্য ছিল। রাজ্যের গতিক ভাল নহে, কারণ অচিরে প্রমাণিত হইল যে অবাধ মেলামেশা এবং যথেচ্ছ বিবাহের ফলে মনুষ্য-কুলের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী—যথা, অহংকার, স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

প্রাথমিক প্রতিবন্ধক হিসাবে দীর্ঘনাসা ব্যক্তিগণকে পৃথক করা হইল, কারণ জাতির পক্ষে নাসিকা-নিম্ন অঞ্চল অবলোকনের ক্ষমতা লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। সেইভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের অদূরদর্শিদিগের হইতে, দীর্ঘাঙ্গদের হ্রস্বকায় হইতে, নীললোচনদিগকে বাদামীচক্ষুদিগ হইতে, লোমশ ব্যক্তিগণকে মাকুন্দা মানব হইতে, পশ্চাতে বক্রপদসম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রবক্রপদ মানব হইতে, ল্যাটাদিগকে ডানহাতিগণ হইতে, ষণ্ডামার্কাগণকে প্যাকাটিসদৃশগণ হইতে পৃথক করা হইল।

এবম্প্রকার নীতি পর্যায়ক্রমে কার্যে পরিণত করা হইল। প্রতিদলের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইল। কচিৎ কখনো ইত্যাকার আইন অমান্য করিবার অপচেষ্টা হইল বটে। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল। রাজা তার শীলমোহরে লিখিলেন: 'বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি দৃঢ়, ঐক্য পতন আনে'।

এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার একটিমাত্র পন্থা বাকি ছিল, পুরুষজাতি হইতে স্ত্রীজাতিকে পৃথকীকরণ। ফলে সমগ্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইতে পারে এই হতাশাব্যঞ্জক সাবধানবাণী সত্ত্বেও রাজা সম্রাটের সহিত পরামর্শের পর সাব্যস্ত করিলেন যে যাঁহারা এইরূপ সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছেন তাঁহারা গণউত্তেজক ও রাজদ্রোহী। উপরন্তু জলযানকে ডুবিতে হইলেও পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন রাখিয়াই তাহা নিমজ্জিত হউক—এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

একদা এথনোরিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল!

জোনাথান কারিয়ারা

প্রবেশিকা

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সামনে সনাতন আফ্রিকীয় সংস্কৃতি তুলে ধরা ও তাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা আফ্রিকান মানসিকতার একটি বিশেষ দিক, সেই সূত্রেই কারিয়ারা এই ছোটগল্পটিতে প্রাক্-উপনিবেশিক আচারকে তুলে ধরেছেন। কারিয়ারার জন্ম ১৯০৫ সালে। উগান্ডার বিখ্যাত ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ইস্ট আফ্রিকান লিটারেচার ব্যুরোর তিনি অন্যতম কর্মী।

বাঁশের বিছানার ওপর শুয়ে নিরাশি মনে মনে আকাশপাতাল ভাবছিল, ভাবতে ভাবতে ছেলের বুকের ওঠানামা লক্ষ্য করছিল। ওর মুখের রেখাগুলি কঠিন; চোখের দৃষ্টিতে চাপা উদ্বেগ। ঘুমন্ত কিশোর মুলাপোনি, তার একমাত্র ছেলে, ওর দিকে মিরাশির দৃষ্টি নিবদ্ধ। ব্যাটা বড় বেমারে পড়েছে; শিশ্নচ্ছেদের পর আজ চৌদ্দ দিন হয়েছে। মুলাপোনি গা ছেড়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাঁশের খুঁটি দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি খাটের ওপর কম্বল বিছানো। মাথার দিকটা ছোট গাছের গুঁড়ি দিয়ে উঁচু করা, তার ওপর গাছের ছাল ছেঁড়া কাপড়ে জড়িয়ে বালিশ করা হয়েছে। প্রধান ক্যাম্প থেকে গজ ষাটেক দূরে শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি একটা আলাদা কুঁড়েতে তারা রয়েছে।

গায়ের কম্বলের নিচে মুলাপোনির দুর্বল রোগা শরীরটা বেশ আঁচ করা যাচ্ছিল। জন্ম থেকেই ছেলেটা দুবলা, গত দু'হপ্তায় শরীরটা আরো রোগা হয়ে গেছে। ছেলেকে দেখে বাপের মনে হল পালক-ছাড়ানো পায়রার কথা। মাঠে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সেগুলো আগুনে ঝলসে নিত ওর ছেলেও। ছোট্ট খাঁচার মত বুক, শুকনো ঝোপের মত। ওর ক্ষত এখনো শুকোয় নি, হয়তো কখনো শুকোবেও না। এ-বছরের প্রবেশিকা (initiation) অনুষ্ঠানে অন্যান্য ছেলেদের ঘা যথারীতি ছ'সপ্তাহের মধ্যে শুকিয়ে গেছে। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। তারপর ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়া হবে, প্রবেশকরা কৈশোর থেকে দেহে মনে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে যাবে ঘরে, সেখানে সমাজে কৃতী পুরুষের স্থান নেবে। ক্ষত পুরোপুরি না শুকিয়ে বাড়ি ফেরা ছেলের পক্ষে অপমানের, বড় অমঙ্গল তাতে। পরিবারে কারো মৃত্যু হতে পারে সে-কারণে।

ছেলের জন্মের দিনটা ওর মনে পড়ে। লিম্পি শহরে যাবার আগেকার কথা, ক'বছর হবে? বিশ বছর? না, আরো কম। মিস্টার অ্যালিসনের বাবুর্চি হয়ে গিয়েছিল সে। মিস্টার অ্যালিসন গেছেন হোমে, নিজের দেশ বলতে বোয়ানা (স্যার শব্দের সমার্থক বান্টু শব্দ, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুল ব্যবহৃত) সবসময় 'হোম' বলতেন। সাহেবদের কাছ থেকে মিরাশি দুটো জিনিস শিখেছে, নতুন ধর্ম, আর নিজের মতে কাজ করা। কিন্তু লিম্পি ছেড়ে নিজের গ্রামে ফিরে এসে নিজের মত অনুসারে কাজ করা তো হল না। তাদের সমাজের বিধানমত ছেলেকে তো ক্যাম্পে 'প্রবেশিকার' জন্য পাঠাতে হল। মিরাশির বাসনা ছিল সমাজে মাকুয়া (গণ্যমান্য লোক) হবার। কেন থাকবে না, তার পিতিপুরুষেরা কি মুপেটার মাকুয়া ছিল না অতীতে? কিন্তু সে তো আর পিতিপুরুষের মত নেই, সে বদলে গেছে। মুলাপোনিকে অবশ্য শিশ্নচর্মচ্ছেদ করতেই হল। মনে মনে জোর দিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমি মিরাশি, আমি তো এই চেয়েছিলাম, সমাজের বিধান মানতে আমি চেয়েছি।' তবুও মনে খটকা লাগছিল।

ভাবনাস্রোতে বাধা পড়ল ছেলের জেগে ওঠার শব্দে। দরদর করে ঘামছিল মুলাপোনি, কেবলি এপাশ-ওপাশ ফেরে আর গোঙানির মত করে বলে, 'বাপ, আমি ভাল হব তো? বাপ কিছু করার নেই, বাপ?' ঘুরেফিরে সেই একই কথা। বাপের দিকে কিরকম চাহনিতে তাকিয়ে আছে, চোখদুটো যেন বলছে, 'তুমি জানো কিসে আমার যন্ত্রণা কমে, ঠিক জানো, তবু কিছু করছ না!' বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, অসহায় মানুষটা, গ্রামের প্রাজ্ঞবৃদ্ধেরা যে-উপায় জানেন, তার বাইরে তার তো আর কোনো উপায় জানা নেই। সবসময় তাদের বিরুদ্ধে সে যাবেই বা কেন? দুবেলা বলে তাঁরা ছেলেকে প্রবেশিকা করাতে চান নি, অনেক কষ্টে তাঁদের রাজি করিয়েছে সে। তাঁদের সঙ্গে ক্যাম্পের সীমানাতে মন্ত্র-পড়া শেকড় মাটিতে পুঁততে যাবার সঙ্গী হয় নি বলে কত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা।

সত্যিই কি কোনো কিনারা নেই? এ-প্রশ্নের উত্তরটাও সে ভাল করে জানে। উঃ, মিরাশি আর ভাবতে পারে না! কুটির ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে চলল ক্যাম্পের দিকে। সন্ধ্যের আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছেন বয়স্করা, বাজপাখির চোখে মিরাশি ওমানিয়াকে ওদের মধ্য থেকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল। বৃদ্ধেরা উৎসুক হয়ে তাকালেন তার দিকে। ওঁদের মধ্যে একটা নীরব গোপন সমঝোতা রয়েছে, মিরাশি সেই পারস্পরিক জানাশোনার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, সে এঁদের মধ্যে থেকেও একা। ও'রা কি বারবার বলেন নি যে মিরাশির ঘরে একদিন অঘটন ঘটবে? আত্মীয়-পরিজনকে কি সাবধান করেন নি, বলেন নি মিরাশির একগুঁয়েমির কথা?

তাঁদের কথাই ফলেছে বলে তাঁরা যে খুব খুশি হয়েছেন তা নয়; বরং কোয়ার ওপর দয়াই হচ্ছিল তাঁদের। তাঁরা ওঝার বাণী নিয়ে বুঝেছেন যে মিরাশির দুর্দশার জন্য মুলাপোনির এক মাসির তুকতাকই দায়ী। ওঁরা বিধান দিলেন যে

মিরাশি পিতিপুরুষের আদেশমত সে-প্রাসিকে খুশি করে ভেট পাঠাতে, ছেলের অন্নপ্রাশনা তাতে দূর হবে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি নয়, মেয়েছেলের সাহায্য নিতে সে নারাজ, কিছুতেই কথা শুনল না সে। কী করে সে তার শালীর কাছে মাথা হেঁট করে, যে সবসময় বলে তার বোন নাকি তাকে বিয়ে করে ভাল করে নি? কিন্তু না! এখন মনে হচ্ছে তাকে তারই শরণ নিতে হবে—ছেলেকে বাঁচাতে তো হবেই।

শেষ পর্যন্ত মিরাশি ওয়ানিরাকে একটা দলের মধ্যে খুঁজে বার করল। মুলোপোনিকে দেখতে বলে 'এখুনি আসছি' বলে রওনা দিতেই ওয়ানিরা অবাক হয়ে বলল, 'আরে যাও কোথা?' 'কোথাও না,' দায়সারা ভাবে বলে মিরাশি গুরুজনীরদের দৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে, ইচ্ছা করে পবিত্র ঘাসের ওপর পা মাড়িয়ে টিলার ওপরে উঠে গেল। চোখের দৃষ্টি অপলক, কিছুই দেখে না সেই চোখ। মনে মনে সঠিক জ্ঞান আছে, যেতে হবে তার বাড়ির কাছাকাছি সেই লম্বা বাওবাব গাছের তলায়। সে তরতর করে ডাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখান থেকে তার শালীর ঘরের দিকে চিৎকার করে বলল, 'ছেড়ে দে আমার ছেলেকে, ছেড়ে দে তুই। ও তো তোর কোনো ক্ষেতি করে নি রে, মেয়ে! যারা তোর অনিষ্ট করেছে, তাদের তুই ধর! ভালয় ভালয় আমার ছেলেরে ঘরে ফিরতে দে। তারে তার মায়ের চোখের সামনে মরতে দে। ছাড়, ছেড়ে দে তুই আমার ছেলেরে, ছাড় রে!'

হঠাৎ কেমন লজ্জা করল তার, গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল সে। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, 'না, না, ছিঃ! এরকম বেলাজ কাণ্ড সে আর দ্বিতীয়বার ঘটতে দেবে না।' ক্ষীণ আশা ছিল তার মনে, নিজের ওপর বিশ্বাস আর তার সততার দৌলতে তার ছেলের বেমার ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে চলতে চলতে ভাবল সে, মুখে চুনকালিও মাখল শুধু, ফলে কিছুই মিলল না। টিলার নিচে ঢালু জমিতে এসে দাঁড়াল সে। মনে ভয় হল, এতক্ষণে মুলোপোনির প্রাণটা হয়তো বেরিয়ে গেছে। ভয়টা বেড়েই চলল।

হনহন করে চলল সে ছেলের দিকে। ওপরে উঠে হাঁফাতে লাগল সে. একটু দূরেই ক্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলো তার চোখে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে গাঁয়ের দিকে তাকাল সে, সেই বাওবাব গাছ, তার লজ্জার সাক্ষী। গাঁয়ের ঘরের সম্মুখে আগুন যেন নেচে নেচে তাকে ঠাট্টা করছে। চক্ষের সামনে কেবলই ভাসে ছেলেটার কাতর মুখ, কানে শুধু বাজে—'বাপ, কোনো উপায় নাই, বাপ?'

'না রে বাপধন আমার, নাই, তোর রক্ষা নাই; আচার-বিচারের বিধানের চরম খেসারত তোর, মরণের বিষ তোর শরীরে। বাপধন, বরং তুই মোরে উদ্ধার কর, বাঁচা মোরে ভয় থেকে, আমার দেমাক থেকে নতুনের ওপর পুরোনরে চাপানোর দুর্বুদ্ধি থেকে মোরে বাঁচা তুই!' এবার তার মনে হল, তার ছেলেতো চিরকালই দুর্বলা, কেন তারে নিজের অহংকারের পায়ে বলি দিলাম, জোর করলাম তারে ঐ বিধান মানতে, তাই তার পরাণটা গেল! তার নিশ্চিত মনে হল, তার ছেলে এত-

ক্ষণে তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

ক্লান্ত পায়ে সে আবার নামতে শুরু করল। অন্ধকার ভেদ করে একটা শেয়ালের ডাক তার কান ফুটো করে দিল যেন! 'এ কী কুডাক! তবে তো সে আর নাই!' নিজের মনে বলল সে। আশ্চর্যরকমের এক পরম শান্তিবোধ দিনভর খাটাখাটনির পর মানুষ যেমন তার বিশ্রাম ভোগ করে ধীর পায়ে চলে, সেও চলল তেমনি মন্দ গতিতে। একটা আগুন বেছে নিয়ে চুপ করে বয়স্যদের মধ্যে ঠাই করে নিয়ে বসল সে। সকলের মধ্যে বসে কেমন একটা স্বস্তি বোধ করল সে, আগুনের তাপ তার সঙ্গে অন্যদের আবার একসূত্রে গেঁথে দিল। এমনকি ঐ যে কাগাসি নামে পঁচিশ বছরের ছোকরা, কোথাও আগুন পেলেই তাতে তার মিষ্টি আলু পুড়িয়ে নেবার অভ্যাস নিয়ে একটু মস্করাও করল সে। ছোট ছোট নির্দোষ রসিকতা। ধীরভাবে মিরাশি বলল, 'জানো, ছেলেটার পরাণ গেছে।' যেন তাঁরা জানে এমন ভাব নিয়ে বয়স্যরা ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু মিরাশি তা জানল কী করে? ওঁদের চোখের ভাষায় মিরাশি সেই প্রশ্নকে চাক্ষুষ করে, প্রাণপণে গলার স্বর স্বাভাবিক করে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি। ঠিক কিনা বলুন আপনারা,' বলে পাশের মানুষটির কাঁধে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিল সে। 'হ্যাঁ, ঠিকই,' বেশির ভাগই উত্তরে বলল তাই।

'তবে আপনারা আমার সহায় হোন গো নমস্যেরা, ওরে গাঁয়ে ফিরায়ে নিয়ে যাই।… না না, গাঁয়ে নয়, সে তো ঠিক হবে না। বাছার ঘা শুকায় নাই, এতে গাঁয়ের মানুষের অমঙ্গল হবে। না, গাঁয়ে নয়। তারে নিয়ে যাবো ঐ পাহাড়ের একেবারে মাথায়। রাতেই সেথা ওর জন্য কবর খুঁড়ব, মেয়েরা জেগে উঠে চিল্লাচিল্লি করার আগেই কাজ শেষ করব মোরা। তারপর তিনরাত্তির বাদে আমার ঘরের সামনে আসবেন আপনারা, শ্রাদ্ধের বিধিমত কিছু মুখে দেবেন, গলা ভেজাবেন। সব তৈরি থাকবে গো আপনাদের তরে। আমাকে হয়তো পাবেন না তখন, তাতে অসুবিধা হবে না কিছুই। প্রচুর পানীয় থাকবে গো আপনাদের সেবার তরে।'

তিনদিনের দিন গাঁয়ে সোরগোল! ঢোলের বাদ্যি, প্রচুর মদ্যপান করে পুরুষদের মুখে ঘোড়ার মত চিৎকার। মিরাশি তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছে, কিন্তু তাকে তাঁদের মধ্যে দেখা গেল না। ছেলেকে মাটি চাপা দেবার পর বাড়ি ফিরে অনুষ্ঠানের সব আয়োজন সেরে সে তখুনি লিম্বির দিকে রওনা দিয়েছিল। মিশনে ফিরে এসে অবশ্য মিঃ অ্যালিসনের দেখা পায় নি, কিন্তু তাতে কিছু হেরফের হয় নি। সাহেবদের সঙ্গে কথা বলার ভাষা তার জানা। দিনের কাজ মেটাবার জন্য দরকার সহজ এক ভাষা, যাতে মরণের কথাও কওয়া যায় কত সহজে! গাঁয়ে তো এই অনুষ্ঠান করা যেত না, তাই তাকে শহরে আসতে হল। তিনদিন পর মিরাশি কাপড়ের তলায় একটা ছোট ক্রস লুকিয়ে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলল। টিলার মাথায় উঠে কবরের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। মাটির বুকে ছোট একটা গর্ত খুঁড়ল মিরাশি, তারপর ক্রসটাকে পুঁতে দিল

মাথার দিকে। শরীর তার আর চলে না। পাশেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সে। কখন উৎসবের রব স্তব্ধ হবে সেই অপেক্ষা তার। গ্রামের মৃত্যু-পরব শেষ হল। ছোট ক্রস, বেশি উঁচু নয়। গ্রাম থেকে কারো চোখে পড়বে না। তবে যদি কখনো কেউ হাঁটতে হাঁটতে এমনিই এদিকপানে আসে, কোনো রাখালছোঁড়া যদি তার ভেড়ার পাল এদিকে নিয়ে আসে, চোখে পড়বে শুধু তাদেরই, আর কারো নয়।

জামান লোলিং

সে এবং ও

লেখক পরিচিতির জন্য 'লেক্সিকোগ্রাফিসাইড' গল্প দ্রষ্টব্য। সমাজচেতনা ও পরীক্ষা-মূলকতার চমৎকার যৌগিক ফল এ-গল্পে পাওয়া যায়। তাঁর ব্যঙ্গের পক্ষে সাধু ভাষা প্রযুক্ত মনে করে ব্যবহার করা হল।

গল্পের জন্য গাদাগুচ্ছের চরিত্রের কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের বর্তমান কাহিনীতে মাত্র দুইটি চরিত্র আছে, এবং আমাদের বিবেচনায় তাহাই যথেষ্ট। একজন হইল 'সে,' পল্লিগ্রাম হইতে ভ্রমণে আসিয়াছে। অপর জন 'ও,' উহার বাড়িতেই সে অতিথি। গল্পের বিষয় এইস্থলেই বলিয়া রাখি—তাহার নগর-দর্শন।

আমাদের বিবেচনায় অদ্য সে প্রাতরাশে কী কী খাইয়াছে তাহার সহিত ভ্রমণের কোনো সম্পর্কই নাই; গ্রাম হইতে বহির্গমনের সময় আকাশের রঙ কী রূপ ছিল, তাহার নাসিকা তীক্ষ্নাগ্র কিনা, তাহার নয়নযুগল কী পরিমাণ নীল—ইহা সকলই বাহ্য ঘটনা, যাহার সাহায্যে কাহিনীকারগণ তাহাদের ক্ষীণকলেবর কাহিনীকে স্থূলকায় করিয়া তোলেন; আমাদের কাহিনীতে সে-সমস্তই সম্পূর্ণ অবান্তর; পাঠকের মঙ্গল চিন্তা করিয়াই আমরা ঐ সমস্ত বর্জন করিব। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের পাঠকেরা নিতান্ত ব্যস্ত মানুষ, জীবনের এক পর্ব হইতে অন্য পর্বে ধাবিত হইতেই তাহাদের কাল কাটিয়া যায়।

অবশ্য একটি কথা বলিয়া লইতেই হইবে—সে শ্লেষ্মা রোগে ভুগিতেছিল। বিষয়টি কাহিনীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। উহারা দুজনেই পঠনপ্রিয় ছিল, ছাত্রজীবন হইতেই দুজনে ইত্যাকার অভ্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সমধিক বৎসর কাল হইতেই সে পল্লিগ্রামে বাস করিতেছে, সঠিক কয় বৎসর তাহা গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লিগ্রামে সমস্ত কিছুই অচলদশাগ্রস্ত হইয়াছিল, কেবল শস্যের বদলে বৃদ্ধি পাইতেছিল বন্যতৃণ, গোধনের অপেক্ষা শূকরের বৃদ্ধি ছিল অধিক; অপরপক্ষে শহরে সমস্ত কিছুই দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল, ইহা শুনিয়াই সে স্বচক্ষে পরিবর্তন দেখিবার উদ্দেশ্যে শহরে আগমন করে।

বন্ধুর বাসস্থলে উপনীত হইয়া সে দ্বারে করাঘাত করিল. কোনো সাড়াশব্দ

পাইল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বন্ধুকে ডাকিল। গ্রামের সরল কৃষক, ধৈর্য অনেক, তবু তাহাও তো অসীম নহে। পরিশেষে সে দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করে। গ্রাম্য চাষির পক্ষে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইল (পাঠকমহাশয়, ভাবিবেন না যে কৃষকের আরামপ্রদ আসনের চাহিদা নাই)। মস্তকাচ্ছাদন হস্তে ধরিল, পুরুভার পাদুকাসহ পায়ের ওপর পা তুলিয়া অভিনিবেশ সহকারে গৃহের আসবাবপত্র দেখিতে লাগিল। তৎকালে তাহাকে একটি প্রাচীন মূর্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। অন্দর হইতে তাহার বন্ধু নির্গত হইয়া, হস্তাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে উত্তোলন করিয়া বাহিরে আনিল। আকর্ষণহেতু সে পতনোন্মুখ হয়, ভূপতিত হইলে হস্তপদাদি ভাঙিলে একটি কেলেঙ্কারি হইত। কৃষকদের শরীরে তাকত প্রয়োজন, গবাদি পশু বা ক্ষেতের শস্য লইয়া তাদের কর্ম। ব্যারাম হইলেও অপবুদ্ধের বুদ্ধি রোধে কে? স্বল্প হাসিয়া হস্তদ্বারা মুখমণ্ডল বুলাইয়া গৃহস্বামী বন্ধুর দিকে সপ্রতিভ উষ্ণ করমর্দনের উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া বড় করিয়া হাসিল। তারপর হিমশীতল কণ্ঠে কহিল, 'আমার গৃহে তুই স্বাগত।'

'তিষ্ঠ অল্পকাল,' বলিয়া ও দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পর নিজের চটিজুতাসদৃশ আরেক জোড়া আনিয়া কহিল, 'পর!' চাষির পাদুকাদ্বয় উন্মুক্ত আবর্জনা-পেটিকায় নিক্ষিপ্ত হইল। দুই বন্ধু ঘরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামী ঘরের কেন্দ্রস্থলে দুটি সদৃশ কেদারার একটিতে বন্ধুকে উপবিষ্ট করাইল এবং অপরটিতে স্বয়ং আসীন হইল। অপ্রস্তুত হইয়া সে মস্তকাচ্ছাদনটির কিনারা অঙ্গুলিপিষ্ট করিতে আরম্ভ করে। তাহা নয়নপথে পতিত হইবা মাত্র গৃহস্বামী ছোঁ মারিয়া উহা বন্ধুর হস্ত হইতে খালাস করিয়া অপর এক জঞ্জাল-পেটিকায় (বাহিরেরটার সদৃশ) নিক্ষেপ করে। ফিরিয়া আসিয়া ও উপবিষ্ট হইল।

'সংবাদ শুভ?' ভাবলেশহীন কণ্ঠে ও জিজ্ঞাসা করে (পাঠক, নিশ্চয় বুঝিবেন আমাদের পল্লিগ্রামের কৃষকটি ইত্যাকার বিষয়ে উক্ত আচরণে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, এখনো সে তাহার কর্দমমলিন ঘোৎকারী খর্বনাসা শূকরশাবক গুলিকে ভালবাসে এবং শুষ্ক তৃণগুচ্ছকে টানিয়া সোহাগ করে)।

সে বলিল, 'ভালই আছি, তবে একটু কাশির উপদ্রব হইয়াছে…।' 'কিঞ্চিৎ' কথাটি বলিবার সময় না দিয়া বন্ধুটি বন্দুকনির্গত বুলেটের ন্যায় সোজা দণ্ডায়মান হয় এবং তাকেও উঠিয়া দাঁড়াইতে বলে। প্রায় কুচকাওয়াজ করিবার ভঙ্গিতে তাহাকে লইয়া পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বলে, 'কাশি পাইলে এই কক্ষে আসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাশিবি, বুঝিলি?'

সে তখনো প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র দেখে নাই। বন্ধুকে বলিতেই, 'বিলক্ষণ, অগ্রসর হ',' বলিয়া উঠিয়া পড়ে। কাষ্ঠনির্মিত সান্ত্রীর ন্যায় অগ্রভাগে ও খট্-খট্ করিয়া চলে, সে উহার অনুগামী হয়, তাহার কিরূপ প্রতীতি জন্মে, দিনটা স্মরণীয় হইবে। 'ইহা আমার পাঠকক্ষ, ইহার ভিতরে স্থিত সকলই তুই পাঠ করিতে পারিবি,' বলিয়া ও তাহার হস্তে সংবাদপত্রের নগর সংস্করণটি তুলিয়া

দেয়। দেয়াল-সংলগ্ন দৈনিক পাঠের হিসাব-পুস্তিকা লইয়া তাহাতে পাঠ্যবস্তু, লেখক ও বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে দিয়া স্বাক্ষর করাইয়া অতঃপর কহিল, 'এই হিসাবরক্ষার ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

পাঠক বুঝিবেন যে কৃষকটির পক্ষে এই দুই দিবসের কার্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করাইয়া লইবার ব্যাপারটি ঢেঁকি চালনা হইতেছিল। ক্লান্ত হইয়া হাই তুলিতে উদ্যত হইতেই বন্ধু তার মুখগহ্বর চাপা দিয়া কর্মটিকে অর্ধপথে রুদ্ধ করিল, তাকে প্রায় টানিয়া হিঁচড়াইয়া আরেকটি পার্শ্ববর্তী কক্ষে লইয়া গিয়া কহিল, 'এই ঘরে উদ্বেগশূন্য হইয়া প্রাণ ভরিয়া হাই তুলিতে পারিস। উদ্গম হইলেই অত্র ছুটিয়া আসিবি। ভ্রাতঃ, প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবহার না করিলে এসবের অস্তিত্ব কী জন্য?'

আহারের সময় উপনীত হইল। দুইটি থালিকায় পৃথক করিয়া লবণ আনীত হইল। 'ভক্ষণ কর, ইহা ফার্স্ট কোর্স বলিয়া কথিত,' বলিয়া চরম ক্ষুধার সহিত গৃহস্বামী লবণলেহন আরম্ভ করে। সে-ও তাহাকে অনুকরণ করিল। ইহার পর তাহারা স্যালাড নামক হরিৎ-সবজি কক্ষে প্রবেশ করে। গৃহস্বামী কহিল, 'এই কক্ষের নিয়মানুযায়ী প্রথমে সবজি চর্বণ ও গলাধঃকরণ কর, পরে উহার জন্য নির্দিষ্ট তৈলমশলা খাইবি।' শূকরের ন্যায় দুইজনে গিলিল অনেক।

মধ্যপথে তাহার অস্বস্তিবোধ হইল। 'আমি, আমি…' তাহার জিহ্বা বেসামাল হয়। 'তুই, তুই কী? শীঘ্র বল! এই কক্ষের অনুপযুক্ত কার্য করিয়া বসিস না যেন। বল!' 'আসিতেছে, আসিল, আমি বুঝিতে পারিতেছি।' তাহার আঁখিপাতা চঞ্চল, শরীর উচাটন।

'কী আসিতেছে?' ইহা প্রশ্ন না আদেশ বোধগম্য হইল না।

'কাশি,' উত্তর করিল।

'তবে ধাবিত হ' বামদিকের প্রথম কক্ষ শ্লেষ্মাগৃহে।' প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুর সহিত একাধিক কোর্স খাইয়া সে সর্বশেষে বাড়ির এককোণে একটি কক্ষ হইতে মাংসখণ্ড তুলিয়া, পরবর্তী প্রকোষ্ঠে (বৃহৎ ঘড়ির বিপরীতে স্থিত) সেগুলি চর্বণ করিয়া, তৃতীয় কক্ষে তাহা গিলিয়া, চতুর্থ প্রকোষ্ঠে এক গ্লাস জল সহযোগে তাহার স্বাদ ধৌত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিল। বলা বাহুল্য, মাংস লবণবিহীন ছিল (লবণ তো পূর্বেই পাকস্থলীতে প্রেরিত), এবং তাহা যে অপক্ব ছিল পাঠকদিগকে তাহাও নিশ্চয় বলিয়া দিতে হইবে না।

ভোজনপর্ব সমাধা হইলেই, তাহারা পূর্বনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী অপর একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হইল, সেথায় লেলিহান অগ্নিশিখা তাপ বিকিরণ করিতেছে, চতুষ্পার্শ্বে কামিজ ও কোট ঝুলাইবার জন্য কাষ্ঠদণ্ডলগ্ন লোহার হুক, আর প্রচুর সিগারেট। গৃহস্বামী বন্ধুকে নির্ভুলভাবে উহার কর্মকাণ্ড অনুসরণ করিতে বলিয়া উভয়ে কোট খুলিয়া দণ্ডে ঝুলাইল। ভেস্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, 'উহাও উন্মোচন কর (গৃহস্বামীর অঙ্গে উহা ছিল না)। উহা আগুনের সম্মুখে প্রসারিত করা যাইতে পারে। শরীর আঠাআঠা বোধ

করিলে তদ্দণ্ডে স্নানঘরে ধাবিত হইবি।' একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া, জ্বলন্ত আগুনের সন্নিকট একটি আসন ও নিজের জন্য নির্বাচন করিল। সে-ও অনুকরণ করে। সিগারেটের ধূম্র পাকস্থলীতে প্রেরণ করাইয়া অপক্ক মাংসকে 'স্মোকড' করা হইল, উদর দুইটি অগ্নির আরো সন্নিকট করিল তাপ লাগাইয়া মাংস পক্ক ও পরিপক্ক করিবার উদ্দেশ্যে। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল।

থাকিয়া থাকিয়া এই পাকক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাকে মধ্যে মধ্যে স্নেখাগৃহে ধাবিত হইবার নিমিত্ত। মোটের ওপর এই প্রক্রিয়ার জন্য নয় মিনিট কাল বরাদ্দ ছিল। নির্দিষ্ট সময় গতে গৃহস্বামী লৌহশলাকায় খোঁচা-খাওয়া বালকের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, 'মামনুসব, শীঘ্র আমার মস্তিষ্কে একটি ধারণা-তরঙ্গ আঘাত করিয়াছে।' দুইটি উন্মুক্ত গবাক্ষপথে তাহারা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ধাবিত হয়। ধাবনান্তে গৃহস্বামী অট্টহাস্য আরম্ভ করিল (হাসি অকৃত্রিম, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল)। উহার নাকি একটি পুরাতন রসিকতা স্মরণ হয়। ইত্যাকার আচরণ নাকি সফল শিথিলকরণী, স্নায়ুর বিশ্রামের পক্ষে অব্যর্থ।

গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষাঘরে লইয়া যাওয়া হয়। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করার বিষয়ে তাহাকে সম্যকরূপে শিক্ষিত করা হইয়াছিল। কারণ এই শিক্ষানবিশিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলেক্স লা গুমা

এক গেলাস মদ

আলেক্স লা গুমা দক্ষিণ আফ্রিকার 'কালার্ড' অর্থাৎ বর্ণসংকর সম্প্রদায়ের লোক। দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহাইড নীতি অনুযায়ী সমাজের মাথায় শ্বেতকায় সম্প্রদায়, তার পরে স্থান কালার্ডদের, আমাদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মত। তার নিম্নে এশীয় ও আফ্রিকানদের স্থান। লা গুমা তাঁর প্রগতিবাদী মতবাদের জন্য নির্বাসিত, বর্তমানে কিউবার বাসিন্দা। বর্ণবিভেদ নীতির প্রেক্ষিতে লেখা এই গল্পে শ্বেতকায় যুবকটি ছাড়া বাকবাকি সকলে কালার্ড। মা ফ্রিকারের বারে কৃষ্ণকায়ও প্রধান।

সন্ধ্যায় মা ফ্রিকারের বারের সামনের ঘরে বসে আছি, এমন সময় দরজা খুলে ছেলেটি ঘরে এল। ছিপছিপে তরুণ যুবক, বিলিয়ার্ডের কিউর মত লম্বা, গায়ের রঙ গোলাপী ধরনের সাদা। মাথার সোনালি চুল পম্পাদুর ধরনে আঁচড়ানো। এ-ধরনের সুন্দর চেহারা আমরা প্রায়ই সিনেমার পর্দায় দেখি।

'হ্যালো!' আর্থার হাসিমুখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল। আমিও তার দিকে চেয়ে একটু হাসলাম, উত্তরে সে হেসে মাথা নোয়ালো। মা ফ্রিকারের বারে মদের গেলাস হাতে গ্যাঁজাচ্ছিলাম আমরা, সে-সন্ধ্যায় আমাদের করবার কিছুই ছিল না, তাছাড়া বোতলটি ছ' শিলিং ছ' পেন্সে কিনেছি, সে-পয়সা উসুল করতে হবে তো! দাম কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিলে খদ্দেররা কতক্ষণ থাকে বা না থাকে তা নিয়ে মা ফ্রিকার মাথা ঘামায় না। পেল্লায় মোটা, কালো মা ফ্রিকার, খুব হাসিখুশি, হেসে সবাইকে অভ্যর্থনা করে, বিশেষত সে যদি খদ্দের হয়। অবশ্য আমার মনে হয় ও আগে থেকেই আঁচ করতে পারে সেদিন কেমন বিক্রিবাটা হবে, কেননা অন্যদিন আমি ওকে চণ্ডীমূর্তি ধরতে দেখেছি!

'কি দোস্ত, কেমন চলছে?' আর্থার ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল। ব্যাটার মাথায় এর মধ্যেই কিছুটা চড়েছে, তাই এত দোস্তিভাব। লাজুকভাবে ছেলেটি বলল, 'বেশ ভাল, ভালই আছি।'

'বোস ইয়ার, বোস,' আর্থার তখন হাসিমুখে বলল।

সোফায় বসে ছেলেটি চারদিকে চাইল। আগেও সে এসেছে এখানে, কিন্তু প্রতিবারই ঢুকে সে চারদিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। দেয়ালে গোটা দুই পুরনো ছবি ঝুলছে। তার মধ্যে একটা একটি জাহাজের ছবি, অন্যটা উইন্ড-

সোয়ের ডিউক ও ডিউকের বউয়ের ছবি, খবরের কাগজ থেকে কেটে কালো ফ্রেমে বাঁধানো। অন্য একটা ফ্রেমে রয়েছে ছোট পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি বাড়ি, সামনে ছোট বাগানে ফুল আর মৌমাছি, তলায় এমব্রয়ডার করে লেখা 'হোম, সুইট হোম।' ডিমের শেপের আরেক আকৃতির ফ্রেমে আছে এক বৃদ্ধের ছবি, সাদা দাঁড়ি, 'কাম-টু-জিসাস' গলাবন্ধ, মা প্রিকারের মতে ওটা নাকি ওর ঠাকুরদার বাবার ছবি।

কিন্তু আমরা জানি দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলি নিয়ে ছেলেটির কোনো মাথাব্যথা নেই। ছোকরা আসলে এসেছে মা প্রিকারের মেয়েগুলির একটির খোঁজে, অপ্রস্তুত হয়ে এদিক-ওদিক তাকানো মানেই 'আমি কী চাই' তা বুঝিয়ে দেওয়া। 'আরে দোস্ত, এক গ্লাস ওয়াইন চলুক আমাদের সঙ্গে,' বোতল তুলে দেখে আর্থার বলল, 'এখনো এক ঢোক মত হবে।'

'থাক বরং,' বলল ছেলেটি। দাঁত বের করে হেসে আর্থার বলল, 'আরে মালকড়ি আছে আমাদের পকেটে। আরেক বোতল এখুনি কিনতে পারি। কিরে পারি না?' বলে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'অবশ্যই!' 'তাহলে আমিই এ-বোতলটা শেষ করি,' বলে আর্থার লাল মদ ঢালল গেলাসে। ছোট একটা শব্দ হল, রক্তের মত গাঢ় লাল রঙের বিজলি বাতি ঝকঝক করে উঠল। 'লালের জবাব নেই,' বলল আর্থার, 'সাদা মালও মন্দ নয়, তবে লালের কাছে লাগে না!' তারপর আমার দিকে চেয়ে সে চোখ টিপে বলল, 'ও আসে ঐ ছুঁড়িটার টানে, ঐযে কোঁকড়া-চুলো মেয়েটা।'

লজ্জায় ছেলেটি আরো লাল হয়, কিছু না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি আর্থারকে বললাম, 'ছেড়ে দে, দোস্ত।'

কিছুটা মাতাল গলায় সে বলল, 'ছুঁড়িটাকে ও কী ভালই না বাসে, দোস্ত।'

'ছেড়ে দে ওকে, নতুন বোতলটা দিতে বল,' বলে ছেলেটির দিকে আমি চোখ টিপলাম।

ছেলেটার দিকে চেয়ে একটু হেসে পেছনের দরজার দিকে তাকিয়ে আর্থার বলল, 'এই মা, আরেক বোতল লাল, আসোবিলিফের বোতল চাই!'

'আরে শুনেছি, চিল্লাও কেন? আমি কি বয়রা?' হেঁড়ে গলায় আওয়াজ এল।

'আরে না না, কে বলছে তুমি বয়রা। তবে জলদি আরেক বোতল রাঙা মাল পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ শোনো, ঐ মেয়েটার হাত দিয়ে পাঠাও। ধলা ছেলেটা ওকে দেখবার জন্য আকুপাকু করছে। ছেলেটা স্মার্ট আছে, বেশ ডবকা। আমার খুব পছন্দ।'

'আঃ মরণ!' মা প্রিকার চেঁচিয়ে বলল, 'তবে তুমিই ওর সঙ্গে পীরিত করো, তোমার ভোগে বাদ সাধব কেন?'

আর্থার মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে জ্বলজ্বলে করে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে ব্যাপারটা?' ছেলেটার দিকে দাঁত বার করে বলে, 'বাবাড়িও না, দোস্ত, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করব না মাইরি!' বলে প্রচন্ড হেসে আমার পিঠে মারল এক

প্রবল চাপড় । মা প্রিকার এল ঘরে । ছেলেটা মুখ তুলে তাকাতেই যাকে আশা করেছিল তাকে দেখতে না পেয়ে দমে গেল । 'শার্লেৎ কোথায় ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম । 'আউট হাউস থেকে বোতল আনতে গেছে । কেন, তোমার ওদিকে নজর নাকি ?' মা বলল । 'আরে ও আবার মেয়েদের ভালবাসে নাকি ?' আর্থার বলল, 'এক বেয়াল্লিশ বছরের ধুমসো দেখবা ওকে বে করতে চেয়েছিল, তা বাবু রাজি নন । কেন ? না, তার নাকি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, আঃ হাঃ হাঃ !'

হিক্কা তুলতে তুলতে আমার পিঠে আবার চাপড় মেরে বলল, 'ক্ষমা, আমি ক্ষমা চাইছি, ভ্রাদার ।' উঠে দাঁড়িয়ে বাও করতে গিয়ে আবার বেসামাল হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল আর্থার ।

'এই খুব রগড়বাজির চেষ্টা হচ্ছে, না ?' বলল মা প্রিকার ।

'চার্লি চ্যাপলিন !' বলে আর্থার আবার চোখ টিপল ।

ঠিক সেসময় মেয়েটি ট্রের ওপর লাল মদের বোতল নিয়ে এল । আর্থার বলল, 'এই যে এসে গেছে; তোমার নাগর যে তোমার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছে গো !'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখি চামড়ার ভেতর থেকে লজ্জার লাল আভা ফুটে বেরোচ্ছে । ওর চামড়া ঘন হলুদ মদের মত, চোখও গাঢ় বাদামী, উজ্জ্বল, কিন্তু চাহনি নম্র । ডিম্বাকৃতি মুখ কালো কোঁকড়া চুলের ফ্রেমে আঁটা । নরম, পুষ্ট ঠোঁটদুটি মৃদু হাসিতে বাঁকা । ছোকরার মুখের দিকে সে আদৌ তাকাচ্ছে না, কিন্তু ঘরে যে সে আছে তা যথেষ্টই টের পাচ্ছে; আর ছেলেটির বোকা বোকা চাহনিটাও দেখতে মজা লাগছিল আমার ।

ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে হেসে আর্থার বলল, 'আরে যাও কোথায় বিবি জান, তোমার নাগর যে হেথা বসে । বসো খুকু, বসো ।' আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে মেয়েটি এদিক-ওদিক চাইল, কিন্তু ছেলেটির দিকে নয় । 'কিগো শার্লেৎ, আছো কেমন,' আমি শুধোলাম । সে কোনোমতে 'ভাল আছি' বলে ভদ্রতা করল ।

'আরে মাইরি, এরা দুজনেই দেখি কনেবউ, অ্যাঁ ! লাজের কি ঘটা !' বলল আর্থার । লাল মদের কিছুটা নিজের গেলাসে ঢেলে আমার দিকে বোতলটা এগিয়ে দিতে দিতে খোঁচাবার জন্য সে আরো বলল, 'লাজে রাঙা হলে দেখ দুটিকেই কী খুবসুরত দেখায় !'

বিপুল অঙ্গ দুলিয়ে মা প্রিকার বলে, 'আরে একেই বলে প্রেম । বায়স্কোপে দেখো নি ?' নিজের গেলাসটা ছেলেটি ও মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে আর্থার বলে, 'বরকনেকে আশীর্বাদ, তাদের বাসাই ভরাৎ থাক ।' বলে আবার এক চোট হেসে দেখে ছেলেটির মুখ বেজার, মেয়েটি অন্যদিকে তাকিয়ে । আমি কিছু বলবার আগেই আর্থার আবার বলল, 'এত সোহাগ, এত লাজলজ্জা দুটিতে, বে না হলে কি চলে ?' আরেক ঢোক গিলে সে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল ।

'থামান,' বলে উঠল মেয়েটি; ছেলেটি সোজা চাইল আর্থারের দিকে ।

'থামাবো ? কী থামাবো ?' আর্থার বোকার মত মুখ করে বলল। 'বে থামাবো ? কেন ? বে হবেই হবে, অ্যাঁ।' উঠে দাঁড়িয়ে আরেক দফা উইশ করতে গিয়ে আবার ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'এই আর্থার, চুপ কর,' আমি বললাম, 'শেষ কর, চল কেটে পড়ি।'

থতমত খেয়ে আর্থার বলল, 'কেন কাটবো কেন, হল কী ?'

এবার মেয়েটি আমাকে বলল, 'থাক ছেড়ে দিন, ও ঠিকই আছে।'

'ঠিক আছি মানে ? বিলকুল ঠিক আছি। একপায়ে খাড়া থাকতে পারি, দেখবি শালা ?' বলল আর্থার।

'পড়ে ধরে ভাঙচুর করবি সব। মা ফ্রিকারের সুন্দর সব ফুলদানিগুলো চুরমার হবে।'

'হুঁ, দেখো বাছা, আমার সাধের সব ভাস, সবগুলো প্রেজেন্ট পেয়েছি বুঝেছ, সামলে চলো বাছা !'

'থুক্কোরি ছাই !' আর্থার ডুলঢুলে করে তাকিয়ে আমাকে বলল, 'দে শালা, দেখি দে আরেক পাত্তর।'

আমি দু'গ্লাসে মদ ঢেলে একটা নিজে তুলে নিলাম। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ঘাবড়াও মৎ ভাই, একটু বেশি মাল টেনেছে, এই যা।' 'ঠিক আছে,' ছেলেটি হেসে বলল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার বাহু জড়িয়ে ধরল, মেয়েটি চট্ করে একবার তাকালো তার দিকে, ছোট করে একটু হাসলও বটে। কিন্তু কোথায় যেন একটা গরমিল হয়েছে। ওদের ব্যাপারটা যেন ঠিক আর আগের মত নেই।

আর্থার এক চুমুকে গেলাস ফাঁকা করে আরেক চোট হিক্কা তুলে বলল, 'জাহান্নামে যা ! আলবৎ বলব আমি, ওদের নিশ্চয় বে করা উচিত। দেখবি শেষে মেয়েটার পেট হয়েছে। মা ফ্রিকার, পাত্তা দিও না ওদের মাইরি !'

ছেলেটির চোখে আবার সেই দৃষ্টি ফিরে এল। শালেং রেগে এবার বলল, 'থামুন বলছি ! আশ্চর্য, কিছুতেই মুখ বন্ধ করবে না !' মনে হল ও এখুনি কেঁদে ফেলবে। আর্থার এবার সামলেসুমলে দাঁড়াতে পারল কোনোক্রমে। দাঁড়িয়ে বলল, 'যাঃ বাবা, আমি কি করলাম, অ্যাঁ ?' পা তার টলছে তখনো, হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে আমি বললাম, 'এই, এবার চল দিকি !'

'হ্যাঁ খুব গিলেছে আজ,' মা ফ্রিকার বলল, 'বাড়িতে পৌঁছে দিও বাছা।'

'কোন শালা বলে আমি আউট হয়েছি ? এই ছোড় দো মুঝে,' বলে আর্থার ঝাঁকা মেরে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল।

'না বাপু, ঢের হয়েছে,' মা ফ্রিকার বলল, 'এবার গা তোলো, বাড়ি যাও।'

'বটে, আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস ! কোই বাত নেই,' আর্থার পাকা মাতালের মত বলল। তারপর নকল গাম্ভীর্য এনে বলল, 'আমি হেথা আর আসব না। একটা ভাল জাতের খদ্দের তুই হারালি, বুঝেছিস।' ওকে দেখে হাসি পাচ্ছিল, তবু হাসলাম না।

দরজা পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছি, পেছনে পেছনে মা স্ক্রিকার আসছে। বেরোবার আগে কপোত-কপোতীকে বললাম, 'কিছু মনে কোরো না তোমরা, আজ একটু বেসামাল হয়েছে, এই আর কি।' আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'ঠিক আছে।'

বাইরে বেরিয়ে এসেছি। হাতের ওপর আর্থারের টলমল বপু একটু ভারি লাগছে। মা করিডরে দাঁড়িয়ে পেল্লায় মোটা গতর নিয়ে, পেছনের আলোতে শিলুয়েট হয়েছে জালার মত শরীরটা। 'নাও, ঠিকমত বাড়ি পৌঁছে দিও, দেখো রাস্তায় আবার পুলিশের কাছে ফেঁসো না যেন,' ও বলল।

'বাড়িই নিয়ে যাবো ওকে, খুব বেশি মাতাল হয় নি ও।'

'ছাড় আমায়, দোস্ত, আমি নিজেই যেতে পারব,' আর্থার বলল। মা-কে বললাম, 'গুড নাইট।' যথারীতি 'আবার এসো' বলে মুচকি দরজা বন্ধ করে দিল।

'কিরে, ঠিক হায় সব কুছ ?' বললাম আমি।

'আলবৎ, বহুৎ ঠিক আছি।'

'চল তবে, ল্যাম্পপোস্টের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?'

যেতে যেতে ও বলল, 'কী গেরো ! আমার ওপর ছুঁড়ি অত খেপল কেন বল দিকি নি ?'

'গবেট,' আমি বললাম, 'ন্যাকা চৈতন আমার ! শালা জানিস না ঐ ধলা ছেলেটা ওর সঙ্গে শুতে পারে, কিন্তু বে করতে পারে না ? আইনে বারণ ?'

অন্ধকারে আর্থারের গলা শোনা গেল, 'যিশু ! কী গেরোরে মাইরি !'